রমণীয় ক্রিকেট

শংকরীপ্রসাদ বসু

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
১লা আশ্বিন, ১৩৬৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ
আষাঢ়, ১৩৬৯
তৃতীয় মুদ্রণ
আষাঢ়, ১৩৭২

প্রকাশক
শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায়
১৮/এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীগণেশ বসু

প্রচ্ছদ মুদ্রণ
রয়াল হাফটোন কোং
৪ সরকার বাই লেন
কলকাতা-৭

মুদ্রাকর
শ্রীঅনিলকুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ, বিধান সরণি
কলকাতা-৬

এই লেখকের
ক্রিকেটের অপর বই :

ইডেনে শীতের দুপুর
বল পড়ে ব্যাট নড়ে
ক্রিকেট সুন্দর ক্রিকেট
নট আউট
লাল বল, লারউড

মণিশঙ্কর গড় গড় ক'রে বলে গেল,—"ভারতের ক্রিকেট হচ্ছে ইল্‌লেজিটিমেট, ইম্‌মর‍্যাল, ইল্‌কন্‌সিভড্‌, ইল্‌লজিক্যাল……"

আমি বললুম,—"ইল্‌-লি।" তারপর বললুম,—"বৎস ধীরে। ব্যাখ্যা কর একে একে।"

হতাশ হয়ে সে শ্রাগ করল।—"এও বোঝাতে হবে? ক্রিকেট ইম্‌মর‍্যাল,—ছু'জন লোক এগার জনকে খাটাবে মাঠে, এর থেকে নীতিহীন কী হতে পারে? এক ধরনের নোংরা আমলাতন্ত্রের ছবি।"

শিবনারায়ণ শিষ্টস্বভাব। জিজ্ঞাসা করল বিনীতভাবে,—"ভায়া, ছু'জন এগার জনকে খাটায়, না, এগার জনে ছু'জনকে মারে অন্যায় সমরে?"

মণিশঙ্কর না দমে বলল,—"এতে ক'রে ইম্‌মর‍্যালিটির পরিমাণ বেড়ে গেল।"

আলোচনা হচ্ছিল খুরুট রোডের একটা বাড়ীতে বসে। ঘরটা বড়, লম্বা টেবিল পাতা আছে। চেয়ার, বেঞ্চ চারদিকে। রবিবার সকালে সেখানে একটা ছোটখাটো জনতা জমে। নিজেদের মধ্যে বলে, আড্ডা দিচ্ছি, বাইরের লোককে বলে, গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা চলছে; বাইরের লোক বলে—কেবলই ঝগড়া হচ্ছে। যারা জোটে তাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান কম নয়, কুড়ি থেকে পঁয়তাল্লিশ পর্যন্ত এক সঙ্গে আড্ডা মারে। চা অফুরন্ত এবং সিগারেট। বয়স্থ সদস্যেরা নিজেদের সম্মান বাঁচাবার জন্য অনধিক বয়স্কদের আগে থেকে ধূমপানের অধিকার দিয়ে রেখেছেন।

রবিবাসরীয় এই আড্ডার ইতিহাস নতুন সদস্যদের নিজস্ব সরল ভঙ্গিতে জানিয়েছিল মণিশঙ্কর। আগে এর নাম ছিল 'শরৎকুমার চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ফাণ্ড'। সাদা অর্থ—শরৎকুমার ঘোষ নিজের গাঁটের

পয়সা খরচ ক'রে অন্যান্যদের চা-সিঙাড়ায় আপ্যায়িত করতেন। তারপর দু'জন সদস্য নিয়মিতভাবে এসে যোগদান করল—মিত্তিরদা এবং মণিশঙ্কর। তখন আড্ডাটি স্থায়ীভাবে খুরুট রোডে হল সমিতিবদ্ধ। তিন জন তার মূল সদস্য—শরৎকুমার, মিত্তিরদা ও মণিশঙ্কর। আড্ডা চালিয়ে যাওয়া, চা-সিঙাড়া সরবরাহ করা এবং দুপুর দেড়টার সময় ঝাঁপ বন্ধ করা—এই হল তিন সদস্যের মূল দায়িত্ব। বাকি যাঁরা আসবেন, তাঁরা কেবল চা-সিঙাড়া খাওয়ার এবং আড্ডা মারবার অধিকারী। সদস্যবৃদ্ধি ঘটে গেল অচিরে।

আজকের আড্ডায় আছেন দু'জন তরুণ সাহিত্যিক, তিন জন অধ্যাপক (একজন বিজ্ঞানের, দু'জন সাহিত্যের) দু'জন কেরানী—এক শিক্ষক, এক উকিল, এক ব্যবসায়ী, এক অফিসার ও এক ইঞ্জিনীয়ার। তর্কে সবাই যোগদান করে এমন নয়, সে বিষয়ে বাধ্য করার কোনো আইন নেই, কিন্তু এক সঙ্গে পাঁচ জন চেঁচালেও তাদের কেউ বাধা না দেয়, সে বিষয়ে আইন আছে।

ক্রিকেটের প্রসঙ্গে আলোচনা জমে উঠল অল্প সময়ের মধ্যে।

মণিশঙ্কর হাত গুটোচ্ছিল কি একটা বলবার জন্য, মিত্তিরদা মধ্যস্থতা ক'রে বললেন,—"ঝগড়া থাক। মণিশঙ্কর, ইল্‌লেজিটিমেট কথাটা খুব চড়া। বিশ্লেষণে অন্তত নরম কর।"

মিত্তিরদা আমাদের স্থায়ী সভাপতি।

চোখের কোণে দুষ্টু হেসে মণিশঙ্কর বলল,—"বুঝতেই পারছেন, ভারতে ক্রিকেট ইংরেজী সভ্যতার বেআইনী ফসল।"

উদার হাস্য করলেন সুনীলবিহারী। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ গম্‌গম্ করে উঠল খুরুট রোডের তিনতলা বাড়ীর একতলা কক্ষে,—"শক-হূণ-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।"

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় এতক্ষণ কি ভাবছিলেন। নিজের বুড়ো আঙুলের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বের অচিন্ত্যত্ব কিংবা বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদের বিশিষ্টতা—যা হোক একটা কিছুর সন্ধান করছিলেন।

মাইনাস পাঁচের চশমা কোঁচার খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন,—"কি যেন বলছিলে—।"

সকলেই জানে ভাবজগৎ থেকে সদ্য-প্রত্যাবৃত্ত অধ্যাপকের দ্বিতীয় বাক্যস্ফূর্তি হতে কিছু দেরী হবে। সুযোগ নষ্ট না ক'রে মণিশঙ্কর টেবিল চাপড়াল,—"বৃটিশ সভ্যতা ভারতে তিনটি জিনিস চালাতে চেয়েছে—ক্রাইস্ট, ক্যাবারে ও ক্রিকেট।"

জগতের সকল মহাত্মায় একান্ত বিশ্বাসী শরৎকুমার চটে গেলেন—"ভগবান্ খ্রীস্টের নাম নিয়ে—ইয়ে—"

তড়বড়িয়ে মণিশঙ্কর বলল,—"ঠিক বলেছেন শরৎদা, এই জন্যই ইংরেজের উপর আমার রাগ। ছি ছি! ম্যাঞ্চেস্টারের কাপড়, নিউক্যাসলের কয়লার মতই ব্যবসার জিনিস করলে কি না লর্ড জিসাসকে!"

হাত নেড়ে বিচক্ষণ ভঙ্গিতে লক্ষ্মীকান্ত কি যেন বলতে গেল। তার চর্বিত বচনকে ডুবিয়ে মণিশঙ্করের গলা শোনা গেল,—"আর ঐ ক্যাবারে ও ক্রিকেট। বড়লোকদের মেরুদণ্ডে ঘুণ ধরাবার জন্য ক্যাবারে এবং জোয়ান ছোকরাদের মাথা খাবার জন্য ক্রিকেট।"

"বল কি হে? কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্‌মা যত ছেলের মাথা খেয়েছে, ক্রিকেট যে তার লক্ষাংশের একাংশেরও পারেনি," —বললেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সৃষ্টি ডক্টর পি. কে. ব্যানার্জি। প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট নিয়েছেন গ্রন্থসমুদ্রে ডুব দিয়ে। পুথিঘেঁষা শিক্ষাপদ্ধতির বিরুদ্ধে পুথিসমুদ্র মন্থন ক'রে তিনি বহু যুক্তি আবিষ্কার করেছেন।

মণিশঙ্করের কথায় আইনজীবী প্রফুল্ল রায় তীক্ষ্ণ ক'রে হাসলেন। তাঁর এই ধরনের হাসিতে সাক্ষীরা ধড়পড় করে ওঠে। বললেন,—"ছোকরা শোনো, আমার এক রাজকীয় মক্কেল ক্যাবারে দেখে খুব প্রশংসা করেছিল। বলেছিল, আহা, বড়ো সংযত!"

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় এতক্ষণে বাস্তবায়িত হয়েছেন। —"ক্রিকেটের যদি মূল্যায়ন করতে হয়—"

—"তাহলে গুহাহিত রসসত্তার অশরীরী আকৃতি অপেক্ষিত— থাম্ ইডিয়ট"—খিঁচিয়ে উঠলেন রমেন মিত্তির, গঙ্গোপাধ্যায়ের সহপাঠী, বিজ্ঞানের হুঁদে ছাত্র।

অধ্যাপককে থামানো গেল না। "অমৃতং বালভাষিতম্" বলে মিত্তিরের দিকে ঠোঁট বেঁকিয়ে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় এবার বললেন,—"ক্রিকেট কিন্তু অলস বিলাসের পরিপোষক। অঢেল পয়সা আর অঢেল সময় থাকলে ক্রিকেট সম্ভব।"

আমি সম্ভ্রমভরে বললুম—"দেখুন, সেইটেই বক্তব্য। ক্রিকেট সুন্দরের সীমানা। আমরা কি সকলে চাই না যে, আমাদের সকলের অঢেল পয়সা আর অঢেল সময় থাকুক? ধনতন্ত্র কিছু লোকের জন্য ঐ জিনিস বাস্তব করেছে। সাম্যতন্ত্র সব লোককে ঐ জিনিস দেবে বলে লড়াই করছে। ক্রিকেট সুখী পৃথিবীর স্বর্ণযুগের নন্দনক্রীড়া। যা হওয়া উচিত, তারই নমুনা তুলে ধরেছে ক্রিকেট। বিশ্রী বর্তমানের সঙ্গে শ্রীমন্ত ভবিষ্যতের ব্যবধান আমরা লড়াই ক'রে মুছে দেব। আগামী পৃথিবীতে সবাই ক্রিকেট খেলবে।"

ঘটা ক'রে পাঞ্জাবির হাতা সরিয়ে ঘড়ি দেখছিল মণিশঙ্কর। আমি তার দিকে তাকাতে বলল,—"দাদার উচ্ছ্বাসের 'ওভার' কতক্ষণের? অন্তত আট বলের অস্ট্রেলিয়ান ওভারের চেয়ে বেশী?"

আমি বললুম,—"বাঁদর কোথাকার।"

মণিশঙ্কর হেসে বলল,—"বাঁচা গেল, ভাষাটা নাতি-ক্রিকেট।"

ইতিমধ্যে তৃতীয় প্রস্থ চা এসেছে। প্রসঙ্গান্তর আনতে অনেকের আগ্রহ দেখা গেল। "কি পচা ভ্যাজর ভ্যাজর হচ্ছে—,"প্রফুল্ল রায় বললেন। অন্য দিন প্রফুল্ল রায় তাঁর আদালতের চমকপ্রদ কাহিনীতে আমাদের নিঃশ্বাস কেড়ে রাখেন। আজ আদালত-কক্ষকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে ক্রিকেট-মাঠ। প্রফুল্ল রায় বিরক্তভাবে আরও কি বলতে যাচ্ছেন—অদ্ভুত ঘটালেন অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়। সড়সড় ক'রে চায়ে একটা বিরাট চুমুক দিয়ে দুই চোখ মুদিত করে প্রসন্ন কণ্ঠে

বাণী দিলেন,—"আমি ক্রিকেট খেলতুম।" সকলে হতবাক। ক্রিকেটের বিরুদ্ধে যে গলা ভাঙছিল সেই মণিশঙ্কর নিজেকে সামলাতে পারল না, অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর পদস্খলনের ইতিহাস জানবার জন্য ব্যাকুল কণ্ঠে বলল,—"কবে—কবে—?"

"ছেলেবেলায়।" চায়ে আবার সুদীর্ঘ চুমুক।—"বলতুম—ত্রিকেট।"

"কী-ই-ই ?"

"ত্রি-কে-ট। তিনটে কাঠি দিয়া খেলা, তাই ভেবেছিলুম খেলাটার নাম ত্রিকেট অর্থাৎ ত্রিকাষ্ঠিকা। ছেলে ভালই ছিলুম। ঐ বয়সেই সংস্কৃত অনেকের চেয়ে বেশী জানতুম।"

এই কথা বলে অধ্যাপক একটু নাক বাঁকালেন। ঠিক সেই সময়ে রমেন মিস্তিরের ছুঁচলো ঠোঁট থেকে একটা ধোঁয়ার রিং বেরিয়ে এসে ঘুরতে লাগল অধ্যাপকের ঠিক নাকের ডগায়। অধ্যাপক মুখ ফিরিয়ে নিলেন তীব্র বিতৃষ্ণায়। সকলে বুঝল অধ্যাপক আর নামবেন না।

আলোচনায় ভাবগাম্ভীর্য আনল শিবনারায়ণ। সে অল্প বলে কিন্তু গভীর ক'রে। বয়সে তরুণ হলেও তাকে আমরা সমীহ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় তার কৃতিত্বের জন্যও বটে। শিবনারায়ণ মার্জিত গলায় বলল,—"আজকের পৃথিবীতে কোনো অগ্রসর দেশ কিন্তু ক্রিকেট খেলে না। বিজ্ঞানে ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ জার্মানী, বৈদগ্ধ্যে ও বিলাসে অগ্রণী ফ্রান্স, মানবমুক্তিতে রক্তোজ্জ্বল রাশিয়া, কিংবা বেগে ও ভোগে প্রবল আমেরিকা, এমন কি কর্মে অশ্রান্ত, বর্ণে পীত চীন পর্যন্ত—কেউ ক্রিকেট খেলে না।"

শিবনারায়ণের ব্যবহারে রীতিমত ক্ষুব্ধ হল ক্রিকেট-পক্ষীয়েরা। আলোচনার সবচেয়ে ঘন বিন্দুতে ইতিপূর্বে সে সশব্দে তিন চারটে হাই তুলেছে। আমরা কিছু মনে করিনি। কারণ এর আগে সে এক দিন মেনে নিয়েছে--কোয়ান্টাম থিয়োরীতে বীতস্পৃহ হয়ে আমরা মোটেই অন্যায় করব না যদি না তাকে ক্রিকেট ফুটবল ইত্যাদির মধ্যে টানাটানি করি। সেই আপসের পটভূমিকায় ক্রিকেটের পৃষ্ঠে

তার এ কী অতর্কিত ছুরিকাঘাত! তাছাড়া অমন সাজানো বাংলায় ভাষণ! কিন্তু তাকে খাতির করতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সমান গভীরতার সঙ্গে বোঝাবার চেষ্টা করতে হল। বললুম,—"দেখো, তোমার যুক্তি অনুসারে কোনো কিছুর অভাবই হচ্ছে যেন তার গুণের কারণ। দোষের অভাব গুণের কারণ হতে পারে, গুণের অভাব গুণের কারণ হয় না। তোমার ঐ সব আদরের দেশের তুলনায় ইংলণ্ডও কম সভ্য বা অগ্রসর নয়। তার উন্নতির কতকগুলো লক্ষণ আছে। ইংরেজ পৃথিবীতে বড় যে যে কারণে, তার তিনটে প্রথমেই মনে আসবে—রাষ্ট্রব্যবস্থায় পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, সাহিত্যে নাটক এবং খেলায় ক্রিকেট। পৃথিবীর অন্য দেশ যে ক্রিকেট খেলেনা সেটা তাদের অগৌরব।"

অবজ্ঞার অন্যমনস্কতায় কান খুঁটছিল মণিশঙ্কর। আমার বক্তৃতার কোনো প্রভাব তার উপর পড়েছে মনে হল না। ঠোঁট উল্টে বলল,—"ক্রিকেট আবার খেলা! রঙিন মাছ যেমন মাছ নয়—"

নিরীহভাবে বললুম,—"ক্রিকেটের পক্ষে বলছ না বিপক্ষে?"

"তার মানে?"

"রঙিন মাছ বললে ক্রিকেটের প্রশংসাই করা হয়। কাতলা, রুই হলে সেটা খাওয়ার জিনিষ হত, খেলার হত না।"

মিত্তিরদা এবার মণিশঙ্করের পক্ষ নিলেন।—"যাই বল, ক্রিকেটের সব ঢঙ্ ভালো নয়। যেমন মুহুর্মুহু রেকর্ড হওয়া আবার ভাঙা। গ্রামোফোন রেকর্ডের মতই ভঙ্গুর।"

রমেন মিত্তির হাততালি দিয়ে বললেন,—"বাহবা দাদা, বলেছ ভালো। এবার থেকে ক্রিকেট-রেকর্ডকে বাক্সবন্দী ক'রে তার উপর লিখে দিতে হবে—'উইথ কেয়ার'। রেকর্ডগুলো তন্বী তরুণীর মতই ডেলিকেট।

প্রতিবাদ ক'রে বললুম,—"ঠিক উল্টো। ক্রিকেট পুরুষের খেলা। তাই তার রেকর্ড ভঙ্গুর। অর্থাৎ এক কীর্তি এগিয়ে গিয়ে নতুন কীর্তিকে ডাক দেয়। পুরোনো রেকর্ড ভাঙে, নতুন রেকর্ডের সৃষ্টি

হয়। চিরকালের জিনিষ পাওয়া যাবে নীতিকথামালা বা হিতোপদেশে।"

অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় অনিচ্ছাতেও ব্যুত্থান করলেন; স্নিগ্ধ হাস্যবর্ষণ ক'রে বললেন,—"শ্রীমানের ক্রিকেটে উৎসাহ আছে মানছি, কিন্তু অলঙ্কারপ্রয়োগে একটু সাবধান হলে ভাল হয়।"

মণিশঙ্কর দম নিচ্ছিল। আমার দুর্দশায় খুশী হয়ে বলল,—"ক্রিকেট মাঠে গেলে আমার আটকড়াইয়ে যাওয়ার কথা মনে হয়। কুলো পিটানোর মত চড়বড় ক'রে হাততালি পড়ছে আর খড়মড় ক'রে খাবার চিবোচ্ছে মাঠসুদ্ধ লোক।"

মণিশঙ্করকে সমর্থন করলেন রমেন মিত্তির। বললেন,—"ঠিক বলেছ, আমি একবার মাঠে গিয়েছিলুম। দেখলুম, প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার ক'রে হাততালি। পাশের এক ছোকরাকে জিজ্ঞাসা করলুম—ভাই, হাততালি কেন? সে হাঁ ক'রে বললে, তা তো জানিনা, সকলে দিচ্ছে, দিচ্ছি। অন্য পাশের ভদ্রলোককে শুধাতে তিনি বললেন, কোন্ হাততালির কথা জিজ্ঞাসা করছেন, প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা কারণ। আমি বললুম, অন্ততঃ এইটার? ইতিমধ্যে আর একটা হাততালির সময় এসে গিয়েছিল। সেটা সেরে নিয়ে ভদ্রলোক জানালেন, আগের হাততালিটা ছিল লক্ষতম নো-বলের।—আর গত হাততালিটা?—১৮৭৩ সালের পরে একই ম্যাচে একই খেলোয়াড়ের দ্বারা দ্বিতীয়বার ২৫টি ক্যাচ ফসকানোর। আমি ভড়কে গেলুম। ক্যাচ ফসকানোর হিসেব আছে? হাততালি দিতে দিতে ভদ্রলোক বললেন,—সব আছে, স্লিক-এ ওভার-বাউণ্ডারী, হাঁচির পরে সেঞ্চুরী, কাশির পরে ক্যাচ, হাইতোলার পরে ডিক্লেয়ার, সবের হিসেব পাবেন। শুনতে শুনতে আমার হাঁ বড় হয়ে গিয়েছিল। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনার দাঁত খারাপ। তারপর বললেন, ক্রিকেটে ভদ্রতাই আসল। আমরা সব কিছুতেই হাততালি দিই। সেঞ্চুরীতে দিই, শূন্যে দিই, রানে দিই, রান-আউটে দিই, খেললে দিই, খেলা

ছেড়ে দিলে দিই, শুকনো মাঠে দিই, ভিজে মাঠে দিই। কোথাও বিশ্রাম নেই। উইকেট পেলে দিই বোলারকে তাতাবার জন্য, না পেলে দিই বোলারকে তাড়াবার জন্য। ক্রিকেট আসল বস্তু হচ্ছে সহবৎ। এসব যদি না জানেন, মাঠে এসেছেন কেন ?—না না মুখ খুলবেন না, আপনার দাঁত খারাপ। আমি দাঁতে দাঁত চেপে আমার শেষ প্রশ্নটা কোনোক্রমে পাড়লুম—আগামী হাততালিটা কিসের জন্য হবে ? বলতে বলতে প্রবল হাততালিতে মাঠ ডুবে গেল। উন্মত্তের মত হাততালি দিতে দিতে ভদ্রলোক প্রাণপণে চেঁচিয়ে বললেন—হাততালির কোটি জয়ন্তী হল।"

সকলে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম,—"এমন একটা উপভোগ্য আলোচনা ক্রিকেটই সৃষ্টি করতে পারে।"

সভাপতি মিত্তিরদা উঠে পড়তে মণিশঙ্কর গোঁ-ভরে দাবি করল,—"কিন্তু তর্কের ফলাফল ?"

"সময়াভাবে ড্র"—মিত্তিরদা বললেন।

মণিশঙ্কর এতক্ষণ বসেছিল। তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে বলল,—"কি সব আজে বাজে আলোচনা করছি রবিবারের সকালে বসে। কখন ছেলেরা মাঠে ব্যাট-বল পেতেছে। চলুন, চলুন।"

সমালোচকের সমালোচক

মাঠে হাজির হতেই পটলার সঙ্গে দেখা। পটলাকে আপনারা চেনেন না সাক্ষাৎভাবে কিন্তু যে-কোনো শ্রীমান্ পটলাকে দেখেছেন নিজেদের পাড়ায়। তুখোড় ছেলে। প্রায়ই গ্রাণ্ড-গ্রেট ইস্টার্নে যায় সিনেমা-তারকাদের সঙ্গে দেখা করতে। হোটেলের ভিতরে অবশ্য তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না, তবে তাতে কিছু এসে যায় না, রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই দেখাসাক্ষাৎটা সেরে নেয়। তার প্যান্টের পকেটে থাকে সিনেমা-পত্রিকা। পত্রিকায় ছাপা রঙ-বেরঙের ছবির সঙ্গে আসল

মানুষটার মিল বা গরমিল সে চোখের ক্যামেরায় ও মুখের টেপে, রেকর্ড ক'রে নেয়, পরে পাড়ায় এসে মুখ-চোখের রেকর্ড চালাতে থাকে অবিরত।

পটলার আর দুটো আকর্ষণবস্তু—সরস্বতী ও ক্রিকেট। মা সরস্বতী কোন্ পাড়ায় কোন্ স্টাইলে বিরাজ করছেন, কোনারক থেকে কোন্ বাণীবিদ্যাদায়িনীর আবির্ভাব হয়েছে, কোন্ বাঁকা-মুখ সরস্বতী এপস্টাইনের ভাস্কর্য এবং কবিগুরুর ছবি মিলিয়ে ভুবনে অঙ্গ ধরেছেন, সে বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ অনেক বক্তৃতা শুনেছি পটলার কাছ থেকে। এ সব ব্যাপারে আমার মধ্যযুগীয়তা তার কাছে নিতান্ত ধিক্কৃত। পটলার সঙ্গে আগে আমার খুবই হৃদ্যতা ছিল, ইদানীং সেটা কিছু কমেছে—আমি ক্রিকেট-লেখা শুরু করার পর থেকে। আমারই দোষ। আমি অত ভুল লিখি কেন? পটলা আমার সব দোষ ধরিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, অপরের ভালো লেখা দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে। সে মাঝে মাঝে আমাকে দু'একটা 'কোশ্চেন' করে করুণা ক'রে। দু'এক কথায় তার পরেই থামিয়ে দেয় অনুগ্রহ ভরে।—থাক্ থাক্, আপনি যা বললেন, সেটা অমুক চন্দ্র অমুক অনেক ভালো ক'রে বলেছেন অমুক জায়গায়। এখানেই যদি শেষ হত! তার আদর কাড়বার জন্য আমি একবার পাঠক-পাঠিকার কিছু মুগ্ধ চিঠি পটলাকে দেখিয়েছিলুম। ফল হয়েছে মারাত্মক। পটলা আগে শুধু নিন্দে করেই ক্ষান্ত হত, এখন নিন্দাত্মক প্রস্তাবটি পূর্ণভাবে পেশ করার পরে পরিশেষে যোগ ক'রে দেয়—না, আপনাকে এসব বলে ফল কি, আপনি তো আপনার সোহাগের পাঠক-পাঠিকার চিঠি হাজির করবেন এখনি।

কী লজ্জা! কোথায় খোঁচা দিলে মানুষ আহত হয় অথচ প্রতিবাদ করতে পারে না, পটলা তা ঠিক জানে। আজকাল তাই তার উপর আমার একটা জাতক্রোধ এসে গেছে। বিশেষত গত দুদিন ধরে তার উপর আগুনের মত জ্বলছি। কারণ, পটলা নয়—পটলার বাবা।

কয়েকদিন আগেকার কথা। ভদ্রলোক মহা খাপ্পা হয়ে আমাকে বললেন,—মশায়, আপনাদের জ্বালায় আর তো পারা যায় না।

একটু অবাক হলুম। ভদ্রলোক শান্ত প্রকৃতি। দেখা-সাক্ষাতে অমায়িক হাসি মিশিয়ে হেঁ হেঁ করেন। তিনিই এমন চড়াও হয়ে আক্রমণ করছেন! দোষের কি কারণ থাকতে পারে ভাবতে চেষ্টা করলুম।

অজয় বোস কে?—রীতিমত চড়া গলা।

আজ্ঞে—কোন্ অজয়—মানে—

যে-অজয় রেডিওতে খেলার কথা বলে—

আমি আলোক পেলুম। ওঃ—যুগান্তরের অজয় বোসের কথা বলছেন? ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার ঠিক আলাপ নেই, কিন্তু কি চমৎকার বলে শুনেছেন? ওঁর সঙ্গে ছিলেন কমল ভট্টাচার্য, বিখ্যাত ক্রিকেটার। মার্ভেলাস বলেছেন রেডিওতে এবার ক্রিকেট নিয়ে।

কচু—যাচ্ছেতাই—বোম্বেটে—। বোমার মত ফেটে পড়লেন প্রতিবেশী মহাশয়।

আমার চোখ কপালে উঠে গেছে—মুখের অবস্থা শোচনীয়।

মহা বিরক্তিভরে থুতুর পিচ কেটে ভদ্রলোক হতশ্রদ্ধ গলায় বললেন—ও কি, অমন করবেন না, আমার হার্টের ট্রাবল্ আছে।

ওরে বাবা, রীতিমত সাবধানী ব্যক্তি! একটু বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম—তা কমলবাবু, অজয়বাবু করলেন কি আপনার?

করেন নি কি? আমার 'ওয়াইফ' আর আমার ছেলের মাথা চিবিয়ে খেয়েছেন।

আমার মুখ যা-তা হয়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি সামলে নিলুম। মনে মনে বললুম, অজয়বাবুদের সুখাদ্যপ্রীতি বটে! বাইরে বললুম—মশায়, ঠাণ্ডা হয়ে বলুন হয়েছে কি?

হবে আবার কি,—ভদ্রলোক দ্রুত বেগে আমার মুখের সামনে সাঁই সাঁই দু'হাত নেড়ে চাপা বিষাক্ত গলায় বললেন,—চায়নাম্যান কাকে বলে?

—কেন চীনেম্যানকে।

হুঁঃ। গুগলি কাকে বলে?

গুগলি—ইয়ে—কোন্ গুগলি?

গেঁড়ি আর গুগলি! হয়েছে। মুরোদ বোঝা গেছে। বাড়ী যাচ্ছি, পটলার মাকে গিয়ে বলছি, খবরের কাগজের পাতা জোড়া ক'রে যাদের রাবিশ ছাপা হয়, তারাও তোমার চায়নাম্যান-গুগলি বোঝে না।

ব্যাপারটা এতক্ষণে বোঝা গেল। ভদ্রলোকের স্ত্রী কমল-অজয়ের বাংলা ধারাবিবরণীর কল্যাণে কিছু ক্রিকেট শিখে স্বামীকে জ্বালিয়েছেন। একটু হেসে বললুম,—বৌদি বুঝি আপনাকে ঐ সব কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

ভদ্রলোক এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে গেলেন।—দুঃখের কথা কি বলবো মশাই, তেতেপুড়ে অফিস থেকে ফিরেছি, কোথায় আপনার বৌদি হাতপাখা নিয়ে বাতাস করবে, পাঁচটা মিষ্টি কথা বলবে, তা নয়, ঐ সব চীনেম্যান গেঁড়ি-গুগলির কথা। আমি একটু রাগ করতে,—মেজাজটাও ভালো ছিল না, অফিসে এক কেল্টে সায়েবের সঙ্গে খিটিমিটি হয়েছে,—বিতিকিচ্ছিরিভাবে বললে,—ভাগ্যে পটলাটা তার বাপের মত হয়নি। সে এসব জানে। যাই, তাকেই জিজ্ঞেস করি। এই বলে পটলার গর্ভধারিণী পটলার সঙ্গে ক্রিকেটের আলোচনা করতে উঠে গেলেন। না জলখাবার, না চা, কিচ্ছু নয়। হবে কি ক'রে সারা দুপুর রেডিওতে—'কি বল অজয়?—হ্যাঁ কমলবাবু'—এই সব শুনলে জলখাবার করবার টাইম মিলবে কোথা থেকে? বলেই ভদ্রলোক আকাশের দিকে চোখ উলটে বৈরাগ্যভরে বললেন,—হা রে সংসার! সংসার না অরণ্য!

এবং সেই অবস্থায় ওল্টানো চোখে একটু তির্যক্ তাকিয়ে শুধোলেন—ক'টা বাজে?

বললুম,—সওয়া আটটা।

তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠে ভদ্রলোক বললেন,—আচ্ছা লোক তো

আপনি! দেরি ক'রে দিলেন। বাজার ক'রে ফিরব কখন? অফিসে যাব কখন? এদিকে পটলার মার মেজাজ, ওদিকে কেপ্টে সায়েবের মেজাজ। হন্ হন্ ক'রে বাজারের দিকে দৌড়তে দৌড়তে ভদ্রলোক ঘৃণাভরে বললেন—আপনাকে একটি বাম্পারে থেঁতলে দেওয়া উচিত।

অ্যাঁ—কি বললেন?

তার আগেই তিনি অদৃশ্য।

বুঝলুম, ক্রিকেট কোথায় প্রবেশ করেছে। পটলা বা পটলার মা নন, পটলার বাবাও ধরা পড়েছেন। তাঁর কানেও কমলবাবু-অজয়বাবুর বাংলা-গলার 'বাম্পার' ঠেলে ঢুকেছে।

এহেন পিতা-পটলের পুত্র-পটলকে সমীহ ক'রে চলতেই হয়। তাকে ভয় করবার আরো বিশেষ কারণ, পটলা যে গলি-ক্লাবের সেক্রেটারী সে গলিটি আমার জানালার পাশে। জানলায় বলাবাহুল্য কাঁচ আছে। পটলাকে অনেক তোয়াজ করি—দেখো ভাই, বুঝতেই পারছ, ছেলেপুলে নিয়ে টানাটানির সংসার—। পটলা মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট উলটে উদাসীনভাবে বলে,—কী করা যাবে! ভারী তো কাঁচের দাম। ওটাকে চাঁদা বলে ধরে নেবেন। তারপরে হঠাৎ ফিরে চোখে কুঁচকে ঠোঁট সরু ক'রে ধারালো গলায় জিজ্ঞাসা ক'রে বসে,—আপনি না লিখেছিলেন—সিড বার্নসরা গলিতে প্রাকটিশ করার সময়ে কাঁচের জানলা ভাঙত! আপনার লেখা পড়ে তো মনে হয়েছিল, যাদের জানলা ভাঙছে তারাই শয়তান, তারা উঠতি জিনিয়াসদের বাধা দিচ্ছে।

সর্বনাশ! ছোঁড়া সব মনে রেখেছে। দু'কথায় আমাকে শয়তান বানিয়ে ছেড়ে দিলে। একে কি ক'রে বোঝাব, আমরা কলম ধরলে বিশ্বপ্রেমিক, কিন্তু প্রতিবেশীর বাপান্ত ক'রে এসে তবে সেই কলম ধরে থাকি!

আমারি প্রস্তাবে পটলা সেদিন গৃহিণীর কাছ থেকে লাঞ্চের আলুর দম তৈরী করিয়ে নিয়ে গেল।

তবু পটলা আমাকে ফেভার করে। আমাকে গলি-ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট করেছে। প্রেসিডেন্ট করতে পারে নি, কারণ ক্রিকেটের দুটো ইংরিজি বই পড়া বা বাংলায় ক্রিকেট নিয়ে দু'কলম লেখা প্রেসিডেন্ট হবার পক্ষে যথেষ্ট কোয়ালিফিকেশন নয়, বিশেষত পাড়ায় যখন বদ্রীদাসবাবু আছেন। বদ্রীদাসবাবু ক্রিকেটকে কম ভালবাসেন না, পঁয়ত্রিশ টাকার সিজন্ টিকেটে গোটা পরিবার নিয়ে ব্যেবসায়ের Zামেলা ফেলে খেলা দেখতে যান এবং তিনি এ বছরই পটলাদের ক্লাবে দুটো ব্যাট ও চারটে বল উপহার দিয়েছেন; সেখানে আট আনা চাঁদা দিতে আমার 'ধক্' গুটিয়ে যায়। তদুপরি পটলা তাঁর টিকেটে একদিন লাঞ্চ পর্যন্ত এক রূপালী কুমারীর পিছনে পঁয়ত্রিশ টাকার সিটে বসে খেলা দেখছে।

পটলাদের ক্লাবে ক্রিকেট সম্বন্ধে আমি বক্তৃতা করেছিলুম। তার আগে পটলার সঙ্গে ঝণ্টের হাতাহাতি হয়েছিল ক্রিকেট ও ফুটবলের আপেক্ষিক গুণাগুণ নিয়ে। ঝণ্টেকে ঘুঁষিতে কাত করেও পটলা সন্তুষ্ট হয়নি, তাকে যুক্তিতেও কাত করা দরকার। তারই হুমকিতে আমাকে ক্রিকেটের পক্ষে বক্তৃতা করতে হয়েছিল। বক্তৃতার আগে পটলা বলেছিল, মণিশঙ্করদার সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আপনার চেঁচামেচির কথা শুনেছি। ও রকম হালকা চলবে না, সিরিয়াস কিছু ছাড়ুন। শ্রীযুক্ত মুকুল দত্ত ভাবতে পারেন, তাঁর কথাতেই বুঝি ঐ 'সিরিয়াস' লেখাটি হয়েছিল। আপাতত তাই বটে। আসল কারণ কিন্তু পটলা।

খেলার রাজা

শ্রীযুক্ত বিনয় মুখোপাধ্যায় যখন ক্রিকেট সম্বন্ধে 'খেলার রাজা' শব্দ দুটি ব্যবহার করলেন, তখন আমরা সে কথাগুলিকে অবিলম্বে স্বীকার ক'রে নিলাম। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় King of games-এর অনুবাদ করেছিলেন। অথচ অনুবাদ মনে হয়নি কারণ ক্রিকেট ইতিমধ্যেই খেলার রাজারূপে আমাদের মনোজগতে আসন নিয়েছে।

ক্রিকেট আগে ছিল 'রাজার খেলা'। এখন হল 'খেলার রাজা'। ক্রিকেট যতদিন রাজার খেলা ততদিন তার সঙ্গে আমাদের বিরোধ। ভারতের মাটি ও মাঠ থেকে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করতে আমরা প্রাণপণ করেছি। রাজার খেলাকে খাতির করব কেন? কিন্তু যদি খেলার রাজা হয়?

সে ক্ষেত্রে অবশ্য রাজদর্শনের জন্য লোকে সাধনা করতে পারে, যেমন করছে শীতের রাত্তিরে ইডেন নামক রাজসভাগৃহের চার-পাশে লাইন দিয়ে। যারা রাত জেগে বসে আছে, তাদের কাউকে লর্ড বলে সন্দেহ হয় না। ক্রিকেট বিলাসের সৃষ্টি, ধনীর সাধ্য, আলস্যের আশ্রয়, এইসব নিন্দে আর কেউ শুনছে না। ক্রিকেট রাস্তায় নেমেছে। কানা গলিতে ইট সাজিয়ে তক্তা-কাঠের ব্যাট, টেনিস বলে ক্ষুদে ব্রাডম্যানেরা ক্রিকেট খেলছে। তারা খেলছে, কখনো মিলারের ঔদ্ধত্যে, কখনো জয়সীমার ধৈর্যে। তারপর তারা খবরের কাগজে তাদের হীরোদের কাহিনী পড়ছে। লাইন দিচ্ছে সারারাত, এবং টিকেট না পেলে ভিড় করছে গাছের ডালে কিংবা ল্যাম্প পোস্টের মাথায়; কিংবা তাও সম্ভব না হলে ইংরেজি-বাংলা রেডিও শুনে বীরবিক্রমে লাফাচ্ছে। ক্রিকেট যে রাজা-খেলা তার অখণ্ডনীয় প্রমাণ, আমাদের ঘরের রাজকন্যারা কাঁচা ও তাজা উপন্যাস ছেড়ে দুপুরে শুনছে বাংলায় ধারাবিবরণী।

আমার পাঠক এতেই সন্তুষ্ট হবেন না। ক্রিকেটের পক্ষে আরো কিছু দাবি করবেন। তাঁদের অতি প্রিয় ফুটবল আছে, যাতে রক্ত গরম হয়ে ওঠে; আছে হকি, যাতে ভারত সবে অদ্বিতীয়ত্ব ত্যাগ ক'রে দ্বিতীয় হয়েছে, আছে রাগবি, ভলি, বাস্কেট, বক্সিং। নৌকা চড়া, সাঁতার কাটা, দৌড়ানো (মাঠে বা বরফে), লাফানো—খেলার কি ইয়ত্তা আছে? এদের সকলকে ত্যাগ ক'রে ক্রিকেটকে শিরোপা দেওয়া?

বলাবাহুল্য আপনারা সত্যই মারামারি-করা রাগবি, বলে ঘুষি-মারা ভলি কিংবা নাকে ঘুষি-মারা বক্সিং-এর পক্ষে বেশী কিছু দাবি করছেন

না। 'নববাবুবিলাস' টেনিস, বা 'নববিবিবিলাস' ব্যাডমিণ্টনের সম্বন্ধেও বাড়াবাড়ি করা সম্ভব নয়। বাকি থাকছে হকি ও ফুটবল। হকিও বাদ দিন। ভারত খুব ভাল হকি খেলে এটা হকির সার্টিফিকেট হতে পারে না। ঐ কাঠিনৃত্য ও লাঠিচালনা যখন জনচিত্ত হরণে অসমর্থ হয়েছে তখন 'খেলার রাজা' এই মহান উপাধি থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়াই ভাল। সুতরাং ফুটবল। ক্রিকেটের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। ফুটবল সারা পৃথিবীর। জনপ্রিয়তায় ক্রিকেটেরও অগ্রগণ্য। ফুটবল মাতোয়ারা ক'রে তোলে। ফুটবল আগুন ছোটায়। খেলোয়াড়দের পায়ে আর গায়ে আগুন। সেই আগুন দর্শকদের বদনে ও বপুতে।

পাঠক! এমন অগ্নিকাণ্ড ঘটায় যে-খেলা তাকে খেলার রাজা বলবেন?

অন্যের নিন্দে থাক। বিপক্ষের বদ্‌গুণ অপেক্ষা স্বপক্ষের সদ্‌গুণের আলোচনায় বেশী ফললাভ। ক্রিকেট মহান খেলা কারণ ক্রিকেটের সাহিত্য আছে। সাহিত্যের মূলে থাকে জীবন। খেলার সাহিত্য যদি একমাত্র ক্রিকেটের থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ক্রিকেটই সবচেয়ে জীবনময় খেলা।

ফুটবলের চেয়েও? যে-ফুটবল দমবন্ধ দৌড়ে প্রতি মুহূর্তে প্রমাণ করছে আমি বেঁচে আছি। হাঁ। জীবন বলতে কেবল উত্তেজনা বোঝায় না। জীবন অনেক ব্যাপক। উত্তেজনা, আবেগ ও শান্তির নানারূপী বিন্যাস সেখানে। জীবনে আছে সূচনা ও সমাপ্তি। উভয়ের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনের তরঙ্গগতি। ক্রিকেট সেই খেলা। ক্রিকেট জীবনের ক্রীড়া-সংরক্ষণ।

খুব সাহসী হয়ে মস্ত একটা দাবি উপস্থিত করেছি ক্রিকেটের সম্বন্ধে। প্রমাণ দিতে হবে? নিশ্চয়। ধরা যাক, এই খেলার ব্যাপ্তিকাল। কোনো খেলাই এত বেশী সময় ধরে হয় না। সবচেয়ে কম ধরলে অন্তত অর্ধ দিন, বেশী ধরলে, খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। সাধারণভাবে তিন থেকে ছয় দিন। এই কালদৈর্ঘ্য খেলাটিকে জীবন-প্রকাশের উপযোগীরূপে প্রশস্ত করেছে। কিন্তু এই যে বেশকিছু

'সময়ের খেলা, এর মধ্যে কি স্থির বলে কিছু আছে? নিশ্চিন্ত কোনো সময়ে হওয়া যায়? ব্রাডম্যান ব্যাট ধরলে 'ঘুমিয়ে নেওয়া যাক' বলে চোখ বুজত যে বেরসিক ইংরেজ—সেই ব্রাডম্যানও শূন্য রানে বিদায় নিয়েছেন। কতবার শূন্য হাতে ফিরে গেছেন ডবলিউ জি গ্রেস। আবার অতিবড় আনাড়ীও বার বার চান্স পেয়ে বড় স্কোর করেছে। হয়ত এক চুলের জন্য বল উইকেট লাগেনি, বোলার মাথা চাপড়েছে। ব্যাটসম্যানের জামায় লেগে ঘুরে গিয়ে বল 'বেল' ফেলে চলে গেছে। এবার মাথা চাপড়েছে ব্যাটসম্যান। এরই নাম অনিশ্চয়তা। অপ্রত্যাশিতের অনুভূতির জন্য প্রস্তুত মন নিয়ে বসে থাকতে হয় ক্রিকেট মাঠে। ক্রিকেটের প্রতিটি বল নতুন।

বোলিং, ব্যাটিং, ফিল্ডিং, যে দিকেই তাকানো যায় না কেন, ঐ মহান অনিশ্চয়তাটা জ্বলজ্বল করছে। গুপ্তের বলে পর পর তিনটে ওভার-বাউণ্ডারী হতে তাঁকে হাততালিতে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার এমনও হয়েছে, ধরা যাক, দিনের শেষ তিন বলে তিনটে উইকেট পেয়েছেন। তখন খুশীর হাততালিতে চেটোয় ফোস্কা। শিশিরভেজা মাঠে ফাদকার প্রথমবার বেল, দ্বিতীয়বার স্টাম্প ছিটকে দিয়ে যে করতালির সংবর্ধনা পেয়েছেন, তা হাতেই শুকিয়ে গেছে যখন এক ওভারে ১৮ রান দিয়েছেন। মানকদকে না আনলে যত অধৈর্য, তেমনি আমাদের ইচ্ছামত উইকেট কুড়ুতে না পারলে সমান অসহিষ্ণু। ডলি ক্যাচ ফেলে যে খেলোয়াড় চাপা দাঁতের গাল খেয়েছে, সে যখন রাশিয়ান সার্কাসের ডিগবাজি দিয়ে অবিশ্বাস্য ক্যাচ ধরেছে, তখনো পেয়েছে চাপা দাঁতের গাল,—তবে ভালবাসায় চর্বিত। টসে জিতেও যে ক্যাপ্টেন ব্যাটিং নেয়নি, প্রথম ওভারে ঝড়াঝড় দুটো উইকেট খসে পড়তে তাকে লাটের আসনে তুলেছি। কিন্তু তারপর যখন আর উইকেট না পড়ে দিনের শেষে দু'উইকেটে ৩২২ রান হয়েছে, তখন পারলে ক্যাপ্টেনকে ঠেঙিয়ে লাট ক'রে দিতুম।

মাত্র অনিশ্চিত বললে ক্রিকেটের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। বেশ কিছু কমই বলা হয়। বলা উচিত নাটকীয়। পরিবর্তন ও

অনিশ্চয় নাটক সম্বন্ধে কিছু কথা। মূল কথা, গতি ও সংঘাতে চরিত্রের ও ঘটনার বিকাশ। তার উপর নাটকে আছে নিয়তির প্রভাব। ক্রিকেটে সবই মিলবে। খেলাটি কোনো একটি স্থানে থেমে নেই। একেবারে সমাপ্ত নয় কখনো। সকল খেলায় একেবারের জন্য একটি ইনিংস, ক্রিকেটে দুটি। ক্রিকেটের এখানে অদ্বিতীয়ত্ব। একজন ব্যাটসম্যানকে তার একটি মাত্র ভুলের জন্য বিদায় নিতে হতে পারে, অপরপক্ষে তেমনি গোটা দলটি আর একবার সুযোগ পায় সমবেত শক্তিপ্রমাণের। একদিকে অ-স্থিরতা, অন্যদিকে অতিরিক্ত সুযোগ। ফুটবল হোক, হকি হোক, যত খারাপই খেলুক, বসিয়ে দেওয়া যায় না খেলোয়াড়কে, কিন্তু ব্যাটসম্যান খারাপ খেললেই সরে পড়তে হয় তাকে, এবং বোলার খারাপ বল দিলে অধিনায়ক তাকে সরিয়ে দেন বেড়ার ধারে। অথচ গোটা দল পাচ্ছে দ্বিতীয় ইনিংস, ব্যর্থতা সংশোধনের আর একটি সুযোগ।

কেবল কি একটি খেলায় দুটি ইনিংস? দলকে আরো সুয়োগ দেয় ক্রিকেট। টেস্ট ম্যাচ সিরিজ-হিসাবে খেলা হয়। সিরিজের ফলাফলে ফলাফল। আজকের দিনে প্রচলিত পাঁচ টেস্টের সিরিজকে পঞ্চাঙ্ক নাটকের সঙ্গে তুলনা করা যায় সহজে। এখানেই শেষ নয়, এক মরশুমের একটি সিরিজের জন্য সাময়িকভাবে দর্শকে ব্যস্ত হলেও তার কাছে ক্রিকেটের শেষ হিসেব সব সিরিজ জড়িয়ে। ক্রিকেটের রেকর্ড। রেকর্ড ছাড়া ক্রিকেট নেই। ইতিহাসের পটভূমিকায় সব কিছুর বিচার হয় ক্রিকেটে। যেমনি বলব, এই দলটি শ্রেষ্ঠ, অমনি কথা উঠবে, এ ছাড়াও অনেকে শ্রেষ্ঠ ছিল। যদি বলি একটি সেরা খেলা, ইতিহাসের পাতা উল্টে রেকর্ড-রসিক জানাবেন, অমুক অমুক খেলার সম্বন্ধেও হাজির করা হয়েছিল একই দাবি। আপনি হয়ত বলে ফেললেন, এমন খেলোয়াড় হয়নি, অমনি কথা উঠল, সে কি কথা, ঐ ঐ খেলোয়াড়ের কথা মনে নেই বলেই এমন কথা বলতে পারছ।' অর্থাৎ ব্রাডম্যানের ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার দলকে শ্রেষ্ঠ বললে ১৮৯৮-৩ ১৯০২ সালের ডার্লিং-এর দল, বা ১৯২১ সালের আর্মস্ট্রং-এর

দলের যোগ্যতার বিচার না করলে খুবই অন্যায় করব। ১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্রিসবেন টেস্টকে উচ্ছ্বাসের মাথায় সর্ব-কালের সেরা টেস্ট হয়ত বলা চলে, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় বলতে হলে অনেক কিছুকে হিসাবের মধ্যে আনতে হবে, অন্তত 'গ্রেটেস্ট টেস্ট ম্যাচ' রূপে বহুকথিত ১৮৮২ সালের ইঙ্গ-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ম্যাচের কথা ভোলা চলে না। তুমি বলছ, মোরিস বাঁ হাতের সেরা ব্যাটসম্যান, সে ক্ষেত্রে হার্ভের কথা তোমার নিশ্চয় মনে নেই। নিশ্চয় তুমি ফ্রাঙ্ক উলীর বা গারফিল্ড সোবার্সের কথা কিছু সময়ের জন্য বিস্মৃত হয়েছ।

ক্রিকেটকে তাই পর্যবেক্ষণ করতে হয় বৃহত্তর পটভূমিকায়। এর অন্য বৈশিষ্ট্যের দিকে নজর দেওয়া যাক। পারিপার্শ্বিকের উপর এমন নির্ভরশীল খেলা আর নেই। তা না হয়ে পারে না, যেহেতু ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন খেলা হয়ে থাকে। খেলোয়াড়কে সচেতন থাকতে হয় দর্শক, মাঠ, আবহাওয়া, সব-কিছু সম্বন্ধে। দর্শকেরও বিশেষ ভূমিকা আছে এই খেলায়। সে চেঁচিয়ে লাফিয়ে ব্যাটস-ম্যানকে ঘায়েল করতে পারে। এবং সে সর্বক্ষণ মানসিকভাবে সক্রিয় থাকে। ফুটবলের মত খেলায় দর্শক উত্তেজনায় অবিরত নাচে, কিন্তু ক্রিকেট, যেখানে বোলার ধীর চিন্তা করছে আক্রমণের, ব্যাটসম্যান তৎপর হয়ে দ্রুত আত্মরক্ষা করছে, সেখানে খেলোয়াড়দের সঙ্গে দর্শকও চিন্তা করছে। উচিত অনুচিত সম্বন্ধে তারও একটা বক্তব্য আছে। উত্তেজনার কথা যদি বলতে হয়, ফুটবলাদির সঙ্গে ক্রিকেটের উত্তেজনায় জাতের তফাত। যখন ঝটাপট উইকেট পড়ছে, বা রান উঠছে ঝড়ের বেগে, তখনকার চাঞ্চল্য ফুটবলের সমতুল কিন্তু সংঘাতে সংঘাতে এগিয়ে যখন খেলাটি চরমে পৌঁছয়, তখনকার সে উদ্বেলতা ও উদ্বেগের একমাত্র তুলনা শ্রেষ্ঠ নাটকের শেষাঙ্কের সঙ্গে যেখানে অসহ্য আবেগ মথিত হয় দর্শকচিত্ত। ইতিহাসের দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নেই, ক্রিকেট-দর্শক মাত্রেই অল্পাধিক পরিমাণে এ জিনিস দেখেছেন।

ক্রিকেটর আরো কত বৈশিষ্ট্য, যেমন টস্। টস্ এখানে সত্যই টস্—টসে জেতার উপরে অনেক কিছু নির্ভর করে এবং এখানে অধিনায়ক সত্যই অধিনায়ক, ফুটবলের অধিনায়কের মত নিজ দলের খেলোয়াড়কে শান্ত করতে রেফারীর সহযোগী শান্তি-সেনা নয়। আবহাওয়ার এখানে বিশেষ বিবেচনা। বৃষ্টি বা না-বৃষ্টি, জোর বা ধীর বাতাস, রোদ চড়া, না কড়া ঠাণ্ডা—হাজার হিসেব। ভিজে বা শুখনো ছাড়াও মাঠে ঘাস আছে কি নেই, মাঠ শক্ত কি নরম, ভাঙা কি গোটা, ধুলো না বালি, তার বিবেচনা। ক্রিকেটের আর একটি অসাধারণ জিনিস—ডিক্লারেশন। অসাধারণ একটি অধিকার। এই অধিকার পেয়ে অধিনায়ক তাঁর উপাধির যোগ্য হয়েছেন। টসে জিতে ব্যাটিং নেব কি ফিল্ডিং করব, কাকে কোথায় দাঁড় করাব, বল করবে কে, কখন ও কি ধরনের, ব্যাটিং করতে নামবে 'কেবা আগে কেবা পিছে,'—এ সব তো আছেই,—আরো আছে ঐ অপূর্ব অধিকারটি—ইচ্ছামত আমি আমার দলের খেলা শেষ করে দিতে পারি। খেলার মাত্রা প্রসারণ ও সংবরণের মারাত্মক দায়িত্ব। এ বস্তু যে কী চমকপ্রদ হতে পারে তার বহুল দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত মনে পড়েছে। ১৯৩৪ সালের ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বার্বাডোজ টেস্ট 'ছাড়াছাড়ির লড়াই' নামে বিখ্যাত। ইংলণ্ডের অধিনায়ক বব ওয়াট টসে জিতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জঘন্য মাঠে ব্যাট করতে পাঠালেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল ১০২ রান। ইতিমধ্যে পিচ আরো খারাপ। ওয়াল্টার হ্যামণ্ডের মত খেলোয়াড় (সর্বশ্রেণীর পিচে যাঁকে ব্রাডম্যানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলেন ইংরেজরা)—বললেন—"আমার জীবনে এত খারাপ পিচ দেখিনি। কেউ বলতে পারবে না বল কোথায় যাবে।" ইংলণ্ড খেলতে নামল। হ্যামণ্ড তাঁর জীবনের "কঠিনতম ইনিংস" খেলে যখন ৪৫ রান করলেন, তখন তাঁর মনে হল "ইতিমধ্যে শত শত রান করেছি।" দলের রান যখন ৭ উইকেটে ৮১, ওয়াট ডিক্লেয়ার করলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক গ্রাণ্ট দ্বিতীয় ইনিংসে দলের খেলোয়াড়দের যথেচ্ছ পেটাতে বললেন।

যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করেছে ৬ উইকেটে ৫১, দান ছেড়ে দিলেন—ইংলণ্ডের জয়ের জন্য "উদ্ভট রকমের সামান্য" ৭১ রানের ব্যবধান রেখে। ইংলণ্ড কি পারবে? পেরেছিল। "খুঁচিয়ে, ঠেকিয়ে, ককিয়ে, কুঁতিয়ে" শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ড জিতেছিল চার উইকেটে।

ক্রিকেটের মহিমার আরো প্রমাণ দোওয়া যায়। প্রধান প্রমাণ, এই হল একমাত্র খেলা যেখানে ব্যক্তিনৈপুণ্য ও দলনৈপুণ্যের সমান সমাদর। ফুটবল বা হকিতে দলনৈপুণ্য। কোনো এক জন বা দু'জন খেলোয়াড় হকি-ফুটবলে জেতাতে পারে না। বাঁচাতেও পারে না। চান্সের কথা বাদ দিচ্ছি। সামাদ হয়ত একার প্রতিভায় একটি অসামান্য গোল দিতে পারেন, কিন্তু তার আগেই তাঁর দল চারটি গোল খেয়ে বসে আছে। ক্রিকেটও দলের খেলা এবং শেষ পর্যন্ত দলেরই জয়। কিন্তু অন্যদিকে ব্যক্তির কার্যকারিতা প্রমাণের এমন উপযোগী খেলাও নেই। একজন খেলোয়াড় হারাতে বা জেতাতে পারে ক্রিকেটে। তেমন অজস্র দৃষ্টান্ত আছে ক্রিকেট-ইতিহাসে।

ক্রিকেটে ব্যক্তি-বিকাশের রূপ লক্ষ্য করা যাক। ব্যাটিং-পক্ষে মাত্র দু'জন মাঠে হাজির। তারা লড়াই ক'রে যাচ্ছে। কখনো তাদের ব্যাঘ্রবিক্রম, কখনো কূর্মপ্রস্থান। কখনো কলাপবিস্তার, কখনো গো-সহিষ্ণুতা। ভিজে মাঠে যে ঠেকা দিয়ে গেল, শুখন্ত মাঠে একবারও ব্যাট তুলল না, মরা মাঠে তার বেয়াড়া মারমুখী বীর্য। গতকাল সন্ধ্যার ঝোঁকে যে অন্তত আট বার কম আলোর আবেদন জানিয়েছে, আজ তেমনি সন্ধ্যায় তেমনি বা ততোধিক আচ্ছন্ন আলোয় নিজের ২৮৮ রানের মাথায় সেই খেলোয়াড়ই ক্রীজ ছেড়ে লাফিয়ে ওভার বাউণ্ডারী করছে। ক্রিকেট-ম্যাচের তিন থেকে ছয় দিনে অনেক প্রাতের আবুহোসনকে রাতের বাদশা, এর পরবর্তী প্রাতে পুনশ্চ আবুহোসেন হতে দেখা গেছে।

আবার যদি দলের খেলা রূপে ক্রিকেটকে দেখি। দেখব, কোনো ভিনু মানকদ কিছু ক'রে উঠতে পারছেন না, কারণ গোলাম আমেদ ও রুসী মোদীরা অবিরত ক্যাচ ছাড়ছেন। খেলায় ক্যাচ

ফসকাবেই, তা অবধারিত, যেহেতু ক্যাচ পতনশীল, কিন্তু যদি ২৫ রানের মাথায় ব্রাডম্যানের ক্যাচ পড়ে ? তাহলে দর্শকেরা নিশ্চিন্ত সেদিন ; সেরা ক্রিকেট দেখা দর্শক ও ফিল্ডস্‌মানের ললাটস্থ লিখন।

একটা ক্যাচ একটা ম্যাচের বরাত তৈরী ক'রে দিতে পারে। কয়েকটা ক্যাচ যেখানে এক হাত থেকে পড়ে, সেখানে ফিল্ডারের সাধকলক্ষণ,—হাতে জল থাকছে না। সে ক্ষেত্রে তাঁর ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিয়ে হিমালয়ে প্রস্থান করাই উচিত।

ক্রিকেটে তাই কথা আছে—রান করে যদি রান না করতে পারো, রান বাঁচিয়ে তোমার দান পূরণ করে দাও।

আবার জানেন কি, ক্যাচ ছেড়ে ফিল্ডার গৌরবভাজন হতে পারে ? ১৯২৬ সালে লীডস্‌ টেস্টে ম্যাকার্টনির যখন ২ রান, তখন আর্থার-কার তাঁর ক্যাচ ছেড়েছিলেন। ইংলণ্ডের ক্রিকেটের ধারাবাহিক দুর্দিন চলছে তখন। দর্শক এসেছে দলে দলে ইংলণ্ডের জয়কামনা ক'রে। সেই পরিস্থিতিতে ক্যাচ ছাড়ার সৌজন্যে মুগ্ধ ম্যাকার্টনি লাঞ্চের মধ্যে সেঞ্চুরী করলেন। মধ্যাহ্নবিরতির সময় চাঁই চাঁই ইংরেজ দর্শককে বলতে শোনা গেল—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আর্থার ঐ ক্যাচটি ছেড়েছিলেন ! নইলে এ খেলা দেখতে পেতুম না !

এ গেল ফিল্ডিং-পক্ষের কথা। ওদিকে যে দু'জন ব্যাটসম্যানকে মাঠে পাঠানো হয়েছে, তারা কি প্যাভিলিয়ান ছাড়ামাত্র স্বাধীন সন্তান ? ধরা যাক মিলার-লিণ্ডওয়াল বল করছেন। পূর্ব ইনিংসে তাঁদের বিরুদ্ধে কিছু বাম্‌পার ছাড়া হয়েছিল। দু'জনে তার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। এহেন অবস্থায় যে-ছোকরা ক্যাপ্টেনের নির্দেশ, ম্যানেজারের আশীর্বাদ, দর্শকের করতালি বহন ক'রে মাঠে নামল, সে কি পাঁচ উইকেটে ৩৫ রানের পরেও 'কার কি' ভঙ্গিতে দর্শকদের এন্টারটেনের দায়িত্ব নেবে, যেমন নিতেন মুস্তাক আলি বাঙালী দর্শকবৃন্দের বৈপ্লবিক হাততালির মর্যাদা রাখতে প্রথম বলেই বাউণ্ডারীর চেষ্টা ক'রে ?

সেটা ক্রিকেট নয়। ক্রিকেট হবে না। ক্রিকেট যা-খুশি ব্যক্তিত্বের অপহারক, যা-প্রয়োজন ব্যক্তিত্বের ধারক। মানুষ যেমন সমাজবদ্ধ প্রাণী, সমাজে যেমন সে পাঁচ জনের একজন, খেলার মাঠে ক্রিকেটার তেমনি এগারো জনের একজন।

ক্রিকেটের পক্ষে অনেক কথাই বললাম। তবু কিছুই বলা হল না। বলা হয়নি এই খেলায় স্টাইলের মূল্যের কথা। রেকর্ডের যেখানে এত সমাদর, সেখানে 'স্কোরবোর্ড একটা গাধা' বলবার মত রসিকতার সামর্থ্যের কথা। ক্রিকেটের পক্ষে এমনি পাতার পর পাতা লিখে যাওয়া যায়। সেসব কথা আর লিখব না, কারণ মেয়েদের মন, পুরুষের ভাগ্য ও ক্রিকেটের চরিত্র দেবতাও জানেন না, মানুষ তো ছার। বিভিন্ন জাতি এই খেলাকে বিভিন্নভাবে ভালবাসে। ইংরেজ বলে,—এ খেলা 'টিপিক্যালি ইংলিশ'। অন্য কারো পক্ষে এর পূর্ণ রস পাওয়া সম্ভব নয়। ভারতীয়েরা জানে, ইংরেজরা কী অগভীর। ভারতে না জন্মেও ক্রিকেট ভারতের একান্ত মনের খেলা। উপভোগের এমন ঢালাও রূপ আর কোনো খেলায় নেই। রাগ-সংগীতকে খেলার ভাষায় অনুবাদ করলে ক্রিকেট হয়ে দাঁড়ায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা জানে, ইংলণ্ড ক্রিকেটের জন্মদাতা হতে পারে কিন্তু ক্রিকেট না ফুটবল কোনটি ইংলণ্ডের জাতীয় খেলা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে, কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই একটি বিষয়ে—ক্রিকেট এবং একমাত্র ক্রিকেটই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জাতীয় খেলা। অস্ট্রেলিয়ানদের কাছে ক্রিকেট আপসের ও অবসরের যুদ্ধ এবং যে-কোনো অস্ট্রেলিয়ান এই যুদ্ধে নিজ পতাকার সম্মানরক্ষার জন্য গোটা ৬ দিন রণাঙ্গনে কাটাতে প্রস্তুত আছে। সত্যিই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠ দান ক্রিকেট এবং সাম্রাজ্যবাদ দগ্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে দান বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কৃষ্ণকায় প্রতিভার নীল দ্যুতিতে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন। 'ভারত শুধুই পিছায়ে রয়'—এও চিরদিনের জন্য সত্য না হতে পারে। হয়ত একদিন উলট পুরাণটা সত্যি হয়ে উঠবে। সেদিন পরাধীন ইংলণ্ডের মহাকবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলবেন,

হায়, ভারতবর্ষ এডমণ্ড বার্কের বদলে ডেনিস কম্পটনকে নিয়ে ব্যস্ত! একথা সেই দ্বীপবাসী মহাকবি বলতেই পারেন, কারণ একদিন পরাধীন ভারতের মহাকবি রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন দুঃখ ক'রে—কী দুর্ভাগ্য, ইংরেজরা রামমোহনের বদলে রণজিকে নিয়ে প্রমত্ত।

এসব কথাও ভুলে যান। মনে রাখুন একটি শীতের অপরাহ্ণকে। সোনালী রোদের মদ। সবুজ মাঠ। সুতপ্ত সুতৃপ্ত অবসর। আপনি সেই অবসরের অধীশ্বর। আপনার ইচ্ছার সম্মানে সাদা ফ্লানেলে ঢাকা ব্যাটবল হাতে কয়েকটি অভিনেতা। আপনি রাজা, সত্যই রাজা, রূপকথাগুলো এখনো বাজেয়াপ্ত হয়নি,—স্বপ্নে ও কামনায় একটি নিতান্ত রাজা।

রাজা হয়ে বসে আপনি খেলা দেখছেন—দেখছেন খেলার রাজাকে।

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই খেলার রাজত্বে।

অস্ট্রেলিয়ানিজম্

সবচেয়ে ভূগোল-ভাঙা খেলার নাম ক্রিকেট। যে-কোনো দেশের ক্রিকেটারকে ভালবাসতে পারে যে-কোনো দেশের ক্রীড়া-প্রেমিক। তাই বলে ভালবাসার সময়ে 'ভিতরে সবাই সমান রাঙা' বলে ছাল ছাড়িয়ে ভালবাসবে না। মানুষটা কালো হলে কালো রেখেই তাকে ভালবাসবে। যদি ঢ্যাঙা হয়, পা ছেঁটে ছোট করবে না, কিংবা বেঁটে হলে তাকে টেনে লম্বা ক'রে তবে গলা জড়াবে না। ভারতীয় ক্রিকেটারকে ইংরেজ গ্রহণ করবে তার ভারতীয়ত্বের সঙ্গে; অস্ট্রেলিয়ানকে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বরণ করবে তার মধ্যে অস্ট্রেলীয় প্রতিভার বিকাশ দেখেই। একটিমাত্র গোভার ট্রেনিং স্কুলে সারা পৃথিবীর খেলোয়াড়দের ঢুকিয়ে দিলে তারা বড়জোর ভালো গোভারিয়ান হবে, কিন্তু গ্রেট ক্রিকেটার হতে পারবে না।

তাই রসিকজনে ক্রিকেটে স্থানীয় রঙের পক্ষপাতী। সে রসবোধ

সকলের থাকা উচিত। শ্রেষ্ঠ শিল্প হল নাগরিক লোকশিল্প। ট্রেনিং স্কুল, কপি বুক থেকে আসে পাইকারী উৎপাদন, জিনিয়াস সম্ভব হয় নিয়মভাঙা নিয়মের নির্মাণসাধনায়।

আগেই বলেছি, ইংরেজদের স্বভাব যেখানে ক্রিকেটে ফুটেছে সেখানে বলা হয় টিপিক্যালি ইংলিশ। অস্ট্রেলিয়ানদের স্বভাব সম্বন্ধে একটা কথা চালু হয়েছে ইংরেজ সমালোচকমহলে—অস্ট্রেলিয়া-নিজম্। ঐ কথাটি আমি ১৯৫৯-৬০ সালে ভারত-সফররত অস্ট্রেলিয়ানদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম একটি রচনায়। স্মরণ করিয়ে দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। কানপুর টেস্টে অস্ট্রেলিয়ানরা নিদারুণ হেরেছিল, পরবর্তী বোম্বাই টেস্টে সহজেই ড্র করেছিল ভারত। আহত ব্যাঘ্র প্রবাদমত প্রতিশোধ নিতে পারেনি। এমনকি ছোকরা ভারতীয় ক্রিকেটাররা পর্যন্ত বোর্ড-সভাপতির একাদশের পক্ষে স্বচ্ছন্দে খেলে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ান অস্ত্রচালনার বিরুদ্ধে। আমি কিন্তু ভারতের সেই প্রতিঘাতের সাফল্যকে কিছুতে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারিনি। কেবলই মনে হচ্ছিল—অস্ট্রেলিয়ান সংকোচনের পিছনে একটা কিছু আছে, এমন কোনো দংশন, যার দাঁতের চেহারাটা আমরা যেন চেষ্টা করেও ধরতে পারছি না। আমার সেই বিচিত্র মানসিকতার মূলে ছিল দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব—স্বদেশীয় ক্রিকেট সম্বন্ধে পরাভূতের ধারণা। আমার সেই 'অস্ট্রেলিয়া-নিজম্' রচনাটির ভিতরকার উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রেলিয়াকে নয়, ভারতকে সতর্ক করা।

অস্ট্রেলিয়ানদের সম্বন্ধে এ ধারণা কি শুধু আমার ?

"যখন ইংলণ্ড সুনিশ্চিত জয়ের মুখে তখনো আমরা অস্ট্রেলিয়ার রুখে দাঁড়ানোর আশংকা করি—নিজ দলকে বাঁচানোর ক্ষমতা যে-কোনো অস্ট্রেলিয়ানের আছে। আর যখন অস্ট্রেলিয়ানেরা চড়ে আছে মাথায়, তখন আমরা মনে প্রাণে অনুভব করি—এখনো, এই অবস্থাতেও, এরা এক মুহূর্তের জন্যও রাশ আলগা করবে না।"

এরই নাম 'অস্ট্রেলীয়তা'—ক্রিকেটে। ক্রিকেটের ইতিহাসে

এটি অস্ট্রেলিয়ার বিশেষ দান। অস্ট্রেলিয়ান দল তার বোলারদের, ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত। তার নাম ক্যাঙারুর লেজের ঝাপট। তারা যে তাদের ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিংয়ের জন্য বিখ্যাত, তা না বললেও চলবে। সেটা হল অস্ট্রেলিয়ান সিংহের থাবা। আর তারা বিখ্যাত তাদের ফিল্ডিংএর জন্য। সব জড়িয়ে 'অস্ট্রেলীয়তার' জন্য।

অস্ট্রেলীয়তার লক্ষণ আবার জানানো যাক। ইংরেজরা সে বস্তুর স্বভাব নির্ধারণে অধিকারী, কারণ হাড়ে হাড়ে তাকে চিনেছে।—

"অস্ট্রেলিয়ানিজম্ মানে হল জয়লাভের জন্য কঠিন স্থির সংগ্রাম, আইনের মধ্যে থেকেই সে সংগ্রাম, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, আইনের সুযোগ নিয়ে সে সংগ্রাম। 'অসম্ভব' সেখানে মানুষের শারীরসামর্থ্যের মধ্যেই বাস করছে। এমন অস্ট্রেলিয়ান আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন, ঐ 'অসম্ভব' বস্তুটা তাঁরা ঘটাতে পারেন—এবং সত্যই এত বেশীবার তাঁরা সে জিনিস ঘটিয়েছেন যে, আমরা সবিস্ময়ে ভাবি, এদের কাছে সত্যই 'অসম্ভব' বলে কিছু আছে কি না। অস্ট্রেলিয়ানিজম্ কথার অর্থ—অস্ট্রেলিয়ানরা কখনো কোনো ম্যাচে হারেনি—বিশেষত টেস্টম্যাচ—যে-পর্যন্ত না তাদের শেষ রানটি খাতায় লেখা হয়েছে কিংবা তাদের শেষ উইকেটটি পড়েছে।"

জন আর্লটের ঐ কথাগুলো মিথ্যে নয়, তার প্রমাণ ১৯৫৮ সালে স্যার লিওনার্ড হাটনের লিখিত আর্তনাদ। লেন হাটন বিশ বছরের উপর যথার্থ গৌরবের সঙ্গে ব্যাট ধরে মাঠে কাটিয়েছেন। জীবনে বহু ভাল খেলা দেখেছেন,—আশ্চর্য ব্যাটিং-বোলিং-এর মতই দেখেছেন বহু অবিশ্বাস্য ফিল্ডিং। তবু ১৯৫৮-৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে অস্ট্রেলিয়ানদের কাণ্ড দেখে তাঁকে ভাল ক'রে চোখ রগড়ে নিতে হয়েছিল। তাঁর বিস্ময়ের আর্তনাদ আমার মনে পড়ছে।—'এরা কি অসম্ভব বলে পৃথিবীতে কিছু রাখবে না? নিখুঁত লেগ গ্লান্সকেও চান্সে পরিণত ক'রে সুযোগসন্ধানীর মত তাকে গ্রহণ করবে?' শ্রীযুক্ত হাটন ৵রণজিকে পর্যন্ত সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন—এই সব ছোকরা অস্ট্রেলিয়ানদের পাল্লায় পড়লে তোমাকে আর লেগ গ্লান্সের মহাশিল্পীর গৌরব যোগাড় করতে হত না।

ভারতের মাঠে ১৯৫৯-৬০ মরশুমে অস্ট্রেলিয়ানরা নিয়মিত ক্যাচ ফসকাচ্ছেন। বিশেষত হার্ভে।

অথচ দু'হাত যার সমানে চলে এমন মানুষের দৃষ্টান্ত এতদিন জানতাম প্রাচীন ভারতে সব্যসাচী অর্জুন, আধুনিক ভারতে লাইসেন্স-অফিসার এবং অস্ট্রেলিয়ায় শ্লিপ-ফিল্ডসম্যান। অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যেও সেরা একজন—নীল হার্ভে।

হার্ভে ক্যাচ ফসকেছেন এবং পঙ্কজ রায় বাউণ্ডারীর পর বাউণ্ডারী মেরেছেন অস্ট্রেলিয়ানদের মুখের সামনে ব্যাট চালিয়ে। কি বিচিত্র! ঐ মরশুমে দিল্লী টেস্টে ৯৯ রানের মাথায় পঙ্কজকে বেনোড আউট করেছিলেন টিপিক্যাল অস্ট্রেলিয়ান ভঙ্গিতে, নিরেনব্বুইয়ের অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ব্যাটের মুখে লোক দাঁড় করিয়ে। তারপর ১৯৬০ সালের ৫ই জানুয়ারী আসন্ন সন্ধ্যার আচ্ছন্ন আলোয় চশমাধারী পঙ্কজ রায় ৯৯ মিনিটে ৫৫ রান করলে বেনোড যখন পঙ্কজের সামনে লোক টেনে আনলেন দৌরাত্ম্যের সংস্কারবশে, তখন পঙ্কজ মেকিফের বলে জোরালো পুল করেছেন ফিল্ডসম্যানকে চমক দিয়ে।

অস্ট্রেলিয়ানরা কিন্তু এত সহজে চমকান না। সেই কথা বলতেই এই লেখা। সিড বার্নস বললেন,—স্মিথ, তোমাকে তো বলেছিলুম, আমাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

স্মিথ হতভম্ব, বলটা সিড বার্নসের হাতের মুঠোয়।

ঘটনাটা ঘটেছিল ১৯৪৮ সালের এক সোমবারে, ইংলণ্ডে, এসেক্সের বিরুদ্ধে ব্রাডম্যানের অস্ট্রেলিয়া একদিনে করল ৭২১ রান, পৃথিবীর রেকর্ড। পরে খেলতে নেমে মিলারের ভয়াবহ বোলিংয়ে এসেক্স খাবি খেতে শুরু করল অচিরে। রে স্মিথ ব্যাট করতে এলেন,—বোর্ডে পঞ্চাশ রানও ওঠেনি। সিলি সিড অনে সিড বার্নস থাবা মেলে দাঁড়িয়ে—এত কাছে যে, স্মিথ ব্যাট বাড়ালে ও বার্নস হাত বাড়ালে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যাবে। স্মিথ পরোয়া করার পাত্র নন। নেমেই বাউণ্ডারী—বার্নসের কানের পাশ দিয়ে বুলেট বেরিয়ে গেল। কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বার্নস বললেন—তুমি কিন্তু আমাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

গম্ভীর, আত্মস্থ, কড়াচোখ বার্নস দাঁড়িয়ে রইলেন পূর্ববৎ। টৌসাকের, বলে স্মিথ একটা হাফ ভলিকে আবার চালালেন বার্নসের পায়ের উপর—ধাক্কা খেয়ে বল চলে গেল বাউণ্ডারীতে। বার্নস কথাটি বললেন না। স্মিথ ২৫ রান করেছেন—আবার পেলেন টৌসাকের কাছ থেকে হাফ ভলি। এই সুযোগ—আত্মঘাতী ফিল্ডারটিকে ভাগাবার—অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর, আপত্তিকর লোকটা। স্মিথ ব্যাটের ডাণ্ডা ঘুরিয়ে সোজা বলটিকে চালিয়ে দিলেন বার্নসের উপর। বার্নস ছু'হাত দিয়ে বল আটকাতে গেলেন—হাতসুদ্ধ বল দুম্ ক'রে বুকে ধাক্কা দিল—বুকে ধাক্কা খেয়ে বল ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে—বার্নস ডান হাত বাড়িয়ে ছোঁ মেরে থামছে ধরলেন বলটিকে। রে স্মিথ—কট বার্নস—বোল্ড টৌসাক—২৫। স্মিথ শুধু চেয়ে রইলেন। বার্নস মধুর হেসে বললেন, বলেছিলুম তো তোমাকে—!

এর নাম অস্ট্রেলিয়ানিজম্!

১৯৪৮ সালে একদিন লণ্ডন শহরের ট্যাক্সিতে ছুই বিখ্যাত ব্যক্তির স্মরণীয় কথাবার্তা হয়েছিল।

ব্রাডম্যান। বুঝলে সিড, হাটন হল আমাদের পয়লা নম্বরের শত্রু। তাকে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দেওয়া যায় না, কি বল?

সিড বার্নস। না, তা তো নয়ই।

ব্রাডম্যান। মনে হয় খুব কাছে দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করলে তার মনোনিবেশ নষ্ট করা যায়। তুমি তা পারবে কি?

বার্নস। মনে হয় পারব।

ব্রাডম্যান। কত কাছে দাঁড়াতে হবে ভেবে দেখেছ কি?

বার্নস। হাটন আমাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

১৯৩৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ানিজম্‌কে ডন ব্রাডম্যানই পুষ্ট ও পরিবর্ধিত ক'রে গেছেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট বলতে ব্রাডম্যানের ক্রিকেট। বাকিরা এগারোর এক।

ডেনিস কম্পটনের সহযোগী বিল এডরিচ বললেন, আমি ডন ব্রাডম্যানের মত অধিনায়কের বিরুদ্ধে খেলতে পছন্দ করি না। আমি এমন একজনের বিরুদ্ধে খেলতে ভালবাসি যিনি খেলাকে খেলা মনে করেন। আমি ডনের প্রতি বিদ্বেষবশে একথা বলছি না। ডন আমার দেখা শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান, শ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন। তবু চাই না। এটা নিজস্ব রুচির ব্যাপার।

এডরিচ অবশ্য নিজ রুচির পক্ষে কারণ দেখিয়েছেন। বলেছেন—অস্ট্রেলিয়ানরা বাইরে যতই স্বচ্ছন্দ ভঙ্গি করুক, তারা ক্রিকেট খেলে না হালকা মনে। ক্রিকেটে 'কঠিন মন', 'ভয়াবহ প্রতিযোগিতা', এবং 'আপসহীন জিগীষা' তারা এনেছে। আর এই তিক্ততার মূলে আছে ডন ব্রাডম্যানের বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। এ রকম হতে বাধ্য। ডন ব্রাডম্যানের মত 'চূড়ান্তভাবে বিরাট ব্যাটম্যান, যিনি প্রতিভায় সমসাময়িকদের প্রভূত উর্ধ্বে, যিনি প্রত্যেক টেস্ট বোলারের লক্ষ্যস্থল, প্রত্যেক ফিল্ডারের বিবেচনার বস্তু, প্রত্যেক ক্যামেরার বিষয়দৃশ্য, প্রতি ক্রিকেট-সমালোচকের আকর্ষণকেন্দ্র, মাঠে বা মাঠের বাইরে যাঁর মুখনির্গত প্রতিটি শব্দ শোনা হবে, শোনানো হবে,—বাড়ানো, বাঁকানো, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে বানানো পর্যন্ত হবে,—তিনি যদি কিছু চতুর, আত্মসচেতন, স্পর্শচকিত হয়ে ওঠেন, তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকে না'। এ সকল কথাই উদারভাবে স্বীকার করেছেন বিল এডরিচ। তবু ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, যে-কোনো দেশের তুলনায় ১৯৪৫ সালের পরে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভের জন্য অনেক বেশী পরিমাণে নির্মমতা ও নিরাবেগ জয়লিপ্সা দেখিয়েছে—পারস্পরিক সুস্থ সুখী সম্পর্কের প্রতি তারা কোনোরূপ আগ্রহ দেখায়নি।

অস্ট্রেলিয়ানিজমের রূপ নির্ধারণ করতে ব্রাডম্যান প্রসঙ্গ এসে গিয়েছিল স্বতঃই, কারণ অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের শ্রেষ্ঠ পঁচিশ বছরের একছত্র অধিপতি ছিলেন এই ব্রাডম্যান। অস্ট্রেলিয়ান মনোভাবের গুণ-দোষের দায়িত্ব ব্রাডম্যানকে নিতেই হবে। টেস্টম্যাচ যে খেলার যুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাতে সন্দেহ কোথায়? আমরা চিন্তিত মনে চিন্তা

করছি কোনটা পরিমাণে বেশী—খেলাটা না যুদ্ধটা? ক্রিকেটের যথার্থ কুরুক্ষেত্র ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। দীর্ঘায়ত তার উদ্যোগ-পর্ব। অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলণ্ডে লোক যাচ্ছে এবং ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায়। ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী, ছাত্র, ভ্রমণকারী। সকলে এসে হেড কোয়ার্টারে সংবাদ দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ায় খবর পৌঁছল—অমুক কাউন্টির অমুক ছোকরা এখন উঠতি। ওধারে ইংলণ্ড কানখাড়া ক'রে শুনল—শেফিল্ড শীল্ডে যে খেলা খেলছে সেই ঢ্যাঙা ছেলেটি—! বসে গেল পাকা মাথারা গোল হয়ে গোলটেবিলের চারিধারে। সামনে ছড়ানো সংবাদের টুকরো, স্কোর বুকের পাতা। পরিকল্পনা রচিত হয়ে চলল, যার মূল কথা, অমুক ছোকরার ভ্রমরের প্রাণ অমুক দুর্বলতায়, সেখানে চাপ দাও, অমুক খোকার একিলিসের গোড়ালি অমুক লোভে, সেখানে খোঁচাও। এর নাম টেস্ট ক্রিকেট। এ ব্যাপারে ইংলণ্ড কিছু পেছিয়ে নেই অস্ট্রেলিয়ার থেকে। তবু যেহেতু ইংলণ্ড পেরে উঠছে না, তাই গাল দিয়ে বলছে, ও বস্তু অস্ট্রেলিয়ার সৃষ্টি—ঐ যার নাম অস্ট্রেলীয়তা।

ইংলণ্ডের অস্ট্রেলীয়তার দৃষ্টান্ত প্রচুর দেওয়া যায়। বিদগ্ধ পাঠকের নিশ্চয় মনে পড়বে ক্রিকেটের বিখ্যাততম চক্রান্তের কথা। আমি বডিলাইন-মতলবের কথাই বলছি। সেই চক্রব্যূহের নির্মাণ ও পরিণাম ক্রিকেটের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর অধ্যায়। সেসব কথা এখন বাদ থাকতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার প্রসঙ্গে নিবদ্ধ থাকাই ভাল। ঠিক বর্তমানে আমাদের মনে পড়ছে ব্রাডম্যানের দুটি ধমক, একটি কটাক্ষ এবং একটি চীৎকারের কথা।

ওল্ডফিল্ডকে ধমক দিলেন ব্রাডম্যান ১৯২৯ সালে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম উইকেটকীপার ওল্ডফিল্ড তখনি বিখ্যাত খেলোয়াড়। ব্রাডম্যান হলেন বাউলারের এক আনকোরা উনিশ বছরের ছোকরা। এডিলেডে চতুর্থ টেস্টের ঘটনা। তার আগে অস্ট্রেলিয়া পর পর তিনটি হেরেছে। প্রথম টেস্টের পর ব্রাডম্যান দল থেকে বাদ পড়ে আবার এই টেস্টে দলভুক্ত হয়েছেন। খেলার শেষের দিকে

. অবস্থা দাঁড়াল, যদি চতুর্থ ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া তিনশোর উপর রান করতে পারে, তাহলে জিতবে। জ্যাকসান, রাইডার, কিপ্যাক্স আউট। তরুণ ব্রাডম্যান অদ্ভুতভাবে নিজের দলকে টেনে তুলছেন ; ৫৮ রান করেছেন ; বোলিং সম্পূর্ণ আয়ত্তে। তাঁর সহযোগী অভিজ্ঞ ওল্ডফিল্ডও সুন্দর খেলছেন। এহেন সময়ে ওল্ডফিল্ড ওভারের শেষ বলে বেশী ব্যস্ত হয়ে রান নেবার জন্যে ডাক দিলেন। প্রাণপণে দৌড়েও ফুটখানেকের জন্যে ব্রাডম্যান রান আউট হয়ে গেলেন। পরের উইকেটগুলো পড়ে গেল অল্পে। ইংলণ্ড জিতল ১২ রানের ব্যবধানে। ওল্ডফিল্ড নট আউট ফিরলেন ড্রেসিংরুমে। সকলের কণ্ঠ থেকে মুক্ত অভিনন্দনের বর্ষণ হচ্ছে ওল্ডফিল্ডের উপর। এমন সময় একটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল,—'ও মারটায় কোনো রান ছিল না ; বিশেষত ওভারের শেষ বল ; আপনার উচিত ছিল আত্মরক্ষা করে আমাকে খেলতে দেওয়া।'

১৯৪৮ সালে লীডসের ড্রেসিংরুমে ব্রাডম্যানের ধমক খেল ১৮ বছরের বাচ্ছা ব্যাটসম্যান নীল হার্ভে। সেঞ্চুরী ক'রে হার্ভে ফিরছেন। অস্ট্রেলিয়াকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন হার্ভে। আনন্দে গর্বে গৌরবে টগবগ করছে ছেলেটি,—অধিনায়ক ব্রাডম্যান বললেন, —অমন বাজে মেরে তোমার আউট হওয়া উচিত হয়নি। আমাদের এখনও রানের দরকার।

এ বছরই লর্ডসে মিলারের দিকে একবার কড়া চোখে তাকালেন ব্রাডম্যান। তারপর বলটা তুলে দিলেন জনস্টনের হাতে। ব্রাডম্যান দেওয়া সত্ত্বেও মিলার বল প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

করবার কারণ ছিল। প্রথম টেস্টে লিণ্ডওয়াল আহত থাকায় ছ'ইনিংসে মোট ৬৩ ওভার বল করতে হয়েছিল মিলারকে, ফাস্ট বোলারের পক্ষে ভয়াবহ কাজ। ফলে ব্যাটিং-এ গোল্লা করলেন প্রথম ইনিংসে, যা সবচেয়ে অপছন্দ করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট

করার প্রয়োজন হয়নি। পরের টেস্টে আবার নাগাড় বোলিং। ক্লান্ত বিরক্ত মিলার বিদ্রোহ ক'রে বল ফিরিয়ে দিলেন স্কিপারের হাতে। ব্রাডম্যান শুধু স্থিরভাবে চেয়েছিলেন।

ফিরিয়ে দেওয়া বল মিলারকে নিজে চেয়ে নিতে হয়েছিল।

স্কিপার ব্রাডম্যান 'গালি' থেকে দু'হাত তুলে বিকট হাঁক পাড়লেন—হাউজ্ দ্যাট? এল বি আবেদন। ১৯৪৬-৪৭ সালের টেস্ট মরশুম। কম্পটন ব্যাট করেছিলেন। লেগ স্টাম্পের অন্তত: ৬ ইঞ্চি বাইরে পিচ খেয়েছে যে-বল, তাতে এল বি'র আবেদন করল সারা মাঠ,—গালিতে দাঁড়িয়ে থাকা অধিনায়ক ব্রাডম্যানও বাদ গেলেন না।

এডরিচ ছিলেন অপরপ্রান্তে। ওভারের শেষে ব্রাডম্যানের কাছে গিয়ে বললেন,—'আবেদন জানাবার উপযুক্ত জায়গায় তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে বটে।'

ব্রাডম্যান একগাল হেসে বললেন,—'বিল, আমি কিন্তু ভেবেছিলাম নির্ঘাত আউট'।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকে দু'হাতে মানুষ করেছেন এই ব্রাডম্যান। অস্ট্রেলিয়ানরা লড়তে ভালবাসে, জিততে ভালবাসে, হারতে ঘৃণা করে। আইনের সব সুয়োগ এরা নেয়। মাঠের এগারো জন খেলোয়াড়ের দ্বারা এল-বি আবেদন জানানো নিষিদ্ধ নয়, সুতরাং একসঙ্গে তারা পিলে-চমকানো বিচারের আর্জি জানায়। বলাবাহুল্য এইভাবে তা করার উদ্দেশ্য আম্পায়ারকে প্রভাবিত করা।

কিন্তু কাদা থেকে কামান তৈরী হয় না। যা ছিল না তাকে ব্রাড-ম্যানও তৈরী করতে পারেন না। অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের অনেক দিন ধরেই সুসংগঠিত সৈন্যদলরূপে তৈরী করার চেষ্টা করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ানরা যখন বিদেশে যান তখন তাঁরা রাষ্ট্র-প্রতিনিধি নিশ্চয়ই, কিন্তু কেবল পান-ভোজন-করমর্দনের রাষ্ট্রদূত নন। ১৯৩৪ সালে

স্কুল মাষ্টার উডফুল ছিলেন ইংলণ্ডে সফরকারী অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক। কদর্য বডিলাইন সিরিজের পরের সিরিজ সেটি। সামাজিকতার ব্যাপারে উডফুলকে সাবধান হতে হয়েছিল। এমন সাবধান হয়েছিলেন যে, তাঁর 'সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ', এবং 'প্রকাশের জন্য নয়' নীতি বিখ্যাত হয়ে আছে। স্কুল মাষ্টারের নিশ্ছিদ্র কঠোরতা নিয়ে উডফুল দলের সদস্যদের পাহারা দিতেন, এবং কড়াভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন, বাইরের কারো কাছে মুখটি খুলবে না। একদা স্বয়ং মহামান্য পঞ্চম জর্জ করমর্দন করার পরে জনৈক ছোকরা অস্ট্রেলিয়ানকে কিছু প্রশ্ন করলেন। বিব্রত বালকটি আমতা-আমতা ক'রে বলল,—আজ্ঞে স্যার, যা বলছি তা কিন্তু প্রকাশের জন্য নয়।

রাজা জর্জ অট্টহাস্য ক'রে অবস্থা সামলেছিলেন।

অস্ট্রেলিয়ানিজমে কিন্তু ব্রাডম্যানের সময়েই ফাটল ধরেছিল। ১৯৩৮ সালে ওরিলি ব্যাটের ডগায় দাঁড়িয়ে ফিল্ডিং করতে চাননি ব্রাডম্যানের আদেশ সত্ত্বেও। ১৯৪৮ সালে মিলার ব্রাডম্যানকে বল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। মিলার বেপরোয়া বুনো ঘোড়া। মিলারকে বশে রাখতে ব্রাডম্যানকে পর্যন্ত বেগ পেতে হয়েছিল, এবং শেষ পর্যন্ত একমাত্র প্রখর বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভাযুক্ত ব্রাডম্যানই তা পেরেছিলেন,—যতটা পারা সম্ভব। মিলার ছিলেন ব্রাডম্যানের হাতের অস্ত্র। কিন্তু ঐ অস্ত্রের নিজস্ব একটি মন ছিল। মিলার আত্মনিবেদিত প্রতিভা নন। ১৯৪৮ সালে অধিনায়ক ব্রাডম্যান চেয়েছিলেন, অপরাজিত থাকব। কেবল অপরাজিত থাকার মধ্যে মিলার কোনো গৌরব খুঁজে পাননি। ব্রাডম্যান চেয়েছিলেন, যতগুলো খেলায় পারি জিতব। মিলারের কাছে জিতলে চমৎকার, হারলে —হারলেই বা, খেলাটাই মজা। মিলার চেয়েছিলেন ব্যাট করতে, ব্রাডম্যানের থেকেও ভালভাবে। ব্রাডম্যান চাইলেন মিলার বল ক'রে যাক। খেলার সময় প্রতিপক্ষ সম্বন্ধে ব্রাডম্যানের কোনো দয়াধর্ম ছিল না, ছোট বড় সকলকেই চূড়ান্তভাবে হারাতে হবে। মিলার ছিলেন শক্তের শত্রু এবং দুর্বলের প্রতি অনুকম্পাসম্পন্ন।

এসেক্সের সঙ্গে যে খেলাটির কথা আগে বলেছি, যাতে অস্ট্রেলিয়া, ৬ ঘণ্টায় ৭২১ রান করেছিল, গর্বের সঙ্গে সে খেলার বিবরণ দিতে গিয়ে ব্রাডম্যান ঈষৎ দুঃখ জানিয়েছেন,—হায়! তবু মিলার সে খেলায় কিছু করতে পারে নি, যে-মিলার রানের ঝড় তুলতে পারে।

ঘটনাটা হয়েছিল এইরকম। লাঞ্চের ঘণ্টাখানেক পরে অস্ট্রেলিয়ার হল ২ উইকেটে ৩৬৪। মিলারের ব্যাট করার ডাক এল। তিনি তখন 'ভাত ঘুমে' আছেন। বললেন, আমি এখন যাচ্ছি না, যথেষ্ট রান হয়েছে, অন্য লোক যাক।—কি, যেতে হবে? আচ্ছা চল যাচ্ছি। ব্যাট কাঁধে তুলে হেলতে দুলতে মিলার চললেন; হেলাভরে উইকেটে সামনে দাঁড়ালেন; গার্ড পর্যন্ত নিলেন না। বেইলীর প্রথম বল—বোল্ড। ফিরে গেলেন ব্যাট কাঁধে ক'রে প্যাভিলিয়নে, বোধ হয় ঘুমের আমেজ ফিরিয়ে আনতে।

চুলের কেশর ফুলিয়ে, কাঁধে ঝাঁকি দিয়ে যে-মিলার প্রতি বলের সঙ্গে 'সাবধান' শব্দটি ছুঁড়ে দিতেন ব্যাটসম্যানদের দিকে, যে-মিলার ছিলেন ব্রাডম্যানের অস্ত্রশালার মহাভল্ল, সে মিলার অস্ট্রেলিয়ানিজমকে মানতে পারেননি মনের সঙ্গে। আর পারেননি ব্রাডম্যানের অনুগত সেবক, নম্রস্বভাব, পরবর্তী অধিনায়ক লিণ্ডসে হ্যাসেট। ১৯৩২ সালের দেহভেদী লারউডকে ব্রাডম্যান জাগিয়েছিলেন ১৯৪৮ সালে মিলার-লিণ্ডওয়ালের মধ্যে। ঐ বছর ওভালে শেষ টেস্ট। হাটন-কম্পটন পার্টনারশিপ চলছে। লিণ্ডওয়ালের বাম্পার কম্পটনের মাথা ফাটাতে লাফিয়ে উঠল। প্রাণ বাঁচাতে কম্পটন হাত উঁচু করলেন। হাতের ব্যাট ছিটকে বেরিয়ে গেল, বল গড়িয়ে গেল স্লিপের পাশ দিয়ে। হাটন অপরপ্রান্ত থেকে রানের ডাক দিয়ে কম্পটনের প্রান্তে এসে উপস্থিত। বিভ্রান্ত কম্পটন বুঝতে পারেননি ঠিক কি ঘটেছে। যখন বুঝে ব্যাট কুড়িয়ে নিলেন তখন হাটন ও কম্পটন একদিকে দাঁড়িয়ে, অপর প্রান্ত শূন্য, এবং থার্ডম্যান হ্যাসেটের হাতে বল। হ্যাসেট বল ছুঁড়লেন না। কম্পটন অপরদিকে দৌড়ে চলে গেলেন।

অযথা বাউন্সারের বিরুদ্ধে হ্যাসেটের নীরব প্রতিবাদ।

এহেন হ্যাসেট এবং মিলার ব্রাডম্যান-উত্তর যুগে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের দায়িত্ব নিলেন। গড়ে-ওঠা জিনিস ধ্বংস হতে যতটুকু সময় লাগে, অস্ট্রেলিয়ান অধঃপতনের জন্য ঠিক ততটুকু সময় লেগেছিল। অস্ট্রেলিয়ানিজমের বিলাপসঙ্গীত গেয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন টেস্ট-ক্রিকেটার সিড বার্নস।—

১৯৫৩ সালে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার শেষ টেস্ট ম্যাচ। আগের চারটে টেস্ট ফলহীন গেছে। পঞ্চম টেস্টের উপর সব-কিছু নির্ভর। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যার কাছে পৌঁছে গেছে ইংলণ্ড। মস্ত একটা মনস্তাত্ত্বিক সংঘাতের ক্ষণ। সমান হতে মাত্র তিন রান বাকি। এই সময় বেডসার জনস্টনের বল জোরে পেটালেন। মিলার ঠিকমত বলটা ধরতে পারলেন না। বলের গতি কিন্তু কমে গেল এবং গড়িয়ে যেতে লাগলো বাউণ্ডারীর দিকে। সে বলটা বাঁচানো যেত সহজে। মিলার সে চেষ্টা না ক'রে সেদিকে ফিরে কোমরে দু'হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ইতিমধ্যে মাঠ ফেটে পড়লো দর্শকদের চীৎকারে। বেডসার দৌড়ে ৪ রান নিলেন। ইংলণ্ড পেরিয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসের রানসংখ্যা।

দলের সংকটমুহূর্তেও মিলার ভঙ্গি ক'রে কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। গভীর বিরাগে সিড বার্নস বলেছেন,—ও জিনিস মিলারকে তো করতেই হবে, কারণ মিলারের নাম যে থোড়াই-কেয়ার-মিলার। মিলার তো মাঠে খেলেন না, খেলেন গ্যালারিতে।

পঞ্চম টেস্টের শেষ দিনে কম্পটনের পুশ্ করা একটা বল কুড়িয়ে নিয়ে ড্রপ কিক ক'রে মিলার পাঠিয়ে দিলেন অধিনায়ক হ্যাসেটের দিকে। বলের কি গতি হল ফিরেও তাকিয়ে দেখলেন না। অধিনায়ক হ্যাসেটকে কুড়িয়ে নিতে হল বলটি।

মিলার এবং হ্যাসেট —পৃথিবীর দুই শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়—অস্ট্রেলিয়া-নিজমের শেষ করলেন ইংলণ্ডের মাঠে। ইংলণ্ডের পেশাদার অধিনায়ক হাটন দু'হাত তুলে চেঁচালেন,—বিশ বছরের লজ্জার শেষ।

বিশ বছর পরে ইংলণ্ড এসেজ উদ্ধার করল।

অস্ট্রেলিয়া তলাতে তলাতে—একেবারে তলায়।

রিচি বেনোড আবার অস্ট্রেলিয়াকে টেনে তুলেছেন। প্রতিভার তরুণ ঝলক হার্ভে এখন পরিণত হয়েছেন। ডন ব্রাডম্যানের ছায়া দেখা যাচ্ছে নর্ম্যান ও'নীলের মধ্যে। অস্ট্রেলিয়ানিজম মাথা তুলছে। লেন হাটনের আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ছে সংবাদপত্রের পাতায়।

অস্ট্রেলিয়ার এই অস্ট্রেলীয়ত্বের মত ক্রিকেটে ভারতের নাকি ভারতীয়ত্ব বলে একটা জিনিস ছিল। যেমন ছিল হকিতে, যেমন ফুটবলে। ধ্যানচাঁদ ও সামাদের হাতের ও পায়ের লাঠি অচল হবার পরে ভারতের হকি ও ফুটবল তার প্রাচ্য রহস্যময়তা হারিয়ে ফেলেছে, যেমন রনজি-দলীপ-সি-কে-মুস্তাকের পরে ভারতীয় ক্রিকেট। রাজার দ্বারা পুষ্ট ভারতীয় ক্রিকেটে আগে ছিল রাজকীয় দানশীলতা, অনেক সময়ে আত্মঘাতীও বটে, আজ সেখানে কাজ-চালানো যোগ্যতার পায়ে প্রতিভা মাথা খুঁড়ছে।

ক্রিকেটের ইণ্ডিয়ানত্ব চলে গেছে, জেগে উঠেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানত্ব। সারা পৃথিবী স্বীকার করছে তার মহিমা। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা পেয়েছে 'ওয়েস্টের' সংগ্রামশীলতা এবং 'ইণ্ডিয়ার' নিগূঢ় শক্তি! বিচিত্র এই খেলোয়াড় দেশটি, সে যে কখন নীচে এবং কখন উপরে তা বিধাতাও বাজি রেখে বলতে পারবেন না। তারা এই মুহূর্তে হাসছে তো পর মুহূর্তে রাগছে। একই আবেগে তারা গাল দিতে ও গান গাইতে পারে।

আদিম জননী পৃথিবীর কয়েকটি আনন্দময় সন্তান ১৯৬০-৬১ সালে অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তরভরা হৃদয়কে লুঠ করে নিয়েছে। ক্রিকেট শুরু হবার বহু বছর পরে ১৯৬০ সালে ব্রিসবেন মাঠে 'গ্রেটেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ' খেলা হয়েছে।

পৃথিবীর ক্রিকেটের সেই শুক্লপক্ষের ইতিহাস এখন স্থগিত থাক। কৃষ্ণপক্ষের কথাই আলোচিত হোক! কতকগুলো কালো লোক তার

স্রষ্টা। অস্ট্রেলিয়া কালোর আলো দেখেছে। ইংলণ্ড দেখেছে কালোর কালো।

কেন এমন হয়? কেন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এক রকম এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে? অস্ট্রেলিয়া নিশ্চয় নিরীহ নয়। নিষ্ঠুর আঘাতে তার জুড়ি নেই। তবু, মনে হয়, অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় যে স্পোর্টস্ আছে তা থাকে না ইংলণ্ডের সঙ্গে খেলায়। দুই শক্তিশালী অমার্জিত প্রতিদ্বন্দ্বী ভয়াবহ লড়াইয়ের পরে হাতে হাত মেলাতে পারে, অপরকে জড়িয়ে ধরতে পারে বুকে,—সুসভ্যেরা সেক্ষেত্রে করমর্দন হয়ত করে কিন্তু দৃশ্য বা অদৃশ্য গ্লাভস্‌টা হাতে পরেই তা করে। 'এরই নাম ক্রিকেট' শব্দ ক'টি ইংলণ্ড ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে ব্যবধান উঁচু ক'রে রেখেছে। ব্যবধানের কারণ আরো কিছু। বহু ব্যাপারে দু'দেশের সম্পর্ক তিক্ত, সেটা ক্রমেই বেড়েছে। বাড়তে বাড়তে—

ক্রিকেটের কুরুক্ষেত্রে

বোমাটা শেষ পর্যন্ত ফাটল। আসুন, আমরা সকলে হিংসাত্মক কার্যের বিরুদ্ধে নিন্দা করি। ৩০শে জানুয়ারী, ১৯৬০ তারিখে পোর্ট অব স্পেনের ২৮ হাজার ক্রিকেট-দর্শকের আচরণকে আক্রমণ করবার মত জোরালো ভাষা আমার নেই। কিন্তু ক্রিকেটের মর্যাদাকে যাঁরা কমলালেবু, কাগজের বাক্স, টিনের টুকরো ও সোডার বোতলের দ্বারা আহত করেছেন, সবুজ মাঠে ও ফ্যাকাসে পিচের উপরে সে মর্যাদাকে যাঁরা দু'পায়ে মাড়িয়েছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো রাগই যথেষ্ট রাগ নয়। মর্যাদা যদি গেল ক্রিকেটের রইল কি? 'ক্রিকেট তো একটা খেলা নয়, সে হল একটা মর্যাদাপূর্ণ আচরণ।'

তবু বোমাটা সত্যই এভাবে ফাটল কেন, এতদিন ফাটেনি কেন, পূর্বে ফাটবার মত অবস্থায় কোনোদিন এসেছিল কিনা—এমন নানা প্রশ্ন মাথায় ভিড় ক'রে আসে, ভেসে আসে সামনে ইতিহাসের

কতকগুলো টুকরো ঘটনা। সবকিছুই ইতিহাসের অভিব্যক্তি, আমরা ইদানীং শিখেছি। আকস্মিক বলে পৃথিবীতে কোনো বস্তু নেই। বিনা মেঘে বজ্রপাত যখন বলি, তখন সেকথা বলি বিনা বুদ্ধিতে; নিশ্চয় গুপ্ত মেঘ ছিল, অথবা বজ্রপাতই হয়নি।

তাই মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচের সময়ে 'মাঠে জনতার প্রবেশ', বা 'দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল মাঠে রিভলবার-বর্ষণের' পরিবর্তে যখন ত্রিনিদাদে ক্রিকেট-টেস্ট ম্যাচের সময় মাঠে জনতার প্রবেশ' ঘটল, তখন রয়টার স্বাভাবিকভাবে আর্তনাদ করেছে—'ক্রিকেট ইতিহাসে অভূতপূর্ব'। কিন্তু আমরা জানি, কাক যখন তালটা ফেলে তখন কাক আপাত নিমিত্তমাত্র; খসে পড়া ছিল তালের নিয়তি, সে নিয়তি পূর্ব কর্মফলের সমষ্টি।

পোর্ট অব স্পেনে কি ঘটেছিল তা একটু বিস্তৃত ভাবে জানানো দরকার। রয়টারের বিবরণ:—

"পোর্ট অব স্পেন। ৩০শে জানুয়ারী। আজ ২৮ হাজার দর্শকের রেকর্ড সমাবেশ থেকে দাঙ্গা বেধে উঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ বিশৃঙ্খলার মধ্যে শেষ ক'রে দিয়েছে।

ক্রিকেটে অভূতপূর্ব এই দৃশ্যে দর্শকেরা বোতল এবং টিন ছুঁড়েছে, পিচের উপর ধাওয়া করেছে। আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তোষ থেকে এই বিক্ষোভের জন্ম, যা চরণ সিংকে শূন্য রানে রান-আউট দেওয়ায় চূড়ান্তে পৌঁছয়।

এটা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং-বিপর্যয়ের শেষ অবস্থায় ঘটে। চরণ সিং-এর বিদায়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অবস্থা—৯৮ রানে ৮ উইকেট। ট্রুম্যান ও স্ট্যাথামের আগ্নেয় বোলিংয়ের ধাকায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভেঙে পড়েছিল।

চা-বিরতির ১৭ মিনিট পরে বিক্ষোভটি ঘটে। গতদিনে ৩২৮ রান-সংগ্রহকারী ইংরেজ খেলোয়াড়দের আজ বোতল-বিছানো পিচ থেকে পাহারাধীনে বার ক'রে নিয়ে যেতে হয়। হাজার হাজার লোক মাঠে হৈ চৈ করে, এবং তৃতীয় দিনের খেলা নির্দিষ্ট সময়ের ৭৩ মিনিট আগে বন্ধ ক'রে দিতে হয়।"

আরো দু'টি সংবাদ। এই দিনে ইংলণ্ড বেশী বাম্পার দেয় নি।

এবং বোতল ছোঁড়া শুরু হলে বহুসম্মানিত লিয়ারী কনস্টানটাইন বিশেষ বীরত্বের সঙ্গে দর্শকদের শান্ত করার চেষ্টা করেন !

ঘটনাটি ঘটে যাবার পরে সারা পৃথিবী ছ্যা ছ্যা করল। লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে গেলেন ত্রিনিদাদের গভর্নর। বেতারভাষণে তিনি জানালেন—তোমাদের গভর্নর হয়ে আমি বড় গর্বে ছিলুম, কিন্তু তোমরা এ কী করলে! আমার যে মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না? এ জিনিস তোমাদেরই কীর্তি নিজের চোখে না দেখলে আমি তা কখনই বিশ্বাস করতুম না। গভর্নর আরো বললেন, আমি জানি দোষী অল্প, গুণীই বেশী; আমার বিশ্বাস, পৃথিবীতে ক্রিকেট উপভোগ করবার জায়গা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তুল্যি কোথাও নেই, তবু —গভর্নর মুহ্যমান কণ্ঠে জানান,—এ জিনিস পৃথিবীতে প্রথম।

সত্যই। এই সব মাননীয় ব্যক্তিদের ইতিহাসবোধে সন্দেহ করা যায় না। তথাপি ইতিহাসের দু'একটি পাতা উল্টে দেখা যায় কৌতূহলবশে।

ত্রিনিদাদের ক্রিকেট-মাঠে অমনটি ঘটল কেন তার প্রথম প্রত্যক্ষ উত্তর—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান স্বভাব। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা স্বভাবে উত্তপ্ত, অধীর, উন্মত্ত। দ্রব্যঘটিত উত্তাপও বহুলভাবে তার সঙ্গে যুক্ত হয়। ক্রিকেটের 'ঠোটে আঙুল' তাদের স্বভাবের চেঁচানিকে থামাতে পারেনি একেবারে। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল হারবে, এ জিনিস যেমন দল দু'টির সক্রিয় সদস্যদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হয় না, তেমনি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারবে, এ-জিনিস সহ্য করা সম্ভব ছিল না ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান সমর্থকদের পক্ষে।

৩০শে জানুয়ারী তারিখের গোলমালের এই হল অমার্জিত স্পষ্ট কারণ। বোধ হয় আরো কিছু কারণ আছে। আমার হাতে এই মুহূর্তে সব তথ্য নেই, কিছু কিছু ইঙ্গিত ও অনুমান করবার চেষ্টা করব মাত্র।

তার আগে ইতিহাস সন্ধান করলে পাঠকের হয়ত ভাল লাগবে। অমন অবস্থা কি পৃথিবীর আর কোথাও গড়ায়নি? ইতিহাস ইতিবাচক

তথ্যের সন্ধান দিলে আমরা খুশী হব, কারণ আমাদের সকলেরই ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের প্রতি কিছু বর্ণগত দুর্বলতা আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের রঙ কালো, আমার এবং আমার পাঠকের রঙও তাই। ব্রাউন হয়ে সায়েবদের কাছে আদর কুড়োতে গেলেও—আমরা কালোই। পৃথিবীর কালোরা এক হও। বিশ্ববিখ্যাত একজন কালো খেলোয়াড় দুঃখ ক'রে বলেছিলেন,—সায়েবরা জর্জ হেডলি সম্বন্ধে বলে, কালা ব্রাডম্যান,—ব্রাডম্যানকে সাদা হেডলি বললে কেমন শোনায় ?

অস্ট্রেলিয়ানিজমের আলোচনাকালে বডিলাইন প্রসঙ্গ স্থগিত রেখেছিলাম। তারই দু'একটি তথ্য মনে পড়ছে। ১৯৩২-৩৩ সালে লারউডের রক্তবাণ বুকে লেগে অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন উডফুল মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। তখন যে অস্ট্রেলিয়ান দর্শক মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েনি, তার একমাত্র কারণ ঝাঁপিয়ে পড়ার মত অবস্থা সম্পূর্ণ তৈরী হয়নি। কিন্তু আগুন জ্বলছিল গ্যালারিতে দর্শকের মনে। আহত উডফুলকে ড্রেসিংরুমে স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নার সহানুভূতি জানাতে এলেন। উডফুল বলেছিলেন—বিখ্যাত হয়ে আছে সেই ব্যঙ্গভাষণ—মাঠে দুটি দল খেলছে, কিন্তু 'ক্রিকেট' খেলছে এগারো জনের একটি দল।

উডফুল ভেবেছিলেন দল নিয়ে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন। অস্ট্রেলিয়ার দর্শক মাঠে নেমে পড়া ছাড়া আর সব কিছু করেছিল—লারউডের গায়ে থুতু দেওয়া পর্যন্ত। অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়ায় তীব্রোক্তিপূর্ণ তার চালাচালি হয়েছিল, এবং কি হয়নি ? যার সর্বোত্তম নাটকীয় বিদ্রূপ অতি ক্ষুদ্র একটি ঘটনায় পেয়েছি ; নাচের আসরে একটি ছোট মেয়ে লারউডের পরিচয় শুনে তার মাকে বলল—মাগো, একে তো খুনী বলে মনে হচ্ছে না ?

পাঠককে অনেকক্ষণ ঝুলিয়ে রেখেছি আধুনিক গল্প-লেখকের কাদায়। আসল ব্যাপারটা খুলেই বলি। ১৯৩২-৩৩ সালের বডিলাইন বোলিং ছিল ব্রাডম্যান এণ্ড কোম্পানীকে সাবাড় করবার ভীষণতম সঙ্কল্প। মানুষ খুন করা লারউড-জার্ডিনের মতলব না থাকতে

পারে, ছিল না বলে তাঁরা জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা সরল প্রাণে যে বস্তুর সৃষ্টি করেছিলেন, হ্যামণ্ড বললেন, তার দ্বারা কোনো মানুষ যে একেবারে অক্কা পায়নি সে নিছক বরাত জোরে। মজা এই, হ্যামণ্ড স্বয়ং সে বছর জার্ডিন-ক্যাবিনেটের সদস্য ছিলেন।

১৯৩০ সালে ডন ব্রাডম্যান নামক জনৈক অস্ট্রেলিয়ান ছোকরা ইংলণ্ডের ক্রিকেট-গর্ব ও বোলিং-দর্পকে ধুলো ক'রে দিয়েছিলেন ইংলণ্ডের মাঠে! এক টেস্ট সিরিজে ৯৭৪ রান ক'রে (যা এখনো বিশ্ব রেকর্ড) প্রমাণ করেছিলেন, যত দিন ব্রাডম্যানের হাতে ব্যাট আছে, তত দিন ইংলণ্ডকে মাঠে শুধু বল কুড়োতে হবে। ব্রাডম্যানের সঙ্গে ছিলেন অনুরূপ আর এক ব্যক্তি, পন্সফোর্ড। ব্রাডম্যান যদি অর্জুন হন, পন্সফোর্ড ভীমসেন।

সুতরাং পূর্বোক্ত পৌরাণিক তুলনা অনুযায়ী ভীমার্জুনের বিরুদ্ধে কৌরবপক্ষে সমবেত হয় কর্ণ-শকুনি-দুর্যোধন। ইংরেজ-প্রিয় পাঠক, আমার তুলনায় অনৌচিত্য ক্ষমা করবেন। কথায় কথায় ইংরেজপক্ষ কৌরবপক্ষ হয়ে গিয়েছে, নচেৎ ক্রিকেটে যুযুধান সকলেই সভ্য, স্বাধীন ও মহান।

গোপন পরামর্শের কথাটা তা' বলে মিথ্যে নয়। অস্ট্রেলিয়ায় আসার আগে জার্ডিন কয়েকবার গিয়েছিলেন ইংলণ্ডের বজ্রবোলার এফ আর ফস্টারের কাছে। ফস্টার ১৯০৩ সালে অস্ট্রেলিয়ায় লেগ-থিয়োরী চালিয়েছিলেন সাফল্যের সঙ্গে। জার্ডিনও সাফল্য চাইছেন। আর একদিন, লণ্ডনে এক হোটেলে সান্ধ্যভোজের সময় লারউড, ভোস, আর্থার কার এবং জার্ডিনের চার মাথা ঝুঁকে পড়েছিল টেবিলে। মতলব হল একান্তে, হিসেব হল নানা তথ্যের, ফার্গুসনের স্কোর বইখানা খুঁটিয়ে যাচাই করা হল নানাভাবে, পরিশেষে সিদ্ধান্ত হল—পন্সফোর্ড, উডফুল এবং ব্রাডম্যান কোম্পানীকে স্বাভাবিক সময়ের বহু পূর্বে ফেরত পাঠাতে হবে প্যাভিলিয়নে।

বডিলাইন বোলিং-এর সৃষ্টি হল। যার মূল কথা, লেগের দিকে ৬ থেকে ৮ জন লোক রেখে ব্যাটসম্যানের শরীর লক্ষ্য ক'রে ঠুকে

প্রচণ্ডতম সর্টপিচ বল পাঠানো হবে—যার বিরুদ্ধে যদি তুমি ব্যাট ধরে দাঁড়িয়ে থাক, মাথা বা বুক ফেটে মরবে, যদি গা বাঁচাতে ব্যাট তোলো তাহলে তোমার হাতের ব্যাট খসে যাবে কিংবা ক্যাচ উঠবে, আর যদি সরে যাও লেগের দিকে, সেক্ষেত্রে পরের বলটি এসে সোজা উইকেট উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। অর্থাৎ এগিয়ে বা পেছিয়ে যে-কোনো ক্ষেত্রেই তুমি নির্বংশের বংশধর।

উডফুল, ওল্ডফিল্ড চিট হলেন বলের ধাক্কায়, পন্সফোর্ড সরে পড়লেন প্রাণের দায়ে, অতিপ্রাকৃত ব্রাডম্যান নেমে এলেন প্রাকৃত পর্যায়ে। ব্রাডম্যানের অ্যাভারেজ নামল একশ থেকে পঞ্চাশে।

অস্ট্রেলিয়ানদের এতটা সয়নি। জার্ডিন দল নিয়ে আসছেন শোনা যেতে অস্ট্রেলিয়ানরা মুখে একটা 'ফুঃ' শব্দ ক'রে ঠোঁট উল্টে বলেছিল—'তুশ্চু'। তারপরে বলেছিল,—উড়িয়ে দেব। তারপর বলেছিল—আরো কত কথা। অস্ট্রেলিয়ার জয়কে অবশ্যম্ভাবী ধরে নিয়ে বিরাট বাজি ধরা হয়েছিল। সেই সম্ভাবনার এমন ডিগবাজি! বাজিতে হার তো আছেই, তার উপর অস্ট্রেলিয়ানদের শোচনীয়তম পরাজয়ের অপমান। বিশ্বধন্য ব্রাডম্যানের বিকট লাঞ্ছনা। ব্রাডম্যান ডবল তিনডবল সেঞ্চুরী করতে পারছেন না! কী ব্যাপার! অস্ট্রেলিয়ানরা এমন রেগে গিয়েছিলেন যে, অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট-বোর্ড এম সি সি-র কাছে প্রথম যে তার-পত্র পাঠিয়েছিলেন, (তৃতীয় টেস্টের পঞ্চম দিনে) তার মূল বয়ান ছিল,—হে মাতামহী, মামাদের আচরণে কুটুম্বিতার সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, মামাদের সামলাও; ব্যাপারটি বড় বেআইনী হচ্ছে, তোমার বোলাররা উইকেট ছেড়ে মানুষ-শিকারে ব্যস্ত হয়েছে।

এম সি সি উত্তর দিয়েছিলেন। সেই শীতল প্রতিবচনে অনেক কিছু ছিল। নিজ অধিনায়কের উপর অকুণ্ঠ আস্থা, দলের সদস্যদের খেলোয়াড়ী মনোভাব সম্বন্ধে পূর্ণ শ্রদ্ধা, আইনের পরিবর্তন যদি অস্ট্রেলিয়ার কাম্য হয় সে বিষয়ে সুলিখিত সাজেসন আহ্বান এবং অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষের অসুবিধা হলে নিজেদের দল ফিরিয়ে আনার

শান্ত প্রতিশ্রুতি, ইত্যাদি সুনির্বাচিত শব্দসমৃদ্ধ বৃটিশ আইনবোধ সেই প্রতি-তারবার্তার ছত্রে ছত্রে মুদ্রিত ছিল।

শেষ পর্যন্ত বডিলাইন নিষিদ্ধ হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ান সংবাদপত্র ও দর্শকের কোলাহলে নয়, অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট-বোর্ডের তার-স্বরে নয়, স্যার জ্যাক হবস বা জার্ডিনের দলের ম্যানেজার স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নারের পরবর্তী প্রতিবাদে পর্যন্ত নয়,— বস্তুটি নিষিদ্ধ হল যখন ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে ১৯৩৩ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান লিয়ারী কনস্টান-টাইনের বডিলাইন বল জার্ডিনের গালে হাওয়া লাগিয়ে চলে গেল এবং হ্যামণ্ডের চিবুক দিল দু'ফাঁক ক'রে। জার্ডিন যদিও ভয় পাননি, এম সি সি কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়েছিলেন। ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠের পিচ যথেষ্ট মন্থরগতি, তাতেই এই! ইংলণ্ডের কাউন্টি ম্যাচেও বডিলাইনের তোড়জোড় চলছে. সিডনির রাস্তায় অস্ট্রেলিয়ান ছোঁড়ারা বডিলাইন প্র্যাকটিশ করছে। গোটা আষ্টেক ক্রিকেট-টুপি একসঙ্গে মিলিয়ে শিরস্ত্রাণ ক'রে খেলতে নেমেছেন হেনড্রেন। হ্যামণ্ড বললেন, এরকম চললে,—ক্রিকেট! তোমারে করি নমস্কার।

অনেকগুলো বছর ছেড়ে দেওয়া যাক। ১৯৪৮ সাল। মিলারের সঙ্গে কথা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন হাটন। মিলার বললেন, লেন আমাকে অপছন্দ করে কেন, বুঝতে পারি না। ৮ বছর পরে ১৯৫৬ সালে লেন হাটন্ বললেন, কিথ! সেদিন তোমার সঙ্গে মৌখিক ভদ্রতা রাখা সম্ভব ছিল না। তোমাকে পছন্দ করার পক্ষে তুমি অনেক ভাল বোলার ছিলে। তুমি এবং লিণ্ডওয়াল আমার জীবন নরক ক'রে দিয়েছিলে।

যুদ্ধের সময় দুর্ঘটনার জন্য হাটনের বাঁ হাত ছোট হয়ে গিয়েছিল। সেই দুর্বল হাতের উপর মিলার লিণ্ডওয়াল বাম্পারের পর বাম্পার ছেড়েছেন। হাটন বেদনাস্নিগ্ধ কণ্ঠে বলেছেন, আমার ইচ্ছা করে শয়নঘরে তিনজনের ছবি টাঙিয়ে রাখি—মিলার, লিণ্ডওয়াল ও রামাধীনের—আমার বহু বিনিদ্র রজনীর স্মারকরূপে।

১৯৩২-৩৩ সালে বডিলাইনের প্রত্যুত্তর দেবার মত কোনো দ্রুত বোলার ছিল না অস্ট্রেলিয়ার। ইংলণ্ড এক তরফা পিটিয়ে এল

অস্ট্রেলিয়াকে। ১৯৪৮ সালের অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলারদের তুলনায় ইংলণ্ডের দ্রুত বোলাররা ছিল 'শান্তি ও সৌভ্রাত্রের অভ্রান্ত প্রতীক।' সুতরাং ইংলণ্ড বিচূর্ণ। ইংলণ্ডের লোক চেঁচাল—বডিলাইন! —বেশ জোরেই—ইংলণ্ডের সৌজন্যের পক্ষে। ব্রাডম্যান হাসলেন। না, আইন তিনি ভাঙেন নি। মিলার লিণ্ডওয়ালের বাম্পার সংখ্যায় যতই হোক, উইকেটের উপরে ছিল এবং লেগের দিকে লোক ছিল না বেশী। একবার বললেন, কি করব, ছেলেগুলোকে সামলাতে পারি না। কিন্তু মনে মনে তৃপ্ত হলেন। ১৬ বছর কেটে গেলেও ব্রাডম্যান বডিলাইনকে ভোলেন নি। ব্রাডম্যান কিছুই ভোলেন না।

মিলারের বিরুদ্ধে যখন লারউডের গাঁয়ের লোক চেঁচাল বিশ্রী-ভাবে, মিলার তখন হাত ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সর্টপিচ বাম্পার এইভাবে ঠেঙাতে হয়। পরে লিখে জানালেন সাংবাদিকরূপে—বাম্পার ফাস্ট বোলারের ন্যায্য অধিকার।

মিলার যখন কম্পটন-হাটনের বিরুদ্ধে বাউন্সার ছাড়ছিলেন এবং লারউডের দেশভাইরা ভয়ানকভাবে আপত্তি করছিল, তখন মাইকে বেজেছিল কর্তৃপক্ষের অনুরোধ ও সাবধানবাণী,—তোমরা কার বিরুদ্ধে চেঁচাচ্ছ,—অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে—যারা নাজী-নিধনে আমাদের সহযোগী? ছি!

ক্রিকেটে রাজনীতি। বডিলাইন সিরিজের সময়ও রাজনীতি এসেছিল। উপরমহলে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি কথা তার মধ্যে ছিল। আর রাজনীতি এসেছিল যখন ১৯৫৩-৫৪ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে লেন হাটন দল নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সদ্য ঘটনাকে সূত্র করেই বডিলাইন বাউন্সারের বিস্তৃততর কাহিনীতে প্রবেশ করেছিলুম। ক্রিকেট মাঠের কুরুক্ষেত্রই আমার উপজীব্য। আবার পুরাতন প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

২৯শে জানুয়ারী ১৯৬০ তারিখে সংবাদপত্রে সংবাদ বেরিয়েছে—আম্পায়ার লী, হল এবং ওয়াটসনকে অভিসন্ধিমূলক বোলিংএর জন্য সতর্ক করে দিয়েছেন।

ওয়েসলি হল যে, বোলিং-এর সময় নাতিভদ্র ও উদ্দামপ্রকৃতি, গত বছর ভারতবর্ষে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। 'বীমারের' মত বর্বর বল (জোরালো ফুলটস বল যা ব্যাটসম্যানকে লক্ষ্য ক'রে ছোঁড়া হয়) হল ছেড়েছিলেন ভারতের ইউনিভার্সিটি ছোকরাদের উপরও। টেস্ট ম্যাচে তো কথাই নেই। সেই হল, ইংলণ্ডের খেলোয়াড়দের আক্রমণ করবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু হল-ওয়াটসনের অসহিষ্ণুতার পিছনে বোধহয় আরো কিছু ইতিহাস আছে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অনেক দিন পরে তাদের ফাস্ট বোলারদের ফিরে পেয়েছে।

যুদ্ধের পরে ১৯৫০ সালে যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-ক্রিকেটে হঠাৎ আলোর ঝলকানি এল, তখন কিন্তু সেই সুবিখ্যাত দলে কোনো উচ্চ শ্রেণীর ফাস্ট বোলার ছিল না। যাদুকর রামাধীন এবং সহকারী ভ্যালেণ্টাইন ইংলণ্ডকে ইঁদুর খেলিয়েছিলেন,—সে কিন্তু স্পিন বলে। নেভিল কার্ডাস একবার অসতর্কভাবে বলেছিলেন—ধীর বোলার জন্মাতে হলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে কয়েক জন্ম ঘুরতে হবে। কনস্টান-টাইন, ফ্রান্সিস, গ্রিফিথ, মার্টিনডেল, ক্লার্ক, জর্জ জন, হাইনস্‌জন—ইত্যাদি ফাস্ট বোলারের দীর্ঘস্থায়ী ঐতিহ্য তাঁর মনে ছিল। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দ্রুত বোলার কনস্টানটাইন যদিও নিজের নাতিদ্রুত স্পিন বলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কার্ডাসের উক্তির প্রতিবাদ করতে চেয়েছেন, আসল প্রতিবাদ কিন্তু এসেছে পৃথিবীর দুই বিস্ময় বোলার, স্পিনার রামাধীন ও ভ্যালেণ্টাইনের কাছ থেকে।

১৯৫১-৫২ সালে অস্ট্রেলিয়া-ভ্রমণের সময় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দুর্বলতা প্রকট হয়ে পড়ল। দলে পরমাশ্চর্য ধীর বোলার আছে।, নেই উচ্চ শ্রেণীর কোনো ফাস্ট বোলার। আম্পায়ারের অনুমতি নিয়ে মাটিতে বল ঘষে বলের পালিশ উঠিয়ে অধিনায়ক গডার্ড রামাধীন-ভ্যালেণ্টাইনকে দিয়ে বল করিয়েছিলেন; কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলারেরা ভেঙে দিয়েছিল বাম্‌পারে ও ইয়র্কারে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাটসম্যানদের শরীর ও উইকেট।

১৯৫৩-৫৪ সালে ইংলণ্ড গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। তখনো ওয়েস্ট ইণ্ডিজে প্রথম শ্রেণীর ফাস্ট বোলার নেই। অথচ খুবই প্রয়োজন কারণ প্রতিশোধ চাই। ট্রুম্যান মার দিয়েছেন জর্জ হেডলিকে।

ইয়র্কশায়ারের এক চাষাড়ে ছেলের নাম ফ্রেডি ট্রুম্যান। যেমন চওড়া চেহারা, তেমনি মেজাজ। ট্রুম্যানকে পেয়ে হাটন আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন—এতদিনে পেয়েছি। অস্ট্রেলিয়ান ফাস্ট বোলারদের গোলা খেয়ে খেয়ে হাটনের মন বিষিয়ে ছিল, সত্যকার ফাস্ট বোলিং দিয়ে ইংলণ্ডের আক্রমণ শুরু করতে চাইছিলেন। খুসী হলেন ট্রুম্যান-স্ট্যাথামকে পেয়ে। বেডসার যত বড় বোলারই হোক, যথেষ্ট ফাস্ট নয়। বেডসার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ না যেতে হাটনের স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল। ট্রুম্যানের মধ্যে (হাটনের ভাষায়) 'যথার্থ ফাস্ট বোলারের গুণ আছে। সে প্রতিপক্ষ-ব্যাটসম্যানকে ব্যক্তিগত শত্রু মনে করে।'

১৯৫৩-৫৪ সালে হাটনের দলে একদিকে ছিল এই উদ্ধত উগ্র ট্রুম্যান, অন্যদিকে প্রতিপক্ষে ছিলেন জাতির গৌরব জনশ্রদ্ধেয় জর্জ হেডলি। হেডলিকে জামাইকার লোক এমন ভালবাসে যে, 'রাজা জর্জ' বলে ডাকে ; হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলে ইংলণ্ড থেকে আনিয়েছে এম সি সি-র বিপক্ষে খেলবার জন্য। নেট প্র্যাকটিসের সময় হেডলির জনপ্রিয়তার প্রমাণ পেলো ইংরেজরা। হাজার হাজার কালা আদমী বিদেশীদের খেলা দেখছিল নেটে,—হঠাৎ সব শূন্য, সকলে উধাও,—দেখা গেল ব্যাট ঘোরাতে ঘোরাতে হেডলি নামছেন। সকলে ছুটেছে সেদিকে।

সেই হেডলির গায়ে গিয়ে লাগল ট্রুম্যানের সর্ট-পিচ বল। মাঠের মধ্যে আহত হেডলির শুশ্রূষায় ডাক্তারেরা ছুটে এল। এই 'অভূতপূর্ব দৃশ্যে' ইংলণ্ডের অধিনায়ক নতুন কিছু দেখার সুখবোধ করলেন মাত্র কিন্তু ট্রুম্যানকে সমঝালেন না। মাঠের সবাই যখন হেডলির সাহায্যে ব্যস্ত, তখন ট্রুম্যান 'আমিও বা কম কি', ভঙ্গিতে উল্টোমুখে উপেক্ষা-ভরে দাঁড়িয়ে রইলেন। হাটন স্নেহভরে বলেছেন, তা বলে তোমরা

মনে কোরো না যে, ট্রুম্যানের মনে কম লেগেছিল। ও বাইরে নিজেকে প্রকাশ করে না।

ট্রুম্যানের বাম্পারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জমা হল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান দর্শকদের মনে। টনি লকের অঙ্গভঙ্গিকে ঘৃণা করল তারা। ইংরেজ অধিনায়ক লেন হাটনের নানা আচরণ সম্বন্ধে নানা কথা রটতে লাগল সর্বত্র। নিজেদের শ্বেতচর্ম-অধিনায়ক স্টলমায়ারের সম্বন্ধে বিষিয়ে রইল তাদের মন। এবং আম্পায়ারের নির্দেশ যখন প্রতিকূলে যেতে লাগল, ক্ষেপে গেল একেবারে।

১৯৫৩-৫৪ সালে টেস্টে জনতার উপদ্রব থেকে বাঁচবার জন্য স্টলমায়ার বাড়তি পুলিসের ব্যবস্থা করেছিলেন, এবং চতুর্থ টেস্টের সময় সামরিক বাহিনী তলব করার প্রয়োজন হয়েছিল। প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করেছিল ৪১৭। ইংলণ্ড মাত্র ১৭০। স্টলমায়ার ফলো-অন করাননি ইংলণ্ডকে। দর্শকরা সেটা পছন্দ করল না। আগে থেকেই তারা রেগে আছে। প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হোল্ট ৯৪ রানের মাথায় আম্পায়ার বার্কের সিদ্ধান্তে এল বি হয়ে যান। দর্শকরা চটে গিয়ে বলল, যখন সেঞ্চুরীর মাত্র ৬ রান বাকি তখন আউট দিয়ে দেওয়া? আম্পায়ার বার্কের স্ত্রী মাঠে ছিলেন পুত্র সহ। তাঁদের আদ্যশ্রাদ্ধ করল দর্শকেরা। বৃটিশ গিয়েনায় চতুর্থ টেস্টের সময় ব্যাপার চরমে পৌঁছল। হাটনের কথায় আম্পায়ার করা হয়েছিল গ্রাউণ্ডসম্যান মেঞ্জিসকে। তিন দিন বেশ কাটল, গোলমাল বাধল চতুর্থ দিনে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যাকওয়াট ৫৪ রান করে রান-আউট হলেন মেঞ্জিসের সিদ্ধান্তে। ম্যাকওয়াট-হোল্টের সহযোগিতায় হয়েছে ৯৯ রান, জুটি ১০০ রান করতে পারবে কিনা এই নিয়ে বাজি ধরা হয়েছে—এমন সময় ৯৯ রানের মাথায় ম্যাকওয়াটকে রান আউট দেওয়া!

পিটার মে বেড়ার ধার থেকে তৎপরতার সঙ্গে বল ছুঁড়েছিলেন বলে ম্যাকওয়াট রান আউট হয়েছিলেন; দর্শকেরা অধিকতর তৎপরতার সঙ্গে লেবু, বাক্স, কাঠের টুকরো, বোতল ছুঁড়ল· পিটার

মে-র মাথায়। মে যখন মাঠের মধ্যে দৌড়ে পালিয়ে এলেন তখন তাঁর মুখের অবস্থা—হাটন বলেছেন—জীবনে ভুলব না।

হঠাৎ দেখা গেল আম্পায়ার মেঞ্জিস প্যাভিলিয়ানের দিকে ধাবমান। হাটন চীৎকার ক'রে নিজের খেলোয়াড়দের বললেন, মেঞ্জিসকে থামাও! উইলি ওয়াটসন মেঞ্জিসকে পাকড়ে আনলেন মাঠের ভিতরে। ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা ভরসা দিল—আমাদের শরীরে যতক্ষণ রক্ত আছে—ইত্যাদি। ব্রিটিশ গিয়েনার গভর্নর এসে বললেন, অবস্থা আয়ত্তের অতীত, খেলা বন্ধ রাখ। ইংরেজরা গররাজি, খেলা তাদের অনুকুলে।

সেদিনের খেলা শেষে অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখা গেল—টেস্ট আম্পায়ার মেঞ্জিসের প্যাভিলিয়ন পানে দৌড়—'যে দৌড় ম্যাকওয়াটকে ধার দিলে সে রান আউট হত না, এবং গোলমালও বাধত না।'

১৯৫৩-৫৪ সালে ব্রিটিশ গিয়েনার গভর্নর বলেছিলেন, অবস্থা আয়ত্তের অতীত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছু ঘটেনি! সে জিনিস ঘটল ১৯৬০ সালে। অবস্থা সত্যই আয়ত্তের অতীত হয়ে খেলা বন্ধ হয়ে গেল সমাপ্তির ৭৩ মিনিট আগে। পূর্বে বহুবার অবস্থা বিস্ফোরণের কাছে গিয়েও সামলে গিয়েছে। যেমন বডিলাইন-সিরিজের সময় অস্ট্রেলিয়ায়, যখন উডফুল আহত হয়েছিলেন। তেমনিভাবে হেডলিও আঘাত পেয়েছিলেন ট্রুম্যানের বলে। ইংরেজ খেলোয়াড়ও আহত হয়েছে—তাদের কম্পটন, হাটন, এডরিচ, ওয়াসব্রুক—মিলার-লিণ্ডওয়ালের বলে। তবে ইংরেজ দর্শক চেঁচামেচির বেশী কিছু করেনি। অন্য দেশের দর্শক এতখানি সংযত নয়। তাই এবার যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ফাস্ট বোলারেরা ট্রুম্যানের বাম্পারের, বা ১৯৫৭ সালে ইংলণ্ডে তাদের পরাজয়ের শোধ তুলতে চাইল, অবস্থা তখনি ভিতরে ভিতরে অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। দু'পক্ষই বাম্পার ছড়াচ্ছে যৎপরোনাস্তি। সেবারকার ভয়ত্রস্ত পিটার মে এবারকার সাহসী অধিনায়ক। কিন্তু খেলায় যদি অবিরত বাম্পার-বৃষ্টি হয়,

তাহলে খেলোয়াড় ভদ্রভাবে খেলবে কি ক'রে? ট্রুম্যানের শিক্ষাদাতা আচার্য লিওনার্ড হাটনের স্বীকারোক্তিই ধরা যাক,—"কোনো মানুষের পক্ষে কিভাবে সুস্থ ও সুখী মনে টেস্ট বোলারের বলে খেলা সম্ভব হবে, যদি সে ভাবতে থাকে, ঐ বলটা আমাকে স্থানীয় হাসপাতালে এখনি পাঠাতে পারে, যেমন ঘটেছিল আমার ক্ষেত্রে ১৯৩৮ সালে সাউথ আফ্রিকায়?"

অথচ স্যার লিওনার্ডের চিরপোষিত আকাঙ্ক্ষা—যথার্থ ফাস্ট বোলার দিয়ে দলের আক্রমণ-সূচনা করতে হবে। যদি ফাস্ট বোলারদের প্রাধান্য দিতে হয় খেলায়, তাহলে তাদের মনোভাবকেও প্রশ্রয় দিতে হবে। ফাস্ট বোলারেরা বাম্পারকে নিজেদের রক্তশোষা পরিশ্রমের দ্বারা সৃষ্ট প্রয়োজনীয় দৈত্য মনে ক'রে থাকে।

বাম্পারের বিকারে বিষাক্ত হয়ে ওঠে দর্শকের মন। বিষাক্ত-মন দর্শক উত্তরোত্তর শিকার চায়! সেই ক্ষুধার মনোমত তৃপ্তি না হলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায় মাঠে। অধিকাংশ সময় ভদ্রতাবোধ তাকে বেঁধে রাখে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ভদ্রতার বাঁধন ছিঁড়ে গেছল সেদিন।

তাছাড়া বাজি ধরা তো আছেই। ক্রিকেট মাঠের কদর্য বস্তু ঐ জুয়া! ক্রিকেটের মহান অনিশ্চয়তার লোলুপ ব্যবহার। ১৯৩২-৩৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার দর্শকেরা 'দুর্বল' ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয়ের পক্ষে নিশ্চিন্ত চিত্তে বাজি ধরেছিল। লারউড-জার্ডিন মহা-বলে চাকা ঘুরিয়ে দিলেন সম্পূর্ণভাবে। অনুমান করতে পারছি, ১৯৬০ সালে অস্ট্রেলিয়া-বিধ্বস্ত ইংলণ্ডের পরাজয় ধ্রুব ধরে নিয়ে বড় বাজি ধরা হয়েছিল। বাজির হার বেড়েছে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ম্যারাথন ব্যাটিং দেখে। সেক্ষেত্রে একশ রানের মধ্যে যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং সেই সময়ে স্থানীয় তারকা চরণ সিংকে শূন্য রানে রান-আউট দিয়ে দেওয়া হয়!

আরো একটা কথা আছে, আপনারা জানেন তা, সেই বেদনার কথা সবশেষে নিবেদন করছি। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা ভুলতে পারেনি

ইংরেজের কাছে তাদের পরাধীনতা। শ্বেতাঙ্গদের প্রভুত্ব। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক ছিলেন আলেকজাণ্ডার, ওরেল নন। যে বর্ণ-বিদ্বেষ সাউথ আফ্রিকায় আছে নারকীয় রূপে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে তারই সংবৃত রূপ। ভাল খেললেও কালো ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানকে বহুসময় সাদা লোককে জায়গা ছেড়ে দিতে হয়; কালো লোকগুলো দরিদ্র, ভালো করে কথা বলতে জানে না, তাদের প্যাণ্ট যথেষ্ট সাদা নয়, খাওয়ার টেবিলে বিশ্রী ব্যবহার করে। এদের নিয়ে গিয়ে মহারাণীর সঙ্গে করমর্দন—আরে ছি! এইসব নিয়ে দুঃখ ক'রে গেছেন সুবিখ্যাত লিয়ারী কনস্টানটাইন। জীবনে গায়ের রঙের জন্য তাঁকে বহু-কিছু সহ্য করতে হয়েছে। এই সুমহান ক্রিকেটারের শেষ কামনা ছিল—তিনি মরবার আগে দেখে যাবেন একজন কালো লোক ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যাপ্টেন হয়েছে।

আর ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা বোধহয় ভুলতে পারেননি ইংলণ্ডের নাটিংহিলের পাষণ্ড ছোকরাগুলোর কথা। সেই সাদা-চামড়া ক্ষুদে শয়তানগুলো ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের ঘরে জানলা গলিয়ে বোমা ফেলেছে, বাড়ির মেয়েদের করেছে অপমান।

খেলা থেকে রাজনীতি দূরে যাক, দূরে যাক। তবু অপমানিতের জ্বালা যায় না। আমি এখনো যে-কোনো ক্ষেত্রে ইংলণ্ড হারলে খুসী হই কেন?

তাহলে জুয়া, বর্ণবিদ্বেষ ও বাম্পার—পোর্ট অব স্পেনের অবাঞ্ছিত ব্যাপারের মূলে। ক্রিকেটের ঐ তিন শত্রু। জুয়ার অভিশাপ থেকে ক্রিকেট (এবং সকল খেলাধূলা) কিভাবে মুক্তি পাবে জানি না, বিশেষত জুয়াই যখন ঘোড়দৌড়ের রূপে ইংলণ্ডের রাজকীয় খেলা, কিন্তু বর্ণবিদ্বেষ ও বাম্পার-বিভীষিকা থেকে মানুষের মুক্তির দু' একটি ঘটনার কথা আমার জানা আছে।

ভদ্রস্বভাব ইংরেজ টেস্ট-খেলোয়াড়টি মনে প্রাণে ঘৃণা করেছিলেন বর্ণসংকর ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়টিকে। মিশ্রবর্ণ ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানটির

ধারণা ছিল সে খাঁটি সায়েব। তাই তার নিজের দলের কোনো কোনো খেলোয়াড়ের সঙ্গে যখন কোনো কোনো ইংরেজ খেলোয়াড়ের কিছু কিছু খিটিমিটি হল মাঠে, তখন সে মরমে মরে গিয়ে জনৈক ইংরেজ খেলোয়াড়কে বলল,—'সত্যি আমি বড় দুঃখিত। এই নিগ্রোগুলো জঘন্য ব্যবহার করে। কিভাবে যে আপনাদের জানাব—আমরা, সাদা লোকেরা—ওদের কোনোদিন সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারলুম না!' মিশ্র ব্যক্তিটি এমন জোরে কথাগুলি বললেন যে, তাঁর সব কটি কথা অমিশ্র ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের এবং মাঠের অপর সকলের কানে গেল।—কী জঘন্য মর্বিডিটি! ইংরেজ খেলোয়াড় গভীর ঘৃণায় তিক্তভাবে বলেছেন!

এই মর্বিডিটি থেকে মুক্ত ছিলেন ইংরেজ খেলোয়াড়টি। এই মর্বিডিটি থেকে মুক্তির অন্য ক্ষেত্রও আছে। ১৯৪৫ সালে ইংলণ্ডে যখন কমনওয়েলথ একাদশ গঠিত হল, তখন কমনওয়েলথের সাদা-কালো সকলে মিলে ক্রিকেটের একটি গৌরবময় কৃষ্ণবর্ণকে নির্বাচন করেছিল অধিনায়করূপে—তাঁর নাম লিয়ারী কনস্টানটাইন।

আগুন যে আগুন নেভায় তেমনি একটি কাহিনী মনে পড়ছে বাম্পার প্রসঙ্গে। সেখানেও কনস্টানটাইন।

১৯২৮ সাল। কনস্টানটাইনের মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের দিন। যথেচ্ছ করছেন বলে ব্যাটে। বল দিয়ে ভেঙে দিচ্ছেন উইকেট প্যাঁকাটির মত, ব্যাট ধরে বল উড়িয়ে দিচ্ছেন গ্রাউণ্ডস্ট্যাণ্ডের ছাতের উপর দিয়ে। এই বছর ইংলণ্ড-ওয়েস্ট ইণ্ডিজে বড় মনকষাকষি। কনস্টানটাইনের প্রাণপ্রাচুর্য ফেটে পড়ছে লেগের দিকের বাম্পারে। হ্যামণ্ডের উপর কনস্টানটাইনের বিশেষ আক্রোশ। দুই দল খুবই উত্তপ্ত। এমন সময় এল ফোকস্টোন ফেস্টিভ্যাল ম্যাচ। সকলে ভাবল, বজ্রপাতসহ ঝড়বৃষ্টি অনিবার্য।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথমে ব্যাট করল, পরে ইংলণ্ড। দু'দলই দু'দলের খেলোয়াড়দের 'রক্তশূন্য' করতে সচেষ্ট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংরেজপক্ষ 'কৃষ্ণবজ্র' কনস্টানটাইনের কাছ

থেকে পলায়নে ব্যস্ত রইল। ওয়াট ও লী গেলেন, এলেন হ্যামণ্ড। আজ কিন্তু হ্যামণ্ডের নয়, কনস্টানটাইনের দিন। ইংলণ্ড-শ্রেষ্ঠ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-শ্রেষ্ঠের কাছে পরাভূত হয়ে ফিরে গেলেন।

এমন সময় দেখা গেল প্যাভিলিয়ন থেকে নির্গত ফ্রাঙ্ক উলীর সুদীর্ঘ সুচ্ছন্দ মূর্তি। মনোভাব ভয়াবহ রকম চড়ে আছে। বিশ্রী একটা কিছু ঘটতে পারে। বিশেষত উলী যখন ফাস্ট বোলিং-এর পরোয়া করেন না। মার খেলে কনস্টানটাইন হয়ত খেপে যাবেন। কর্তৃপক্ষ চিন্তিত।

উলী ঠিক তাই করলেন। আগুনের গোলার মত বলে তিনি ব্যাট লাগাতে লাগলেন অলস ভঙ্গিতে। বোলারের মাথার উপর দিয়ে বল উড়ে গেল, ছুটে গেল লেগের দিক দিয়ে, অফের দিকে পালিয়ে গেল প্রাণপণে। ব্যাটে বলে দাঙ্গা বেধে গেল যেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা ধরে গেল দর্শকের। মার খেলে বন্য হয়ে ওঠে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা। সকলে ভাবল কি না কি ঘটে। ঠিক এই সময়ে বেরিয়ে এল যথার্থ খেলোয়াড়ী খেলোয়াড়—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব রূপ। তারা উপভোগ করতে লাগল সাহসের সৌন্দর্য, মারের সুষমা। তাদের হাত থেকে জয় ফসকে যাচ্ছে, তবুও। তারা অদ্ভুত বল করল, চমকপ্রদ ফিল্ডিং করল, আর খেলা থেকে নিঃশেষে মুছে দিল মনোমালিন্যের শেষ চিহ্নটুকু। উলী তিন ঘণ্টায় ১৫০ রান করলেন, ইংলণ্ড জিতল চার উইকেটে। উলী মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা জয়ধ্বনি দিল সমস্বরে।

আরো একটি ছবি—পোর্ট অব স্পেনের মাঠের যে আটাশ হাজার দর্শক বোতল ছুঁড়েছে, বেড়া ভেঙে মাঠে ঢুকেছে, তারাই, যখন খেলার ষষ্ঠ দিনে ২৫৬ রানে জয়লাভ ক'রে ইংলণ্ড মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন—

"দেখা গেল দর্শকদের গ্যালারীতে রীতিমত নৃত্যোৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। এমন কি ইংলণ্ডের খেলোয়াড়গণ যতক্ষণ পর্যন্ত

প্যাভিলিয়নে না ফিরিয়া গিয়াছিলেন, ততক্ষণ দর্শকগণের করতালি ও আনন্দ-উল্লাসে আকাশ বাতাস মুখরিত হইতেছিল।"

শেষ কথা, মানুষের বিকার দিয়ে মানুষের বিচার যেন না হয় পৃথিবীতে।

রমণীয় ক্রিকেট

আমার বন্ধু শঙ্কর যখন বলেছিলেন, বাঙালী সাহিত্যিকদের কারা বাঁচিয়ে রাখে জানেন—বাঙালী মেয়েরা,—তখন সে কথাটায় আমি হেসেছিলুম। প্রথমে মুখ টিপে, পরে মুখ খুলে। আমার হাসিতে একটুও বিব্রত না হয়ে বন্ধুবর একতাড়া চিঠি এগিয়ে দিয়েছিলেন—সব কটি মেয়েদের লেখা। শঙ্কর বলেছিলেন,—লেখকরা লিখে টাকা পান ঠিক কথা, কিন্তু গল্প লেখার সময়ে তাঁরা ঠিক অফিসে খাতা লেখেন না। তাই তাঁরা টাকার নোটের মত আরো কিছু নোট চান যার তলায় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নরের সই না থাকলেও চলবে।

বন্ধুর মূল কথাটা হাসি-ঠাট্টার মধ্যেও বুঝতে পেরেছিলুম। মনের কথা যাঁরা লেখেন, লেখার পরে জীবন্ত কিছু মনের সঙ্গ তাঁরা চান। কিন্তু বাঙালী পুরুষ ভুলেও এক কলম লিখবে না লেখককে—এমন কি লিখে নিন্দে পর্যন্ত করবে না। লেখকের জীবনে উদাসীনতাই সবচেয়ে বড়ো অভিশাপ। এইখানে প্রাণের স্পর্শ নিয়ে এসেছেন বাঙালী মহিলারা। ভালো লাগলে তাঁরা ঢেবা ক'রে জানান, মন্দ লাগলেও বলে পাঠান ছোট্ট ক'রে।

শঙ্করের কথার সত্যতা স্বীকার করতে হয়েছে ক্রিকেটের লেখা শুরু করার পর থেকে। খেলানো ব্যাপারটা মেয়েদের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়লেও খেলাটা সাধারণভাবে পড়ে না, বিশেষত ক্রিকেটের মত টেকনিক্যাল খেলা। সেই ক্রিকেটের বিষয়ে লিখেও আমি যে সব চিঠি পেয়েছি তার অন্তত অর্ধেক মেয়েদের।

মূলত প্রশংসাই পাচ্ছিলুম তাঁদের। সেই সময়ে ভুল গিয়েছিলুম

যে, মেয়েরা ক্রিকেট বোঝে না। যে আমার প্রশংসাকারী সেই যে জগতের সর্বাপেক্ষা প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তা জগতের সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিই স্বীকার করেন। আমার নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ নেই। সবই সুন্দর চলছিল, এমন সময়ে একটা অবিবেচনার কাজ ক'রে ফেললুম। 'রমণীয় ক্রিকেট' নাম দিয়ে মেয়েদের ক্রিকেট নিয়ে একটা লেখা লিখলুম। বিশ্বাস করুন, রস-রচনা ছাড়া আমার অন্য কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

কী কুক্ষণেই সেটা লিখেছিলুম!

সে কথা পরে। আগে রচনাটি উপস্থিত করা যাক।—

দু'টি মেয়েতে কথা হচ্ছে গ্যালারিতে বসে। মেয়ে দু'টি সাজগোজ ক'রে এসেছে। তারা সাজতে জানে। তারা শুনেছে কলকাতায় ইদানীং ক্রিকেট নাগরিকতার একটা অঙ্গ। তাই বাধ্য হয়েছে ক্রিকেট-মাঠে আসতে। মেয়েদের নিজস্ব এক ধরনের বিস্ময় ও শিহরণ মেশানো 'ঈ' আর 'কি'র মাঝামাঝি তীক্ষ্ণ কাকলি আছে, বহুবার তার দ্বারা সচকিত সচঞ্চল করেছে আশপাশের ক্রিকেট-রসিকদের। যে বরাঙ্গ ডানলোপিলো ছাড়া আশ্রিত হয় না, তা পাঁচঘণ্টার উপর শক্ত কাঠের বেঞ্চকে সহ্য করেছে প্রসন্ন ভব্যতায়। এবার খেলা শেষ হচ্ছে, মাঠের উপর ছায়া নেমেছে, পাঁচদিনের টেস্ট খেলার প্রথম দিনের সমাপ্তি। আসন্ন অন্ধকারের ধূসর আলোতে মাথার দোলনে একটি মেয়ের কানের হীরে ঝলসে উঠল, একটি মধুর বিস্ময়ভরা প্রশ্ন শোনা গেল—আচ্ছা ভাই, কোন্ দল জিতল বল্ তো?

মেয়েদের ক্রিকেট-জ্ঞানের বহর নিয়ে এ ধরনের রসিকতা বাজারে যথেষ্ট চালু আছে। মেয়েরা নাকি গ্যালারির তলায় ঢুকে-যাওয়া বল খোঁজায় খেলার দেরি হলে ধিক্কার দিয়ে বলে, কী কৃপণ বাবা, নতুন একটা বল দিতে পারে না! আবার উল্টোদিকে, খেলোয়াড়েরা বল ঘষে ঘষে চকচকে প্যাণ্ট লাল ক'রে ফেললে তারা চটে যায় 'অসৈরণ' আচরণে। তারা খেলার মাঠে কালো প্যাণ্ট এবং আলখাল্লা

পরা পাদরী ছ'জনকে সহ্য করতে অনিচ্ছুক। প্রত্যেকটি বাম্প বল তাদের কাছে ক্যাচ এবং প্রত্যেকটি ক্যাচ ফসকালে তারা আনন্দিত। তাদের কাছে সব মিষ্টি, ফাস্ট বোলিং পর্যন্ত, এবং তারা কোনো একটি নিপুণ মারে যত উল্লসিত হয়, ঠিক সেই পরিমাণে বিমর্ষ হয়ে পড়ে সামনের বেঞ্চির অন্য একটি মেয়ে জৌলুষে যখন তাকে মেরে দেয়।

এই সমস্ত নারীপ্রগতি-বিরোধী কথাগুলো যে মধ্যযুগীয় এবং ইদানীং বেমানান, আমরা সকলে তা জানি। মেয়েরা শুধু ক্রিকেট দেখছে না, খেলছেও, এবং এমন খেলছে যে, কোনো কোনো কাউন্টি খেলোয়াড়কেও লজ্জা দিতে পারে। অন্তত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মেয়ে-ক্রিকেটার সম্বন্ধে লিয়ারী কনস্টানটাইনের দাবি তাই। ইংলণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে ইংলণ্ডে যাতায়াত শুরু হয়েছে মেয়ে ক্রিকেট দলের। দাবি উঠেছে, মেয়েদের জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সংস্থা স্থাপিত হোক ; বিভিন্ন দেশের মেয়ে-ক্রিকেট দলের মধ্যে নিয়মিত টেস্ট খেলার ব্যবস্থা করা হোক। অন্য দেশে সফরের অসুবিধা মূলতঃ আর্থিক। মেয়েরা যদি আরও একটু উৎসাহী হন এবিষয়ে, তাহলে তাঁদের স্বামীরা তাঁদের সপিং-এর মত ক্রিকেট-গোয়িংকেও সমান সভয় সম্ভ্রমের সঙ্গে নমস্কার করতে বাধ্য হবেন।

বোমা বন্দুক নিয়ে মেয়েরা যদি লড়াই করতে পারে, তাহলে খেলার লড়াই করতে পারবে না উপযুক্তভাবে, একি বিশ্বাসযোগ্য ? পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের কোনো নরশিকারী দলের সর্দারকে শুনেছি আমেরিকান সেনাধ্যক্ষ জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা একি সত্য যে, জাপানী মেয়েরা বিমান-যুদ্ধ করেছিল ?

'নিশ্চয় করেছিল, করেনি আবার! প্যারাসুট নিয়ে যখন আমাদের মধ্যে এসে পড়তো,—', জিভে ঝোল টেনে সর্দার চোখ বুজে বলেছিল,—'কি উপাদেয়!'

ক্রিকেট-সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণকে দর্শকরাও আনন্দের সঙ্গে বলবে, কি উপাদেয়! কিন্তু অমন হাঁড়ি-চড়ানো খিদেয় নয়, রমণীয়তার লীলাস্বাদনে।

মেয়েরা এদেশে না হলেও ভিন্ দেশে অনেক পূর্ব থেকেই মাঠে ভিড় জমাচ্ছে। যেমন ইংলণ্ডে। সামাজিক সম্মেলনে যেমন যায়, তেমনি সে দেশের লোকে ক্রিকেট-মাঠে জমায়েত হয়। শীত গিয়েছে, যে শীত ধোঁয়ায় কুয়াশায় শ্রীহীনতার চূড়ান্ত। বসন্ত এসেছে। সূর্য যে আকাশের দেবতা এবার তা বোঝা যাবে। মানুষ যে মাটির সন্তান, প্রমাণিত হবে তাও। যখন বরফ গলবে, ফুল ফুটবে, পাখি ডাকবে, ঝর্ণা গান গাইবে, তখন মাঠে নামবে শুভ্র চিকন ফ্লানেলের আবরণে মনোহর ক্রীড়ানটেরা। আর তখন মাঠে আসবে দলে দলে মেয়ে, গৃহস্থালির কাজ সেরে একটি আবেশতপ্ত মধ্যাহ্ন যাপনের জন্য। মাঠের চারিদিকে তারা ঘিরে বসবে, গল্পগুজবে মেতে উঠবে, খেলা দেখবে ততটুকু যতটুকু দর্শনীয়, বাকি সময়ে মন দেবে আরো পাঁচটা বিষয়ে। সন্ধ্যায় আবার উঠে চলে যাবে মাঠের মুক্তি ছেড়ে একটি যত্নে গড়া নীড়ের সুখসুপ্তিতে। জীবনের ছন্দে ক্রিকেটের বীণ সেখানে বাজছে।

ঠিক এই সময়ে ইংরেজ কবির কলমে রসসঞ্চার হয়; বাঙালী অকবির অক্ষম অনুবাদে যার রূপ অনেকটা এইরকম :—

পরিপূর্ণ শান্তি আর বিশ্রামের দিন,
দলে দলে আসে সবে আনন্দের লোভে,
সরু মোটা ফর্সা কালো প্রতিবেশীর মেলা,
গল্প ক'রে ভালবেসে যারা চলে যাবে।
ক্রিকেটের একটি কার্ড সকলেই কেনে,
বিবরণ থাকে লেখা নানা টুকিটাকি,
রাখা যাবে যত্ন ক'রে ভবিষ্যতের তরে
মধুদিনের রেখাভরা স্মৃতিচিহ্ন রূপে।

ইংলণ্ডের এই দৈনন্দিন 'বসন্ত সম্মেলনে' সব বয়েসের মেয়েরাই আসে, বর্তমানে বড় বেশী সংখ্যায়। এম সি সি কর্তৃপক্ষের কাছে এতসব তরুণী-ভামিনীর আগমন রীতিমত অস্বস্তিকর ও সমাধানহীন সমস্যায় পরিণত হয়েছে। স্ত্রী-বাহিনীকে জনৈক পর্যবেক্ষক তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন—

(ক) বৃদ্ধা এবং অনিশ্চিত বয়সের মহিলা, যাঁরা সবচেয়ে ভাল আসন

সংগ্রহে ব্যস্ত এবং সেই আসনে বসে গাল-গল্প ও অন্যান্য ছবিতে নিযুক্ত ;

(খ) অত্যন্ত অল্পসংখ্যক সত্যকার ক্রিকেটপ্রেমী মহিলা ;

(গ) সুবেশা সালঙ্কারা তরুণীবৃন্দ, যাদের অনুরাগ অপেশাদার তরুণ খেলোয়াড়কে ছাড়িয়ে খেলার জন্য অল্পই অবশিষ্ট থাকে।

এই শেষোক্ত শ্রেণীর যুবতিগণের জন্য ইংরেজ কবি ছন্দ-যোজনায় উৎসাহিত হয়েছেন এবং উৎসাহিত হয়েছেন বাঙালী অনুবাদক—

মেয়েরা যারা দেখতে আসে
কমই খেলা ভাল গো বাসে,
প্রেমিকেরি নাচন কোঁদন
না হয় যদি,—পশম বুনন,
মরি শুধুই পশম বুনন,
মরি মরি হায়রে !

মেয়েরা কিন্তু খেলার মাঠে শুধুই শোভা নয়, কিংবা নারীদ্বেষীর ব্যাখ্যানমত শুধু বোঝা। মেয়েদের উপস্থিতি যে মাঠের কত ওভার মারাত্মক বল এবং কয়টি মরিয়া ইনিংসের অপূর্ব উন্মাদনার জন্য দায়ী তার হিসেব কে করেছে। মেয়েদের উপস্থিতি নাকি পুরুষের অন্তরে এমন একটি অনির্বচনীয় পুলকসঞ্চার করে—যা অনির্বচনীয় বলেই বচনীয় নয়। তাছাড়া মাঠের আসলি পুরুষমানুষটিকে মেয়েরা ঠিকই চিনে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার মাঠের পুরুষোত্তম ছিলেন ব্রাডম্যান। তাঁর বিরুদ্ধে লারউড যখন অগ্নিবাণ ছুঁড়তে শুরু করলেন, তখন অস্ট্রেলিয়ান পৌরুষ যে ভাষায় আর্তনাদ করেছিল, তা কারো কারো মতে ভারতীয় ক্রন্দন-শিল্পের একচেটিয়া অধিকারে হস্তক্ষেপ। অস্ট্রেলিয়ার মেয়েরা সেদিন এগিয়ে এসে লারউডের পাশে দাঁড়িয়েছিল। তাদের আরক্ত অধরনিঃসৃত উৎসাহবাণী এবং কোমল করতলের বাদ্যধ্বনি ভগ্নহৃদয় লারউডের প্রাণে সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়েছিল। আমার জনৈক বন্ধু এই ঘটনার কথা শুনে নাক সিঁটকে বললেন, এ হল নৃশংসতার প্রতি মেয়েদের সংস্কারের টান ; স্পেনে ষাঁড়ের লড়াই দেখতে হাজার হাজার মেয়ের জমায়েত হওয়া কিংবা যেমন অজ্ঞান হওয়ার সুখ উপভোগ

করতে মেয়েদের বক্সিং দেখতে যাওয়া। 'নৃশংস' বন্ধুটির কথায়' আপনাদের কর্ণপাত করতে বলছি না, কারণ আমি বিশ্বাস করি, পুরুষের পৌরুষের আগুনকে মেয়েদের হাতের পাখা দাউ দাউ ক'রে জ্বালিয়ে তুলতে পারে, আবার প্রয়োজনমত নিভিয়েও দিতে পারে তাদের আঁচলের বায়ুনিরোধক আশ্রয়।

একটি ঘটনার কথা পড়েছি, নিবেদন করি।

ভারতের একটি প্রসিদ্ধ ক্রিকেট-মাঠের উদ্বোধন হবে। সেই উপলক্ষে আয়োজিত একটি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করছে ইংরেজ আর্মি-অফিসারদের নিয়ে তৈরী দু'টি দল। খেলাটি কিন্তু ক্রিকেটের সুন্দর ও সূক্ষ্ম কৌশল ব্যক্ত করার অনুষ্ঠানবিশেষ না হয়ে অফিসারদের যৌবনোচিত উৎসাহ ও শারীরিক কসরত দেখানোর রঙ্গভূমি হয়ে দাঁড়াল। মাঠে উপস্থিত এক বিশেষ রমণী সহাস্য অনুমোদনের প্রত্যাশায় অফিসারবৃন্দের ঐ অসামরিক উত্তেজনা। তেমন রূপবতী নাকি ভূভারতে বিরল, বিশেষত দুটি প্রদীপ্ত নয়নের তুল্য তারকাসঞ্চরণ ভারতের মাটিতে আর কখনো দেখা যায়নি। স্বভাবতঃই সম্মানীয় ও সাহসী ভদ্রমহোদয়গণ বিদ্যুৎ-আঁখির একটি কটাক্ষ কিংবা দন্তরুচিকৌমুদীর সামান্য বিকাশের জন্য 'করব কিংবা মরব' প্রতিজ্ঞায় অস্থির হয়ে উঠলেন। কিন্তু তাঁরা যেমন আবেশগ্রস্ত, সামরিক ব্যক্তি বলে তেমনি আদেশগ্রস্ত। ফলে খেলাটি অনেকটা হয়ে দাঁড়াল প্যারেড গ্রাউণ্ডের ড্রিলের মত,—ড্রিলের সময় যেমন হয়ে থাকে—জেনারেল কম্যাণ্ড দেন, অধীনস্থরা পালন করে কাঁটায় কাঁটায়। ঘনীভূত পরিস্থিতি। চরম ঘটল খেলার মাঝামাঝি সময়ে। একজন ভালো ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরীর মুখে পৌঁছে হঠাৎ (কি কারণে ঈশ্বর জানেন।) সোজা ক্যাচ তুলল আকাশ-উঁচু। তখনি উক্ত ক্যাচের নিকটস্থ জনৈক খেলোয়াড়কে উদ্দেশ ক'রে ফিল্ডিংপক্ষের ক্যাপ্টেনের বজ্রনির্ঘোষবৎ আদেশ ধ্বনিত হল—Your's Colonel! মাঠে ছিল সাতজন কর্নেল, বল উঠেছিল অনেকখানি উঁচুতে, আদেশ শোনামাত্র প্রাণপণ গতিতে মাঠের

নানা দিক থেকে তারা ছুটে এল এবং প্রচণ্ড সংঘর্ষে লুটিয়ে পড়ল একই জায়গায়, বলটি তাদের মাঝখানে খসে পড়ল টুক ক'রে।

গল্প আরো বলে, মহিলাটি তাঁর সাত জন অনুরাগীর 'অধঃপতন' দেখে নিজেও মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন স্ট্যাণ্ডে, অবশ্যই জনৈক পার্শ্বচরের বাহুতে ভর ক'রে।

মহিলাদের প্রভাব কি পরিমাণে ব্যাপক হতে পারে ক্রিকেটে আমরা বুঝতে পারছি। কম্পটন তো বিমুগ্ধ চিত্তে বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় শুধু মেয়ে মেয়ে আর মেয়ে, ক্রিকেট-পাগল ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে। তারা ছেঁকে ধরে, ঘিরে রাখে তাদের হীরোদের। কম্পটন সভয়ে নমস্কার ক'রে বলেছেন—রক্ষে কর, এই সব খবর বাড়িতে উড়ে গিয়েই তো যত অশান্তি ঘটায়।

অশান্তির শেষ নেই। যখন প্রেমিক প্রেমিকা কাছাকাছি তখনও। ক্রিকেট-কাব্য সবসময় প্রাণ-বিক্ষুব্ধ। ছোকরা ক্রিকেটার তার বাগ্‌দত্তাকে নিয়ে খেলার মাঠে গিয়েছে। প্রণয়িনীকে নিত্য জয় করবে নিত্য বীরত্ব-বিকাশে, এই তার একান্ত বাসনা। কিন্তু দেবতা অন্ধ। বলে ব্যাটে সংযোগ ছোকরার প্রায়ই হয় না। প্রতিবারেই নানা কৈফিয়তে আত্মসমর্থন করে। এবারও প্রথম বলে আউট হয়ে ফিরল। মাঠের ধারে বসেছিল প্রণয়িনী। সপ্রতিভভাবে তার গা ঘেঁষে বসতে যাবে, সে সরে গিয়ে স্থিরকণ্ঠে প্রশ্ন করল—

মাঠের আলো ঠিক ছিল?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

উইকেট কেমন, খুব খারাপ তো?

—একেবারে নয়, চমৎকার উইকেট।

বলটা নিশ্চয়ই মারাত্মক ধরনের?

—কে বলে, পেটাবার সুন্দর বল।

তাহলে আউট হবার কারণ কি?

—আঃ ডার্লিং, সেকথা বুঝলে না? তুমি একলা মাঠের ধারে বসে থাকবে আর আমি মাঠে মজা করবো সে কি সম্ভব?

এমনি রাগে-রসে রসে-রোমান্সে ভরা খেলা ক্রিকেট। বিলেতে কিউপিডের রণাঙ্গন আগে ছিল নাচের আসর, এখন তার সঙ্গে যোগ হয়েছে ক্রিকেট মাঠ। ভারতের ক্রিকেট মাঠেও ইদানীং ঘাসের মধ্যে কন্দর্পের শর উঁকি দিচ্ছে। ১৯৬০-৬১ সালে ভারত-পাকিস্তান টেস্ট ম্যাচের সময়ে বাস্তবিক সে জিনিসের কিছু নমুনা দেখা গিয়েছে।

মাদ্রাজ টেস্টের দ্বিতীয় দিন। কর্পোরেশন স্টেডিয়াম। ইমতিয়াজ আমেদ ও সঈদ আমেদ ব্যাট করছেন। শ্রীমান অমুক ও কুমারী অমুকা দর্শকরূপে মাঠে হাজির। দুজনেই ক্রিকেটে প্রবল উৎসাহী। তারা খেলাও বোঝে পুরোপুরি। ঘটনাচক্রে শ্রীমানের ও কুমারীর আসন পড়েছে পাশাপাশি। তারা বসেছে প্যাভিলিয়ান টেরেসের সবচেয়ে দামী দুই আসনে। আজকের দিনটি অর্থাৎ টেস্টের দ্বিতীয় দিনটি আকর্ষণীয়—ইমতিয়াজ ও সঈদ অদ্ভুত খেলছেন— দলের ভারী স্কোর গড়ে তুলছেন তাঁরা সুনশ্চিতভাবে,—একজন প্রথম দিনেই সেঞ্চুরী করেছেন—অপরজন সেঞ্চুরী করার মুখে; দ্বিতীয়জন সত্যই চমকপ্রদ, তাঁর মারের বাহার কেড়ে নিচ্ছে মন। তিনি এক আশ্চর্য ড্রাইভ করলেন এইমাত্র—বল ছুটে চলেছে তীব্রভাবে বাউণ্ডারীর দিকে—কুমারী অমুক দারুণ উত্তেজনায় তার পার্শ্ববর্তীর হাতের বায়নাকুলার প্রায় ছিনিয়ে নিল—লেন্সের ভিতর দিয়ে মাঠের নায়ক বড় হয়ে এগিয়ে এল সামনে—

প্রেমের জন্ম হল সেই মুহূর্তে।

শ্রীমান অমুক ও কুমারী অমুকা জড়িয়ে পড়ল সূক্ষ্ম অথচ সুনিশ্চিত এক বাঁধনে।

এটি এক সাময়িক পত্রের বিবরণী। পাঠক-পাঠিকাকে যদি বলি, এটি সিনেমার কাহিনী তাহলে তাঁরা কিছু হতাশা বোধ করতে পারেন কিন্তু তাঁদের আশ্বস্ত ক'রে বলি, জীবনের মনোহারী তথ্যটুকুই সিনেমার পর্দায় নেচে নেচে প্রাণ কাড়ে।

অন্ত বিষয়ে রক্ষণশীল হলেও ক্রিকেটে আমি নিতান্ত প্রগতিবাদী।

' খেলার জগতে, শিল্পের জগতে, আমি মুক্তির পক্ষপাতী। সৌন্দর্যের সন্ধান চিরদিনই দায়িত্বহীন। আমার কাছে খেলার জগতে ক্রিকেট হল সৌন্দর্যের প্রান্তর।

তাই আমার বিনীত ধারণায় ক্রিকেট সৌন্দর্যের খেলা হয়েও অসম্পুর্ণ, নারীপ্রকৃতিকে দূরে রেখেছে বলে। মেয়ারা নিজেরা খেলতে শুরু করেছে বটে, কিন্তু নারী-পুরুষের মিলিত ক্রিকেট-নৃত্য? মিশ্র ক্রীড়ার লাবণ্যে এ বিষয়ে টেনিস অগ্রসর। মিক্‌সড্ ক্রিকেট হয়ে আছে রসিকের দিবাস্বপ্ন।

যদি মিশ্র ক্রিকেট শুরু হয়, বর্তমানে ক্রিকেট যে ভয়াবহ সংঘাতের রূপ নিয়েছে তা মুছে যাবে অচিরে। ইংরেজ লেখক তাঁর নায়িকা সম্বন্ধে বলেছেন, তার স্পিন বল তার নীল নয়নের চেয়ে কম মারাত্মক নয়। সেই নারীর হাতের লাল বল আর চোখের নীল তারার ছোটাছুটি হবে তখন ভুবনের সবুজ অঙ্গনে। তখন 'ফাইন লেগে' বার বার ধৃত হবেন ব্যাটসম্যান এবং শ্লিপে শ্লিপড্ হবেন ব্যাটস-উওম্যান। তখন 'হুক' যাবে উঠে, থাকবে শুধু 'লেগ পুল'। বেড়ে যাবে পুরুষের 'ড্রাইভ' আর মেয়েদের 'কাট'। হয়ত শ্লিপাঙ্গনাদের চূর্ণ হাসিতে চকিত ব্যাটসম্যান 'লেট কাট' একটু বেশীই মারবেন কিংবা 'লেগ গ্লান্সে' উৎসাহ দেখিয়ে আম্পায়ারের ধমকানিতে ফিরে যাবেন প্যাভিলিয়নে। তখন স্পিননিপুণার করুণ মিনতির মত লাল টুকটুকে নিষিদ্ধ ফলটি ব্যাটসম্যানের পায়ের কাছে আছড়ে পড়বে, তারপর সকৌতুক বক্রতায় ফাঁকি দিয়ে উইকেট ছুঁয়ে চলে যাবে, কিংবা নিষ্ঠুর হাতের মার খেয়ে তা 'সিলি' দিয়ে ছুটবে,—একটি কোপ কণ্ঠ শুনবেন বর্বরটি—সিল্‌লি। তখন কর্তব্যপরাঙ্মুখ ক্রিকেটার নির্বাসিত হবেন 'লঙ ফিল্ডে', সেখানে হয়ত তাঁর কাছে দূতের মত পৌঁছবে একটি বার্তা-বল; তাকে আঁকড়াবার জন্য বিরহী খেলোয়াড়টির চলবে প্রাণান্ত ছোটাছুটি। তখন 'লেগ-বিফোর' হবেন মেয়েরা পুরুষেরা হবেন 'কট'। পাষণ্ডের জন্য থাকবে 'হিট উইকেট',—'স্টাম্পড' হবেন সাহসী। 'অবস্ট্রাকটেড দি ফিল্ড' যাবে

বেড়ে, আর বাড়বে 'রিটায়ার্ড হার্ট'। কত হতভাগ্য যে শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যাবে 'রান আউটে' তার ইয়ত্তা করা যাবে না। তখন খেলায় আসবে শিল্প, আসবে সুষমা। 'লেগ ট্র্যাপ' তখন করবেন শ্রীমতী লারউড, বাম্পার দেবেন কুমারী মিলার। পুরুষের পৌরুষ আর নারীর প্রশ্রয় ড্র বলে কোনো জিনিস রাখবে না,—হয় জিত নয় হার। খেলার নতুন সমাধানও বেরুতে পারে, হয়তো হল আপসে দু'পক্ষেরই জয়; কিংবা জয় পরাজয় উভয়ই অপরূপ হয়ে উঠল মধুরসে; জয়-'লাবণ্য' কাউকে ভালবাসল, কাউকে পরাল মালা শেষের ক্রিকেট-কবিতায়!

সে দিন কি এত দূরে? সে দিন পড়বে তো মোর পায়ের চিহ্ন সেই মাঠে?

নাতি রমণীয় ক্রিকেট

তরুণী মহিলাটি বেজায় চটে গেলেন আমার উপর। 'রমণীয় ক্রিকেট' রচনা-ছাপা পত্রিকাটি টেবিলের উপর পড়ে আছে। রেগে গিয়ে তিনি চায়ে দু'চামচ চিনি বেশী দিয়ে দিলেন। কাপটা ঠেলে দেবার সময় ছলাৎ ক'রে এক ঝলক চা ডিসে উছলে পড়ল। কড়া গলায় তিনি বললেন, আপনার লজ্জা হওয়া উচিত।

আমি ধীরে সুস্থে ডিসসুদ্ধ চায়ের কাপটা তুলে নিলুম। ডান হাতে কাপটি তুলে ধরে বাঁ হাতে সাবধানে ডিসের চা ঢেলে দিলুম অ্যাসট্রের গর্ভে। তারপর কাপে একটা চুমুক দিয়ে যাচ্ছেতাই মিষ্টি লাগলেও স্নিগ্ধভাবে বললুম, চমৎকার চা, বোধহয় চা-বাগান থেকে আপনার ম্যানেজার ভাই পাঠিয়েছেন—নয়? এবং দ্বিতীয় চুমুক দেবার পরে গা ঘুলিয়ে উঠতে বললুম, মিসেস সরখেল, আপনি কিন্তু আজ কাজু বাদাম দিতে ভুলে গেছেন। মিসেস সরখেল আমার দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে কাজু বাদাম আনতে উঠে গেলেন।

মিসেস সরখেল আমার বন্ধুপত্নী। অল্প কিছুদিন হল বিয়ে

হয়েছে। তিনি মেম ইস্কুল থেকে ইংরেজি, 'শেষের কবিতা' থেকে বাংলা শিখেছেন। ক্রিকেট শিখেছেন কালচার থেকে। তাঁর জন্য কালোবাজারে টিকেট কিনতে আমার বন্ধুটির অনেকগুলো টাকা গচ্চা গেছে। ভদ্রমহিলা আমার সঙ্গে ক্রিকেটের আলোচনা ক'রে আনন্দ পেতেন, আমি আনন্দ পেতাম তাঁর সুঠাম হাতের এক পেয়ালা চা এবং ডিসে ভরা বিলিতি আপ্যায়নে। বরাত মন্দ, আজ তিনি আমার উপর নিতান্ত বিরূপ। মেয়েদের খেলা দেখা নিয়ে আমি বিদ্রূপ করেছি কেন? যে-সব পুরুষ যায় তারা বুঝি সবাই খেলা বোঝে? খেলা বোঝে ঐ ভুঁড়ো ব্যবসায়ীটা? তাই না?

রাগে ভাষার প্রসাধন হারিয়ে ফেলেন তিনি। অবাঞ্ছিত আবেগে তাঁর নিজের প্রসাধন নাড়া খায়। আমাকে মিটিমিটি হাসতে দেখে নিজেকে সামলাতে পারেন না।—আর বলিহারি আপনাদের ঐ বস্তাপচা রসিকতাগুলো। মেয়েদের শাড়ী—ঠোঁটে রঙ—পশমবোনা। একই কথা বকে বকে আপনাদের মুখে ব্যথা হয় না। হবে কি ক'রে, মুখের চেহারা তো ওই! বলি, মেয়েদের দিকে হ্যাংলার মতন তাকিয়ে থাকেন কেন? আপনারা যে ঠ্যাঙ বাড়িয়ে নাচ দেখতে যান —নাচের কি বোঝেন শুনি? মেয়েদের অঙ্গ-ঢুলুনি দেখা ছাড়া দেখেনটা কি? রাত জেগে যে ওস্তাদী গান শোনেন,—ওস্তাদী মারবার জন্যই তো শুধু। নচেৎ গলা শুনলে তো বাড়িতে কাক-চিল বসতে পারে না। জঘন্য! নির্লজ্জ!

আমি সকৌতুকে চুপ করে আছি। মনে মনে ভাবছি, সত্যই তো মেয়েদের দিকে তাকাই কেন? কিন্তু না-তাকালে তাঁরা কি খুসী হবেন,—সেটাকে অমনোযোগের অভদ্রতা বলে বিলিতি মতে দোষারোপ করবেন না? পুরুষের চাহনিতে যদি 'অনীহা', তবে কেন তাঁদের 'মিছা-আবরণ' শাড়ী, 'আছে-আভাস' ব্লাউজ? তবে কেন তাঁরা বিনা বাতাসে বিস্রস্ত, বিনা প্রয়াসে চঞ্চল? এই সব অন্যায় চিন্তায় আমি নিমগ্ন আছি, আর সন্দেহ করছি, মিসেস সরখেলের কথাগুলো যেন কোথায় পড়েছি, যেন কোনো ছাপা রচনায়। সে

কথা জিজ্ঞাসা করতে অবশ্য সাহস হোলো না। মহিলারা মৌলিক নন বলে (রাগবেন না, সকলেই কুলীন!) একে অপবাদ আছে, তার উপর যদি এঁর গালাগালিরও অরিজিন্যালিটিতে সন্দেহ করি (যেখানে তাঁর কেবল অরিজিন্যাল নন, ক্রিয়েটিভও) তাহলে পরিস্থিতি ভয়াবহ। আমাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে তিনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

—কথা বলছেন না যে? আমার কথার বুঝি কোনো দাম নেই?

বন্ধুর দিকে একান্তে চোখ ঠেরে মহিলাকে বললুম সরল গলায়,

—আপনাকে দেখছি।

—কী-ই-ই?

—এ-ই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে।

—অসভ্যতা করবেন না বলছি।

—না না, মুখ ঘোরাবেন না, আপনার রাগের ভঙ্গিটি চমৎকার। কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম, মুখটি লাল, নাকটি কেমন ফুলো ফুলো, মাথায় ঝাঁকি দেবার সময় দুলে-ওঠা হীরের দুল—

বন্ধুর পিঠ চাপড়ে বললুম -লাকি ডগ্।

আর পারলেন না, মিসেস সরখেল শয়নমন্দিরে প্রস্থান করলেন। আমার বন্ধু শান্ত গলায় বললেন, খুব বাধালি যা হোক। রাত্তিরে আবার কোন্ গয়না চাইবে কে জানে।

মিসেস সরখেলকে নিয়ে না হয় কৌতুক করতে পারি, কিন্তু আমার সাহায্যকারিণীর আপত্তিকে সহজে উড়িয়ে দিতে পারি নি। ইনি আমার পাশের বেঞ্চে বসে খেলা দেখছিলেন। খেলার মাঠেই পরিচয়। মেয়েটি অবিবাহিত, সুতরাং রূপের বর্ণনা শোভন হবে না। তবে বলা চলে, তিনি কোনো সময়েই নিজেকে অযথা মেয়ে বলে জাহির করেন নি, পুরুষ হিসেবেও নয়,—যেমন অনেক রঙিন স্ল্যাংগো গেঞ্জি-পরিহিতা চিত্রিত মহিলা করছিলেন—তাঁদের উচ্চ কণ্ঠে, খ্যাল খ্যাল হাসিতে, উর্ধ্বাবাহু মুহুর্মুহু নাড়ানোয় এবং পায়ের উপর পা তুলে বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে উঁচু-হিল চটি নাচানোয়।

আমার পার্শ্ববর্তিনী খেলার মাঠে 'মানুষ' হিসাবেই বর্তমান ছিলেন। আর তাঁর ক্রিকেট-জ্ঞানের ব্যাপকতায় আমি বিস্মিত হচ্ছিলাম ক্ষণে ক্ষণে। তিনি কিছু জাহির করছিলেন না, কিন্তু প্রয়োজনে প্রয়োজনীয় কথাগুলো জানিয়ে দিচ্ছিলেন। তাঁর বিস্তৃত পড়াশুনা এবং প্রখর স্মৃতির বহু সাহায্য নিলুম আমি।

তিনিও আমাকে বললেন,—মেয়েদের খেলা দেখা নিয়ে অত ঠাট্টা করা কি আপনাদের উচিত?

আমিও পিঠেপিঠে তাঁর কণ্ঠ নকল ক'রে যোগ ক'রে দিলুম,—বিশেষত 'আ-মা-র' মত ক্রিকেট-বিশেষজ্ঞা যখন বর্তমান আছেন?

মেয়েটি লজ্জা পেলেন। বললেন, আমার কথা থাক, ছোট বয়েস থেকে ক্রিকেট আমার নেশা, বিশেষত তার সাহিত্য—কিন্তু তবু অল্পবিস্তর ক্রিকেট অনেক মেয়েই জানেন, উপভোগের পক্ষে সেইটেই যথেষ্ট নয় কি?

আমি কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইলুম। বললুম, আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন? খবরের কাগজের চিন্তাকুল সম্পাদকেরা পর্যন্ত কি লিখেছেন দেখেছেন? বলে, বিখ্যাত পত্রিকার সম্পাদকীয়ের অংশ উদ্ধৃত করলুম,—'অতএব খেলা চলুক, ট্রানজিস্টার রেডিওও চলুক, বোলারের হাতে ব্যাট নাই কেন এমন সরল জিজ্ঞাসাও কানের পাশে গুঞ্জিত হউক—'

মেয়েটি হেসে বললেন, দেখছি সবাই আমাদের শত্রু।

আমি বললুম, হ্যাঁ, 'আপনা মাংসে হরিণী বৈরী'।

সুর পালটে মেয়েটি বললেন, কিন্তু আমরা 'প্রোটেকশন' চাইছি—যেমন নতুন ইন্ডাস্ট্রি পেয়ে থাকে। ক্রিকেট খেলা দেখার ব্যাপারে আমরা পুরুষদের তুলনায় অনুন্নত। আমাদের 'কচি' কৌতূহলকে আপনারা প্রোটেকশনের বেড়া দিয়ে বাঁচাবেন না কেন?

আমি মুখ খুব করুণ ক'রে বললুম, কিন্তু আমাদের প্রোটেকশন?

আপনাদের আবার প্রোটেকশন কি?

আমি বললম—লেখকের প্রোটেকশন। আমি কাল থেকে

মেয়েরা সাহিত্যের সামগ্রী। আজকেও। নারীহীন মরুভূমিতে কোনো সাহিত্যই বাঁচবে না, ক্রিকেট-সাহিত্যও নয়।

মেয়েটি হেসে ফেললেন খোলা গলায়।

তাহলে নিজেদের স্বার্থে আপনারা মেয়েদের নিয়ে তামাশা করেন?

মানে—তাইতো—বটে—।

তবে যা ইচ্ছে হয় করুন।

লাঞ্চের শেষে 'যা ইচ্ছে হয় করুন'-এর স্থিতিবস্থা চুক্তি সম্পাদন ক'রে খেলা দেখায় দু'জনেই মন দিলুম।

হাতটা ঝাঁকিয়ে প্রায় ভেঙে দিল ক্রিকেটার-বন্ধু। আমার এই বন্ধু প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলে, সে ফাস্ট বোলার, তার দৈত্যের মত চেহারা, আনন্দিত হলে সে প্র-বল ভাবে আনন্দিত হয়, এবং সেই সময়ে তার করকম্পনে জীবাত্মা কেঁপে ওঠে।

হাত ছাড়িয়ে মুখ বিকৃত ক'রে নিজের কাঁধ নিজেই ডলছি—বন্ধু আবার সোল্লাসে পিঠ চাপড়ে বলল, তোফা লিখেছিস। এবারে কেঁদে ফেললুম। বুড়ো বয়সে বিনা দোষে চোখের জল ঝরল। অবস্থা দেখে সুহৃদ্বর সহানুভূতি জানালো—কি রে লেগেছে? তোদের আবার ননীর শরীর। আয়, মাসাজ ক'রে দিচ্ছি। মাসাজের ভয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে বলি, কি বলবার আছে বল্।

বন্ধু জানালো—তোর লেখার ঐ জায়গাটা ফাইন—যেখানে মেয়ে-পুরুষে ক্রিকেট খেলার কথা বলেছিস। ভালো 'সাজেসান্' দিয়েছিস। যদি মিকস্ড ক্রিকেট হয়—উঃ—উস্। বন্ধুর আনন্দ সরস জিভে খেলা করে।

আমি মহা বিরক্ত হয়ে বললুম, খুব হয়েছে। ঐ জায়গাটা কেটে দেব বই ছাপাবার সময়ে। মিকসড্ ক্রিকেটের কথা ভাববার সময়ে তোমার মত গুণ্ডার চেহারা আমার চোখের সামনে ছিল না।

এইবার সে একেবারে কাদা। —না ভাই, অমন করিসনি ভাই। আমার বড় ইচ্ছে, ঐ অংশটি ট্রানস্লেশন করিয়ে এম.সি.সি-তে পাঠিয়ে

দিই। কে জানে যদি সায়েবদের মনে ধরে যায়। সায়েবরা তো মেয়ে-পুরুষে ভেদ করে না। ওদের দেশে যদি একবার চালু হয়, আমাদের দেশেও হয়ে যাবে কি বলিস্,—বন্ধু স্বপ্নজগতে ভেসে গেল।

আমি তখনো কথা কইছি না। ফিরে বন্ধু শেষ চেষ্টা করল।—ভালো কথা, তোর লেখার প্রশংসা করলুম, তাতে তুইও রেগে গেলি, আজ সকালে বউও রেগে ফায়ার। শুনে কিছুটা উৎসুক হয়েছি,—বন্ধুর মুখে চতুর হাসি,—যেও আমাদের বাড়িতে, তোমার কি রকম খাতির হয় দেখবে।

এবার আমার কৌতূহলের পালা। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করি,—আমার লেখা নিয়ে বউয়ের সঙ্গে আবার হল কি তোর?

বন্ধু অতিশয় গম্ভীর।—কি হয়েছে, না হয়েছে আমার বাড়ী গিয়ে নিজেই জেনে এসো।

আমাকে অনেক নামতে হয়। বিনয়ে সন্তুষ্ট বন্ধু অবশেষে জানায়,—সকালে লেখাটি পড়ে সে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি গৃহিণীকে ডেকে নিজের আনন্দের অংশ দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। মিকস্‌ড ক্রিকেট অংশটা পড়ে শোনায় তাকে এবং দরাজ গলায় জানায়—হে ভর্গবান্, এ রকম জিনিস কবে আমাদের দেশে চালু হবে!

উৎসাহের মাথায় বন্ধুবর পত্নীর প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করবার অবসর পায়নি। অপর পক্ষ থেকে যথেষ্ট সমর্থন না পেয়ে মুখ তুলে দেখে—ভয়াবহ ব্যাপার! কঠিন স্থির চোখে বউ তার মুখের দিকে তাকিয়ে। প্রথম প্রশ্ন—কে লিখেছে? উত্তর শুনেই সেই নচ্ছার ঠাকুরপো এবং ততোধিক নচ্ছার নিজ সোয়ামীর চরিত্রের উপর মুহুর্মুহু বাক্যের সম্মার্জনী।—রস খুব! মেয়ে-পুরুষে এক সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে হবে? তা না হলে জমবে কেন? ঘরের বউয়ে আর মন ওঠে না। যত সব বদ সঙ্গ। যদি ঐ দগ্ধমুখ ঠাকুরপোর সঙ্গে আর মিশেছ—।

পরমানন্দে বন্ধু জানালো—তোর বৌদি তোকে নেমন্তন্ন করেছে। যাস্ সন্ধ্যের সময়।

আর যাস্। বাচ্চু বৌদিকে সামলাই কি ক'রে? তাঁর ওখানে প্রায় সন্ধ্যা আড্ডায় ও আহারে কাটে। তিনি যথেষ্ট সমাদর করেন। কেবল তাঁর মহাভয়—তাঁর সচ্চরিত্র স্বামীকে বদ মতলব দিয়ে আমরা খারাপ করবার চেষ্টায় আছি।

ক্রিকেট খেলোয়াড়ের বউদের নিয়ে একটা রচনা লিখে ফেলতে হবে। সেটা ছাপাবার আগে ওমুখো হচ্ছি না।

ক্রিকেটারের বউ

ক্রিকেট খেলোয়াড়ের বউদের কথা চিন্তা করতেই আমার মনে পড়ল কবিবর নবীন সেনের কথা। বড়ই প্রাণৈশ্বর্যে পূর্ণ ছিলেন এই কবি নবীন সেন। তিনি বাংলার বায়রন (দুর্মুখে বলে সোডা-বায়রন)। আমার মনে পড়ল উত্তরা-অভিমন্যুর বিদায়দৃশ্য। অভিমন্যুবধের পূর্বরাত্রে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত শিবিরকক্ষে বসে উত্তরা-অভিমন্যু গান গাইছে আর স্বপ্ন দেখছে। তারা এই ঘৃণ্য যুদ্ধ ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে দূর বনানীর শান্তিকুঞ্জে। চলে যেত এখনি, কেবল আগামীকাল অভিমন্যুকে যুদ্ধে যেতে হবে বলে যাওয়া হল না।

প্রভাতে অনির্দেশ্য আশঙ্কায় উত্তরার মনপ্রাণ পূর্ণ। 'বিরাট-তনয়া' ও 'অভিমন্যু-প্রিয়া' হওয়া সত্ত্বেও উত্তরা কাঁদো কাঁদো হয়ে ঠিক করল—'আজি কদাচিৎ যাইতে দিব না রণে'। এমন সময়ে দ্বারে সহসা অস্ত্রের ঝনৎকার।—

যুদ্ধবেশে—অভিমন্যু—মস্তকে উষ্ণীষ,
কক্ষে মণিময় অসি তীব্র আশীবিষ।
অঙ্গে বর্ম, পৃষ্ঠে চর্ম, তূণ, ধনুর্বাণ,
অঙ্গুলীতে অঙ্গুলীত্র, বক্ষে উরস্ত্রাণ।

সহসা পটভূমি পালটে গেল। মাথায় পট্টি-জড়িত আহত কম্পটন মিলারের বাম্পারের সম্মুখীন হবার জন্য মাঠে নামছেন—

টেস্টম্যাচে কম্পটন শিরসি ব্যাণ্ডেজ,
নিম্নোদরে গুপ্ত আছে লৌহময় ত্রাণ,

হস্তে ব্যাট, পায়ে প্যাড, স-কাঁটা পাদুকা,
অঙ্গুলীতে অঙ্গুলীত্র—মিলার সে কোথা ?

আমার খুব জানবার ইচ্ছা হয়, এই সময় কম্পটন-জায়া কি করছিলেন—তিনি কি ড্রেসিংরুমে ছুটে গিয়ে উত্তরার মত চীৎকার ক'রে বলেছিলেন—

না না নাথ, আজি রণে যাইতে কখন
দিবে না উত্তরা তার থাকিতে জীবন।

কিংবা তিনি অর্জুনজননী কুন্তীর মত কর্ণের প্রতি অপ্রকাশযোগ্য ভালবাসায় ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছিলেন ? কম্পটনের শুভাশুভ সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তার কারণ ছিল। সকলেই জানত বিপক্ষের অধিনায়ক ব্রাডম্যান সৈনাপত্যে আবেগশূন্য। কিংবা বিপক্ষের অন্যতম প্রধান সৈনিক মিলারের মনোভাব—যদি কম্পটন মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে খেলতে নেমে বাহবা কুড়োতে পারে, তাহলে বোলাররা কম্পটনের বীরত্বের পাওনাকে সস্তা হতে দেবে কেন ? দয়াবৃত্তি অনুশীলনের ক্ষেত্র নয় টেস্ট ক্রিকেট ; আইনমাফিক বাম্‌পার সহ্য ক'রে তবে কম্পটন বীরপুরুষ হোক।

তাই বলছি, এহেন সময়ে কম্পটনের স্ত্রীর মনের সংবাদ জানতে ইচ্ছা হওয়া খুব স্বাভাবিক, যেমন স্বাভাবিক বডিলাইনের সম্মুখীন ব্রাডম্যান বা বাউন্সারের লক্ষ্য হাটনের পত্নীর মনোভাব সম্বন্ধে কৌতূহল। ব্রাডম্যান-হাটন-কম্পটন যেভাবে তাঁদের পত্নীদের মুক্ত প্রশংসা করেছেন, তাতে ধরে নেওয়া যায়, তাঁরা খুবই সুখী দম্পতি,—সাংসারিক অশান্তিতে রেল-লাইনে মাথা দেওয়ার মত বাম্‌পারে মাথা পেতে দিতে তাঁরা যাননি মাঠে। অপরপক্ষে, সাহসের সঙ্গে যাঁরা বাম্‌পার খেলেছেন, তাঁদের কারো কারো অন্দরমহলে উঁকি দিলে হয়তো জানা যাবে, বাম্‌পারের সামনে আত্মদানের পরোক্ষ প্রেরণা তাঁরা পত্নীদের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। বিখ্যাত সিংহশিকারীর কথা মনে পড়ছে এই প্রসঙ্গে। রাত্রে ফিরতে সামান্য দেরী হওয়ার জন্য তিনি বাড়ি ঢুকতে সাহস করেন নি।

তিনি ফিরে গিয়েছিলেন সিংহেরই খাঁচায়। পরদিন সকালে স্বামীর সন্ধানে বেরিয়ে সেই বীরাঙ্গনা যখন দেখলেন,—তাঁর স্বামী এক সিংহীর পেটে মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন,—তখন ঘৃণায় নাক কুঁচকে থুতু ছিটিয়ে তিনি বলেছিলেন—ফুঃ—কাপুরুষ।

বেপরোয়া হয়ে বাম্‌পার খেলার সময়ে কোনো খেলোয়াড় হয়ত ও জিনিসটাকে সিংহীর গায়ে শুয়ে নিদ্রা দেওয়ার মতই সহজ মনে করেন।

এই অংশটা আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাপতে দেব না। বাচ্চু বৌদি এ জায়গাটা খুব পছন্দ করবেন না।

ক্রিকেটে বিপদ বলতে ঐ বডিলাইন, বাম্‌পার। ক্রিকেটারের মত তাঁর পত্নীরও স্নায়ুর পরীক্ষা এখানে। স্বামীর প্রতি বিপক্ষের অগ্নিময় ভালবাসা দেখে পত্নীরা আতঙ্কিত হতে বাধ্য।

ভারতীয় খেলোয়াড়-পরিবারেও একই অবস্থা ঘটেছে ইদানীং-কালে কত বার। ট্রুম্যান বা হলের বিপক্ষে যখন নরম-শরীর ছোকরারা দাঁড়িয়েছিল, বাড়ির লোকজন তখন নিশ্চয় সুখী ছিলেন না। থাকা সম্ভব নয়, যেখানে উডফুলের মত বিখ্যাত ক্রিকেটারের অমন মনোভাব। আগেই বলেছি সেকথা। লারউডের বলে আহত উডফুল স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নারকে বলেছিলেন, মাঠে খেলছে ২২ জনের দু'টি দল, কিন্তু 'ক্রিকেট' খেলছে ১১ জন। স্বয়ং স্যার পেলহ্যাম ওয়ার্নারও বলেছেন,—ওটা ভালো ক্রিকেট নয়, এমনকি কোনো ক্রিকেটও নয় বোধ হয়।

ক্রিকেটারের পত্নীদের জীবনের অন্য সমস্যাও আছে। বিশেষত তাঁরা যদি ইংলণ্ডের পেশাদার কাউন্টি-ক্রিকেটারের গৃহিণী হন। পেশাদারদের ক্রীড়াজীবনে বিয়ে না করাই উচিত। কিন্তু বিয়ের ফুল ফুটলে তেমন সুন্দর জিনিসটাকে অনেকেই প্রাণ-ধরে ছিঁড়তে পারে না। সমস্যার শুরু তার পর থেকে। ইংলণ্ডের পেশাদার ক্রিকেটারকে মরশুমে সপ্তাহে ছ'দিন ক্রিকেট খেলতে হয়,—অধিকাংশ সময় নিজের বাড়ি থেকে দূরে। সপ্তাহে মাত্র একটি

দিন বাকি থাকে পত্নীর রাগানুরাগ ও পুত্র-কন্যার আদর-আবদার উপভোগের জন্য। ঠিক সেই দিনটিতে পড়ল হয়ত কোনো এক ক্রিকেটারের সাহায্য-মধ্যাহ্ন অর্থাৎ বেনিফিট ম্যাচ। বেনিফিট ম্যাচ খেলতেই হয়। তার প্রথম কারণ ভদ্রতা,—ক্রিকেটারের ভদ্রতা বিখ্যাত। দ্বিতীয় কারণ ভালবাসা, ক্রিকেটারে ক্রিকেটারে ভালবাসা আরো বিখ্যাত। তৃতীয় কারণ ভবিষ্যৎ-চিন্তা,—ভবিষ্যতে নিজেরও বেনিফিট ম্যাচ হতে পারে। এমনি চলবে মাসের পর মাস ; প্রমোদের কারাগারে বন্দী থাকবে ক্রিকেটার। খেলায় পেশাদারীর সবচেয়ে বড় দুঃখ এইখানে, খেলার আনন্দ যায় মুছে, অথচ পেশাদারীতে প্রাপ্ত অর্থও মনে হয় না পর্যাপ্ত। এই ট্রাজেডী একজন সাহিত্যের শিক্ষকের জীবনেও ঘটে। নিজের প্রাণবর্ণে ঐশ্বর্যময় উপন্যাস থেকে তাঁকে খুঁজতে হয় চরিত্রের কঙ্কাল, নিভৃত স্বপ্নে সুরময় কবিতার ভিতর থেকে আইডিয়ার ক্লেদ। অধ্যাপকের ক্লান্ত কণ্ঠে তখন বিস্বাদ বচন, মোটা লেন্সের তলায় তখন অর্ধমৃত চাহনি। ঠিক তেমনি পেশাদার ক্রিকেটারের হাতে প্রাণহীন ব্যাট,—হাত থেকে ছুটে যাওয়া বলে অভ্যাসের মাপ।

আরো আছে। রয়টার, রেডিও, কমনওয়েলথ, ইউ. এন. ও. এবং জবাহরলাল মিলে জগৎবাসীকে ইণ্টারন্যাশনালিস্ট ক'রে ফেলেছে। ক্রিকেট খেলোয়াড়কে এনটারটেনমেণ্ট-এইড্-মিশনে যেতে হয় বিদেশভ্রমণে। ফল মনোরম। যে ছ'মাস নিজের দেশে আছে ক্রিকেটার, সে ছ'মাস 'কাছে থেকেও দূরে প্রিয়'। যে ছ'মাস বিদেশে, সে ছ'মাস—'কাঁহা গেলা প্রাণনাথ' ? অর্থাৎ সারা বছরই, পাঠক, আমার আলগা মুখ ক্ষমা করবেন, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, স্বামী ও স্ত্রী—'এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে'।

সমস্যার দূরীকরণে উপদেশ ও 'আওয়াজ' দুইই মিলেছে। উপদেশ হল—যত দিন ক্রিকেট খেলবে বিয়ে কোরো না। উপদেশ শুনে মুখ টিপে হাসেন প্রজাপতি ব্রহ্মা। মানুষের কতকগুলো গ্রন্থির মধ্যে তিনি যে মারাত্মক আবেগরস সঞ্চারিত ক'রে দিয়েছেন, তার

তাড়নায় হাজার অসুবিধাতেও মানুষ বয়সকালে বিয়ে ক'রে ফেলে। বিয়ে ক'রে যে অসুবিধেয় পড়ে সর্বসময়, তা নয়। বিখ্যাত পেশাদার ক্রিকেটাররা তাঁদের গ্রন্থে ঘরনীকে মূর্তিমতী প্রেরণা বলে ঘোষণা করেছেন প্রকাশ্যে। এখানে তাঁরা সত্যই সায়েব, বউদের কাছে ছাপার অক্ষরে কৃতজ্ঞ হতে তাঁদের বাধেনি। বাঙালী ক্রিকেটার বই লিখলে এক্ষেত্রে লিখতেন হয়ত—শ্রীমতী অমুকের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক (কী সম্পর্ক ?) তাতে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো—ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো পেশাদার ক্রিকেটার (যেমন জিম লেকার) ঘরনীর মূল্য স্বীকার করেছেন ঘরনীরূপেই। সপ্তাহভর ক্রিকেট খেলে এসে ক্রিকেটকে যখন বিষ লাগছে—তখন শয়নমন্দিরেও ক্রিকেটিকা ! ঈশ্বর রক্ষা করুন লেকার বলেছেন। লেকার বড় খুসী তিনি ঘরে ফিরলে বউ সাদা-মাটা পাঁচটা ঘরোয়া কথা বলে। ক্রিকেটাররা যে সামাজিক মানুষ, একটা অনুভব করবার সুযোগ তাতে ঘটে।

পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরাচ্ছে বলে ক্রিকেটারদের মধ্যে ইদানীং জোরালো 'আওয়াজ' উঠেছে—বিদেশসফরের সময় খেলোয়াড়দের বউদেরও নিয়ে যেতে হবে। বউকে ছেড়ে থাকবার জন্য কেউ বিয়ে করে না, বিশেষত সেটা যদি স্বাধীন জেনানার দেশ হয়। মনে রাখা ভাল, স্বাধীনতার শেষ নেই, কোনো পক্ষেই।

ক্রিকেট-বোর্ড বলল, সেটি হচ্ছে না। তুমি কামিনী ও ক্রিকেট দু'জনের সেবা এক সঙ্গে করতে পারবে না। সে কি ?—হাঁ।

ক্রিকেটের এই সকল বিধিব্যবস্থাই এম. সি. সি-র বিধানসভা থেকে আসেনি। কতকগুলি ক্ষেত্রে নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে পারে বিভিন্ন দেশের বোর্ড। স্ত্রীসংক্রান্ত ব্যাপারটি বিভিন্ন দেশীয় বোর্ডগুলির নিজেদের সৃষ্টি। এই নিয়মের নিষ্ঠুরতায় আমি যতখানি না অবাক হয়েছি, তারো বেশী অবাক হয়েছি এ বিষয়ে ইংরেজ মানব-প্রেমিকদের উদাসীনতায়। রোমান্টিক কবির দেশ ইংলণ্ড। তাঁরা ছ'মাসের বিরহ নিয়ে (মেঘদূতের যক্ষ-বিরহের অর্ধেক) কোনো

বেদনাকাব্য রচনা করেন নি, আশ্চর্য! স্ত্রীরা স্বকীয়া বলেই কি পাশ্চাত্য কবিদের উৎসাহের অভাব?

এখনকার ধারাবাহিক টেস্ট-ক্রিকেটের দিনে তাই ভালো ক্রিকেটারের জন্য মাসের পর মাস বাধ্যতামূলক বিচ্ছেদ। বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে প্রাণ চায় না। অথচ না গেলে রেকর্ড নষ্ট. দলে স্থান বজায় রাখা দুষ্কর। সুতরাং যেতে হয়। তখন বউ ঘরে থেকে রাঁধবে বাড়বে, ছেলেপুলে মানুষ করবে, দরকার হলে চাকরি করবে। এদিকে তাঁর কর্তা বিদেশে দর্শকদের আনন্দ দিতে ধোপদুরস্ত পোষাকে ছুটো-পাটি করবে সবুজ মাঠে; দুপুরে একরাশ দুশ্চিন্তা নিয়ে লাঞ্চ খাবে প্যাভিলিয়নে, কিংবা সন্ধ্যেয় খাবে ডিনার আর মদ। তারপরে নাচ দেখবে নাইট-ক্লাবে গিয়ে। এবং হয়ত, কে জানে, রাত বারোটার সময় চিঠি লিখতে বসবে,—'প্রিয়তমাসু, আমার সম্বন্ধে যা শুনেছ, তোমার দিব্যি, তা যদি সত্যি হয়।'

জনৈক 'ঘড়িয়ালে'র নারী বড় দুঃখে পতিনিন্দা করেছে ভারতচন্দ্রের কাব্যে—

রাত্রি দিন আটপর ঘড়ি পিটে মরে,
তার ঘড়ি কে পিটায় উল্লাস না করে।

ক্রিকেট-ব্যবস্থাপকদের বিধানের অর্থ করা তাই মল্লিনাথেরও অসাধ্য। নাইট-ক্লাবে যেতে দিতে বাধা নেই, যত দোষ কাছাকাছি বউ থাকলে! য়ুরোপীয় সমাজে তাহলে পুরুষের কর্তব্যপালনে বৃহত্তম বিঘ্ন—'ওয়াইফ'?

১৯৪৮ সালে ইংলণ্ড সফরের আগে ব্রাডম্যান সিড বার্নসকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তোমার বউয়ের কি হবে? সে তো এখন স্কটলণ্ডে।

বার্নস আশ্বাস দিলেন,—কদাপি না। সে স্কটলণ্ডের ত্রিসীমানা ছাড়বে না। তাই লিখে দেব। দলের কাছাকাছি ঘেঁষতে দেব না।

সতীলক্ষ্মী বউ, মহৎ তার প্রেম। তা কেবল কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়।

নির্বাচিত হবার পরে বার্নস সমুদ্রপারে ফোনে ডাকলেন গৃহিণীকে।—সুখবর, আমি যাচ্ছি, দেখা হবে। জাহাজঘাটায় এসো। কিন্তু আমি যে তোমার কেউ, ঘুণাক্ষরে কাউকে বুঝতে দিও না। বোর্ড বউয়ে বিশ্বাস করে না।

আমাদের প্রশ্ন, তবে কিসে করে—কোন্ উপ-যুক্ত বস্তুতে ?

শুনেছিলাম, সায়েবরা মা মরলে ছুটি দেয় না, কিন্তু বউয়ের হাঁচি হলে প্রি-পেড ট্যাক্সিতে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়—সে সব কি মিথ্যে ?

এই পর্যন্ত রচনা বাচ্চু বৌদিকে মনে রেখে। তাঁকে খুসী করবার জন্য ক্রিকেট-বোর্ডকে তো যাচ্ছেতাই করলুম। বোর্ডের পক্ষেও কিছু বলবার আছে। সেগুলো না লিখলে মিথ্যাচারের দায়ে পড়ব। বাচ্চু বৌদিকে বইটি উপহার দেবার সময়ে এই পাতাটি ছিঁড়ে দেব।

কথা হচ্ছে, ক্রিকেটার-বধূরা স্বামীর সঙ্গে বিদেশসফরে যখন আসবেন, তখন তাঁরা কি পতির কর্মে সতীর ধর্ম মানবেন ? হাজার হাজার মাইল ভেসে বা উড়ে গিয়ে সে দেশের মরা-সুসাইটি, জ্যান্ত-সুসাইটি, গড়ের মাঠ, পরেশনাথের বাগান, কি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল না দেখে ফিরে আসা যায় ? অতএব যখন নেট প্র্যাকটিশের দরকার তখন ব্যাটের হাতলের বদলে বধূর হাত ধরে ক্রিকেটার ঘুরছে কুতুবমিনার, কি বিড়লামন্দির, কি রেডফোর্টে। তাছাড়া বউ কাছে থাকলে হাজার ঝামেলা,—আজ অর্ধাঙ্গিনীর বুক ধড়পড়, কাল ছোট ছেলেটার সর্দি, পরশু সিনেমায় নতুন বই। এসব করবার জন্য ক্রিকেটারকে পয়সা খরচ ক'রে বিদেশে নিয়ে যাওয়া হয় না। দেশের মান রাখবার জন্য হোটেলরূপী শিবিরে রাত্রিবাস ক'রে যেখানে ক্রিকেটার-সৈনিকদের প্রভাতে যুদ্ধগমন করতে হয়, সেখানে 'প্রেয়সী দাঁড়ায়ে দ্বারে নয়ন মুদিছে'—ব্যাপারটা বিশ্রী।

তবু—বোর্ড 'কর্তা' দিয়ে তৈরী, আবার 'মানুষ' দিয়েও তৈরী। মানুষ মাত্রেই সহৃদয়। সহৃদয়তার ফল মারাত্মক হয় কখনো কখনো। একটা সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

১৯৫৯-৬০ সালে অস্ট্রেলিয়া-সফরে গিয়েছিল ইংলণ্ড। গিয়েছিল পতাকা উড়িয়ে। নামানো পতাকা নিয়ে ফিরে এল। বেনোডের দল ইংলণ্ডকে হারালো চূড়ান্তভাবে। অথচ খেলা শুরুর আগে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যায়নি। প্রথম টেস্ট শেষ হবার পরে বেনোড বলে ছিলেন—জিতবার পরে তবে আমরা বুঝলুম যে, আমরা জিতেছি।

ব্রিসবেনে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার ঐ প্রথম টেস্টের কথা দর্শকেরা সভয়ে স্মরণ করে। ট্রেভর বেইলী তাঁর রান-পক্ষাঘাতের ব্যাধি সংক্রামিত করতে পেরেছিলেন দলীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে। আর সে কী ব্যাধি! দু'এক জন ছাড়া সকলেই বলল,—বেইলী-ব্যবসা যথেষ্ট হয়েছে, এবার খ্যামা দাও! দর্শকরা রেগে গিয়ে খবরের কাগজে চিঠি পাঠাতে লাগল,—স্টাম্পের ৬ ইঞ্চির বেশী বাইরের বলকে ওয়াইড ঘোষণা কর ; যে ব্যাটসম্যান ঘণ্টায় ২৫ রানের বেশী করবে না তাকে আউট বলে ভাগিয়ে দাও। অনেকে আরও রেগে লিখল—ইংলণ্ডকে ফেরত পাঠাও দেশে ; তাদের ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফেরার জন্য ৪ পাউণ্ড চাঁদা আমাকে বললেই দিয়ে দেব। হ্যামণ্ড বললেন,—"এ কী খেলা হচ্ছে ? ট্রেভর বেইলীর মাটি-কামড়ানোর চেয়ে নর্মান ও'নীলের তেড়ে-যাওয়া খেলা অনেক সুস্থ ব্যাপার। খারাপ উইকেট ভালো ব্যাটসম্যানকে মারতে বাধা দিতে পারে না সব সময়। তোমরা মারতে চাইছ না. এইটেই মূল কথা।" কঠিন ব্যঙ্গ করলেন নেভিল কার্ডাস! আধুনিক রীতিসিদ্ধ ব্যাটসম্যানেরা এই এই ক্ষেত্রে বল একদম মারবে না—

যখন বোলিং নিখুঁত,
যখন বোলিং নিখুঁত নয়,
যখন উইকেটে অতিরিক্ত ঘাস আছে
যখন উইকেটে অতিরিক্ত ঘাস নেই,
যখন ফিল্ডিং ঘিরে আছে,
এবং যখন ফিল্ডিং ঘিরে নেই।

এ সকল সমালোচনার মূল কারণ ঐ বউ। দলের অধিনায়ক পিটার মে দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে আর মিশছিলেন না। সে সহজ সৌহার্দ্য আর যেন নেই; মে এখন বড় সুদূর, বড় স্বতন্ত্র। ক্রফোর্ড হোয়াইটের মতের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হয়ে চার্লস ব্রে ডেইলী হ্যারল্ড পত্রিকায় পিটার মে'র পরিবর্তিত স্বভাবের কারণ জানালেন—

"মে'র হৃদয়টা যথাস্থানে আছে তো? মে এখন সামাজিক মেলা-মেশার ক্ষমতা দ্রুত হারিয়ে ফেলছেন। ১৯৪৬ সালের টেস্ট ম্যাচের সময়ে ওয়ালী হ্যামণ্ড যে গর্তে পড়েছিলেন, সেই গাড্ডায় পড়বার সমূহ সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে পিটারের। দলীয় সংহতির প্রয়োজনের কথা মে যতই জোরের সঙ্গে বলুন না কেন, তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না দলের মধ্যে। দুর্বলতম অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণের ধাক্কায় ইংলণ্ডের যে পরাজয় ঘটেছে, তার জন্য পিটার মে'র ত্রুটিযুক্ত অধিনায়কত্বকে আংশিকভাবে দায়ী করতে হবে। মাঠের বাইরে খেলোয়াড়রা তাদের ক্যাপ্টেনকে প্রায় দেখতেই পায় না। কত সময়ে দেখেছি তারা নিঃসঙ্গে, কিংবা জোটানো সঙ্গীর সঙ্গে আহার সারছে।"

এরকম হবার কারণ? কারণ আর কিছু নয়—পিটার মে ও তাঁর দলের মধ্যে একটি 'জীবন্ত' বালিকার অবস্থিতি।

চার্লস ব্রে বলছেন—

"মে'র প্রণয়িনী ভার্জিনিয়া গিলিগান দলের সঙ্গে একই হোটেলে অবস্থান করছেন। কাজেই মে'কে বেশী সময় দিতে হচ্ছে তাঁকে।"

আসল কথা বেরিয়ে পড়ল। ক্রিকেটের কর্মকর্তারা এই জন্যই তো লাফিয়ে উঠে বলেন, আমরা চাইনা প্রকৃতির প্রবেশ ঘটুক ড্রেসিংরুমে। কর্মকর্তারা কবিদের মত প্রকৃতিবাদী নন।

পিটার মে অবশ্য এই সব অপপ্রচারের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। এটা 'কোমর-বন্ধনীর নীচে নোংরা আঘাত'। আঘাত কিন্তু অবশ্যম্ভাবী ছিল। বিশেষ ক'রে একই সময়ে কলিন কাউড্রের বউ পেনেলোপী যখন ঐ স্থানেই আবার হাজির। মে'কে সরাসরি জিজ্ঞাসা করা হল—আপনি কি মনে করেন না যে, আপনি এবং কাউড্রে কর্তব্যে

শৈথিল্য দেখাচ্ছেন? সে শৈথিল্যের কারণ কি ঐ দুই মহিলার উপস্থিতি নয়? মে উত্তর দিয়েছিলেন, আমার দলের কোনো সদস্যই মনে করেন না যে, তিনি পূর্ববর্তী কোনো সফরের চেয়ে কম মনোযোগ পাচ্ছেন আমার কাছ থেকে। পেনী কাউড্রে আমাদের সকলের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়, আমরা সকলে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছি। পেনীর উপস্থিতিতে কলিন আরো ভালো খেলবেন, এই আমার প্রত্যাশা। আর আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং আমার প্রণয়িনীকে এসব ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনা অত্যন্ত সস্তা ধরনের কাজ হয়েছে—সেটা অহেতুক ও অসঙ্গত।

মে সুন্দরভাবে আত্মসমর্থনের চেষ্টা করছেন, তবু প্রশ্নটা থেকে যায়, ইংলণ্ড অমন শোচনীয়ভাবে হারল কেন? অস্ট্রেলিয়ার আশ্চর্য-জনক নিভৃত উন্নতির জন্যই কি শুধু? অনেকেই বিশ্বাস করতে চাননি সে কথা। ইংলণ্ডের তখন খাতাভর্তি সম্পত্তির হিসাব। হাটন বলেছিলেন, পৃথিবীর সেরা বোলিং ইংলণ্ডের ঝুলিতে। তাহলে ইংলণ্ড হঠাৎ দেউলিয়া হয়ে গেল কি করে? হাটন প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন,—বোলার থাকলে কি হবে, তাদের লড়বার মত কিছু রান দিতে হবে তো। ওহে ইংরেজ যুবকগণ,—হাটন করুণভাবে মিনতি করেন,—কিছু রান দাও, যার উপরে বোলারেরা বল ছুঁড়বে।

ইংলণ্ডের যুবকেরা রান দিতে পারে নি। তাই পিটার মে-র কৈফিয়তে কেউ আস্থা স্থাপন করল না শেষ পর্যন্ত।

সবই বুঝলুম। সিদ্ধান্ত করি কোন্ পক্ষে? খেলোয়াড়ের পাশে বউ থাকা উচিত না অনুচিত? যথার্থই সহধর্মিণী হয়েছেন এমন কত ক্রিকেটার-বধূ রয়েছেন, আবার ক্রিকেট-নাশক বধূর সংখ্যাও অল্প নয়। লিণ্ডওয়ালের বউ স্বামীকে বুড়ো বয়সে প্রতিদিন সকালে দৌড়ে পাহাড় টপকাতে বাধ্য করতেন—স্বামীর ফাস্ট বোলারীয় ফর্ম যাতে ৩৮ বৎসর বয়সেও বজায় থাকে। উমরিগরকে টেস্টে সেঞ্চুরী করতে হয়েছিল জন্মদিনে বউকে উপহার দেবার জন্যই।

অন্যদিকে দলের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে জাগুয়ার গাড়ীর স্টিয়ারিং ধরে হ্যামণ্ড ঘুরতে লাগলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রান্তরে—কারণ তাঁর পত্নী বিবাহবিচ্ছেদের নালিশ করেছেন ইংলণ্ডে।

সুতরাং আপনারাই বলুন, কোনটা ঠিক, শূন্য ঘরে আয়নার সামনে প্র্যাকটিশ, না পূর্ণ ঘরে নিজের গতকীর্তির অ্যালবাম দেখা? বলুন আপনারা, আমার পুরুষ পাঠকেরা, আমি কোন্ দিকে যাই,—বিদেশসফরে পত্নীর সহগমনের পক্ষে বা বিপক্ষে? লেকার বলেছেন, পত্নী কাছাকাছি থাকাই ভাল, তাতে ধর্ম বাঁচে।

শেষ প্রশ্ন—সে ধর্ম কার, পতির না পত্নীর?

কলমে ক্রিকেট

কোনো একজন বিখ্যাত কবি 'সন্ধ্যা বেলায় এ কোন্ খেলায় করলে নিমন্ত্রণ' গানটি গাইতে গাইতে ক্রিকেট খেলার মাঠে নেমেছিলেন এবং স্পিন বলে বিভ্রান্ত হয়ে আক্ষেপ করেছিলেন করুণ কণ্ঠে—হায়! বলটি আমাকে প্রতারণা ক'রে উইকেটের হৃদয় ভেঙে চলে গেল। এই গল্প শুনে বিজ্ঞান-পড়া রমেন মিত্তির কবিদের সম্বন্ধে নানা অপ্রিয় উক্তি ক'রে বললেন, ব্যাটটা কলম নয়, আর বলটা নয় কালি। কাগজের উপর আঁচড় কেটে মন ভোলানো চলে, ব্যাট ধরতে হলে 'মদৎ' থাকা চাই।

ক্রিকেট-প্রসঙ্গে কবি-সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে রমেন মিত্তির যতই কটূক্তি করুন, সাহিত্যিকরাই ক্রিকেট খেলাটিকে রমণীয় ক'রে রেখেছেন। ক্রীড়াসাহিত্যিক রাখাল ভট্টাচার্য মরিয়া সাহসে সেই কথাটি বলেছেন—

"আমি তো বলি, ক্রিকেটের দীর্ঘ ও গৌরবময় ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ ইনিংস ব্যাট থেকে উৎসারিত হয়নি, তা হয়েছে একজনের কলম থেকে, তাঁর নাম নেভিল কার্ডস।"

ক্রিকেট কবি-সাহিত্যিকদের মুখ যত খুলে দিতে পেরেছে,

এমন আর কোনো খেলা নয়, অতি জনপ্রিয় ফুটবল পর্যন্ত নয়। ভারতের কোনো জাতীয় খেলা নেই এ যুগে। ফুটবল যেটুকু হয়েছে বাংলাদেশে, তার প্রাপ্য সে পেয়েছে ১৯১১-এর মোহনবাগান এবং গোষ্ঠ পালের বন্দনায়। রাজা রাজড়ার যুগে শিকার খেলা এক রকম ছিল, অন্ন ও উপাধিপুষ্ট করিয়া মৃগয়া এবং বিদূষক মিলিয়ে তার যথালঙ্কার বর্ণনাও ক'রে গেছেন, কিন্তু আসল খেলা ছিল সে যুগে পাশা, ভারতের সবচেয়ে বড় কবি ব্যাসদেব সভাপর্বে যার বিশদ বিবৃতি দিতে ভোলেন নি।

কবির কাছে খেলার মাঠে প্রেরণার একমাত্র ফুলধনু হতে পারে ব্যাট বা বল হাতে ক্রিকেটার। ইংরেজরা নাট্য-সাহিত্যের ব্যাপারে আমাদের থেকে অনেক যোজন এগিয়ে আছে—সে কথা বিনা চিন্তায় সকলেই স্বীকার করেন। সমালোচকেরা আমাদের জানিয়েছেন, যতক্ষণ না তোমরা বোম্বেটে ড্রেক, চতুর র‍্যালে বা কৃপাদক্ষিণা কুমারী এলিজাবেথ হতে পারছ, ততক্ষণ নাটক তোমাদের আসবে না। যৌবনজ্বালাই যদি প্রয়োজন হয় নাটকীয় সাহিত্যে, তাহলে আমাদের ক্রিকেট-সাহিত্য গড়ে উঠা শক্ত। আমাদের তো নাটক নয়, আমাদের যাত্রা। আমরা কি নানা অঙ্কে বিভক্ত ভারতীয় 'শিশুপালবধ' যাত্রা দিনের পর দিন দেখিনি? ভারতপক্ষে প্রায় কোনো প্রাপ্তবয়স্ক ও যৌবনবন্ত না থাকাতেই তো ঐ সব দুর্ঘটনা ঘটতে পেরেছে।

মনে পড়ছে আমাদের ১৯৫৭ সালে ইডেন উদ্যানে অস্ট্রেলিয়ান আক্রমণকে। আমাদের সেই কয়েকদিনের শ্মশান-জাগরণ! একাদশ রথী পরিবৃত কচি কচি অভিমন্যুদের আহা কি প্রাণান্ত সংগ্রাম! কুক্ষণে তারা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে প্রবেশের পথ জেনেছে। আমরা অশ্রু-কলুষিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি—সেই দুর্ধর্ষদের বিরুদ্ধে বিনাশ নিশ্চিত জেনেও শিশুযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম,—জাতীয় পতাকাতুল্য উইকেটরক্ষায় তাদের জীবনপণ প্রয়াস। দাঁতে দাঁত দিয়ে, মাটি কামড়ে, ঠুকে, গ্লাসের জল খেয়ে, মাথার ঘাম ফেলে, প্যাডে-ব্যাটে-গ্লাভসে-বলে লড়াই! অথবা আমাদের মনে পড়ে পঞ্চান্ন মিনিটের

পর উত্তেজনার মুহূর্তটি—যখন ত্রিশ হাজার দর্শক আনন্দের আবেগে শিউরে উঠল—'ওরে একটা রান হয়েছে, একটা রান হয়েছে,'—যখন স্কোরার তন্দ্রা ভেঙে সবিস্ময়ে সেই মহা-রানটিকে টুকে নিল। কিন্তু সকলি—'বৃথা এ জনম বৃথা এ খেলা'। শিশুরক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল পাইন-ঝাউ-দেওদার-ঘেরা ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যান।

আমরা অবশ্য যাত্রার অভিমন্যুবধ পালা দেখতে যাইনি, গিয়েছিলুম খেলা দেখতে। তাই পয়সা ও পরিশ্রমের অতখানি অপব্যয় সইল না। স্লো-মোশন্ ক্রীড়াচ্ছবির বিরুদ্ধে বুঝি একটু আপত্তি করেছি, সামনের বৃদ্ধটি বেমক্কা-রকম চটে উঠলেন। গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি থেকে শুরু ক'রে বাটা মাছের ঝাল, দইয়ের ভাঁড়, ছাঁচি পান, সব কিছু সাজিয়ে এনেছেন মাঠে। বার্ধক্যের অবসরক্ষণটুকু পরিপাটি ভোজনের পর ধীরেসুস্থে মাঠে কাটাতে চান। খাওয়ার সময় হোটেলে নাচের মত মাঠের ক্রিকেট উপরি লাভ। আমাদের উত্তেজনায় বিরক্ত হয়ে বললেন, আপনারা বড় বেশী 'নার্ভি' হয়ে পড়েছেন। সবিনয়ে জানালুম, বাড়িতে মরণাপন্ন রোগী থাকলে একটু নার্ভাস সকলেই হয়।

১৯৫৭ সালের ইতিহাস বার বার পুনরাবৃত্ত হয়েছে অতঃপর ইডেন গার্ডেনে বিশেষজ্ঞ পাঠক তা জানেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে আমাদের লজ্জার ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করতেও লজ্জা।

অথচ আমাদের শঙ্কা ও স্নেহের দোলায় চড়ে দোল খাবার মত অপোগণ্ড অবস্থা ছিল না ভারতীয় ক্রিকেটের চিরদিন। 'ছোট রাজ্যের শাসনকর্তা কিন্তু বৃহৎ খেলার সম্রাট্' নবনগরের জাম সাহেবের কথা বলছি না, দলীপ কি পাতৌদিকেও বাদ দিতে পারি, তবু আর কি কেউ ছিল না আমাদের যাঁর হাতের ব্যাট কুলবধূর মত বলের অত্যাচার সইবার জন্যই দারুদেহ ধারণ করেনি?

সামনে দিয়ে সরে যাচ্ছেন একে একে—সি কে নাইডু, উজির আলি, দিলওয়ার হোসেন, দেওধর, অমর সিং, এল পি জয়, পালিয়া কিংবা কিছু পরবর্তী মার্চেন্ট, মুস্তাক, অমরনাথ, মানকদ, হাজারে—

লিয়ারী কনস্টানটাইন তাই লজ্জিত হয়েছেন। লিয়ারী কনস্টানটাইন হলেন পৃথিবীতে একমাত্র লিয়ারী কনস্টানটাইন। Leary is immortal, inimitable, alone! লিয়ারী কনস্টানটাইন—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্রিকেটের পূর্ণাবতার।

লিয়ারী কনস্টানটাইন লজ্জাক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলেছেন—ভারতীয়দের হলো কি—তারা রনজি-দলীপকে ছেড়ে হাটন-বেইলীকে আদর্শ করল! লিয়ারীর কথা থেকে মনে হতে পারে আমরা বুঝি হাটন-বেইলীকে অনুসরণ করতে পেরেছি উপযুক্ত ভাবে। কদাপি নয়। তা আমাদের সাধ্যে নেই। আমরা নিয়েছি হাটনের নীতি এবং বেইলীর নেতি, তাঁদের সামর্থ্যটুকু বাদ দিয়ে।

নয়াদিল্লীর সংবর্ধনা সভায় মহান লিয়ারী বললেন, আধুনিক ক্রিকেটের দোষ—কোচিং-এর বাড়াবাড়ি। কোচিং-স্কুলে তরুণ ক্রিকেটাররা যাবে প্রাথমিক জিনিষগুলি শিখতে, বাকি সব-কিছু তারা নিজেরা তৈরী ক'রে নেবে।

দশটি ড্র-এর ভারত-পাকিস্তান টেস্ট সিরিজ সম্বন্ধে কনস্টানটাইন বললেন জঘন্য! পৃথিবীতে এমন জিনিষ তোমরা কেউ কখনো শুনেছো?

ভারতীয় ক্রিকেটের স্বপ্নযুগের ছবিকে কনস্টানটাইন দর্শকের সামনে তুলে আনলেন তারপর। সেই রোমান্টিক অধ্যায়ে রনজি ছিলেন নায়ক, যিনি ফিল্ডিংব্যূহের মধ্যে নানা ফাঁক আবিষ্কার ক'রে তার মধ্যে দিয়ে বল চালিয়ে দিতেন। যিনি নিজের ইচ্ছায় বল মারতেন, বোলারের ইচ্ছায় নয়।

দলীপের কথা বললেন কনস্টানটাইন;—দলীপ কব্জির মোচড়ে বল পাঠাতেন বাউণ্ডারীতে; আর পাতৌদি?—জোর বলের বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া বলকে বিজয় মার্চেন্ট যখন মারতেন, তখন কোনো ফিল্ডার নড়বার সুযোগ পেত না; এবং মুস্তাক,—কনস্টানটাইন জানালেন,—তিনি ছিলেন কাট ও গ্লাসের রাজা, এবং শিল্পীর সেরা।

"শ্রেষ্ঠতম বোলার" অমর সিং-এর বিরুদ্ধেই লিয়ারী তাঁর জীবনের সেরা খেলা খেলেছেন। ১৯৩৪-৩৫-এর জুবিলী বছরে কোলি এবং নেলসনের মধ্যে যে ল্যাঙ্কাশায়ার লীগের খেলা হয়েছিল—এটি সেই খেলা। অমর সিং লিয়ারীকে এল বি আউট ক'রে দিয়েছিলেন এবং পরে অন্যান্যদের আউট ক'রে যখন ১৬৪ রানে লিয়ারীর দলের ইনিংস শেষ ক'রে দিলেন, তখন খেলাটি চরমতম উত্তেজনার শিখরে, কারণ তখন দু'পক্ষেরই রান সমান সমান।

এই সব মহান ক্রিকেটারের ঐতিহ্যবাহীরা আজ হাটনের দর্শনের অনুগামী! তারা হাটন-বেইলীর পদচিহ্ন ধ্যান করছে ধর্মীয় উৎসাহে! কনস্টানটাইন সখেদে বলছেন—হায়রে—হায়!

সত্যই হায়! এই সব খেলোয়াড়দের নিয়ে কি সাহিত্য করা চলে! নাটকে মৃত সৈনিকের নড়াচড়ায় বীররসের সৃষ্টি হয় না—হয় হাস্যরসের।

লেখিকা শ্রীপ্রমিতা রায় সংবাদপত্রে 'ক্রিকেট সাহিত্য' নাম দিয়ে একটি উপাদেয় ও তথ্যপূর্ণ রচনা লিখেছিলেন। ঐ রচনায় তিনি ইংরেজীতে বহুবিধ ক্রিকেট লেখা ও লেখকের বিবরণ দেবার পরে দুঃখ করেছেন—বাংলায় সেরকম কিছু গড়ে ওঠেনি। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার, বুদ্ধদেব বসু, লীলা মজুমদার প্রমুখ সাহিত্যিকদের রচনায় ক্রিকেটের উল্লেখ আছে, তিনি জানিয়েছেন, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সৃষ্টির পরিমাণ নিতান্ত অল্প।

শ্রীমতী রায়ের বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার কিছু নেই। কিন্তু ঐ প্রশ্নই আবার করছি—গড়ে উঠবে কি নিয়ে? মহাকবি কালিদাস বাংলা ভাষায় লিখতে পারেন—'নেই তাই খাচ্ছ',—কিন্তু সেই বাংলা-ভাষা-প্রেমিক মহাকবিকে খুঁজে পাওয়া যাবে কোথায়?

তবু কলমের হলচালনায় বাঙালীরা পেছিয়ে থাকে না কখনো। একটা পুরানো দৃষ্টান্ত ধরা যাক। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ভারতীয়রা যখন সত্যই ক্রিকেট খেলত তেমন এক সময়ের একটি খেলার বর্ণনা

লিখেছিলেন। বাংলায় ক্রিকেট-সাহিত্য নিয়ে আমি ঠিক গবেষণা করিনি কিন্তু বিক্ষিপ্ত রচনার কথা যদি বলা যায় অচিন্ত্যকুমারের ঐ লেখাটি বাংলায় ক্রিকেট-সাহিত্যের প্রথম পৃষ্ঠা। জনৈক বন্ধু জানালেন, আরো কিছু লেখা আছে পূর্বের, যেমন কুলদারঞ্জন রায়ের। সে ক্ষেত্রে অচিন্ত্যকুমারের লেখাটি প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার এক পৃষ্ঠা।

অচিন্ত্যকুমার ১৯৩৩-৩৪ সালে জার্ডিন দলের ভারত-সফরের কিছু বিবরণ লিখেছিলেন মৌচাকের পৃষ্ঠায় ছোটদের জন্য। বড়দের জন্য নয় বলে কে ?—

ভারতবর্ষ বনাম ইংলণ্ড

টেস্ট ম্যাচ

গেলো পনেরোই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে এ বছরের প্রথম টেস্ট খেলা সুরু হয়, শেষ হয় আঠারো তারিখের বিকেলে। নাইডু, ভারতবর্ষের ক্যাপ্টেন, দৈবাৎ টসে যায় জিতে—দৈবাৎ বলছি কারণ টসে জেতা জার্ডিনের প্রায় একচেটে হ'য়ে গিয়েছিলো। (কথায় কথায় এখানে তোমাদের একটা মজার খবর দিচ্ছি। বাংলার ভূতপূর্ব গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন ১৯০৫ সনের টেস্ট ক্যাপটেন হ'য়ে একের পর এক সবগুলি ম্যাচে টসে জিতেছিলেন)। টসে জিতে ভারতবর্ষ ব্যাট করতে সুরু করে, কিন্তু এগারো জনে মিলে ২১৯-এর বেশি এগোতে পারলো না। খেলা হচ্ছে বোম্বাইয়ে, কিন্তু কলকাতার কি উৎসাহ! দুটো বাজতে না বাজতেই খবরের কাগজের আপিসে ফোনের পর ফোন, মশায়, লাঞ্চ-স্কোর কতো, কতো করলো ভারতবর্ষ? বোম্বাইয়ে খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সন্ধ্যে-বেলায় সবিস্তারে খবর এসে গেলো—ভারতবর্ষ ২১৯ রানে আউট হয়ে গেছে। বিশেষ অভিলষিত খবর নয়, জবাবে ইংলণ্ড কী হুমকি দেয় বলা যায় না। ২১৯ রানের মধ্যে ওয়াজির আলি ৩৬, অমরনাথ ৩৮, নাইডু ২৮, মার্চেন্ট ২৩, আর কোলা ৩১—কী করুণ ইতিহাস! ইংলণ্ড সমস্বরে হাঁকলে ৪৩৮, ভাবতে পারো, ৪৩৮! ভ্যালেন্টাইন ১৩৬, ওয়ালটার্স ৭৮, জার্ডিন ৬০, এলিয়ট নট-আউট ৩৭। ভারতবর্ষের ফিল্ডিং সেদিন টেস্ট খেলার অনুরূপ হয়নি। ভ্যালেনটাইনকে প্রায় ইচ্ছে করে সেঞ্চুরি করতে দেওয়া হয়েছিল—নাইডু, রামজী আর কোলা তিন তিনটে ক্যাচ দিলে

ফেলে। ভারতবর্ষ আবার ব্যাট নিলে—দেখা যাক এবার কতোটা দাঁড়ায় বুক ফুলিয়ে। সতেরই ডিসেম্বর সন্ধ্যের দিকে আবার কলকাতার খবরের কাগজের আপিসগুলি আক্রান্ত হতে লাগলো—শোনা গেলো—সে এক অভ্রভেদী আনন্দ-সংবাদ—অমরনাথ, লাহোর কলেজের ছাত্র, একুশ বছরের অমরনাথ এম সি সি-র বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করছে, নাইডুও আছে চল্লিশের কোঠায়—দুজনেই নট-আউট। শোনা গেলো অমরনাথের সেঞ্চুরি করবার পর বোম্বাই একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে, খেলার মাঠে কেউ তার গলায় পরিয়ে দিয়েছে ফুলের মালা, কেউ দিয়েছে সোনার বাটি, কারো কারো বা টাকার তোড়া। সে একটা হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। সেদিনের খেলা ভাঙবার পর ক্ষিপ্ত জনসমুদ্র অমরনাথের দর্শন পাবার জন্যে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত, বিকীর্ণ হয়ে পড়তে লাগলো; ভাঙলো টেবিল-চেয়ার, ছিঁড়লো জামা-কাপড়, জখম হতে লাগলো হাত-পা, চোখ-মুখ! বীর অমরনাথ, তেজস্বী অমরনাথ। সবাই ভাবলুম, ভেবে নিশ্চিন্ত হলুম, অন্তত ড্র কে আটকায়। খেলার আর আধদিন মোটে বাকি, অমরনাথ ও নাইডু এখনও আউট হয় নি, হাতে আমাদের আরো সাত সাতটে উইকেট। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতবর্ষ মোটে করলো ২৫৮। অমরনাথ আউট হয়ে গেলো ১১৮-তে, নাইডু ৬৭-র বেশি যেতে পারলো না। ব্যাস্, যেই নাইডু ব্যাট ছাড়লে, সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ গেলো উবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে। এক মার্চেন্টই যা করলো ৩০, আর কোলা ১২। বাকি আর পাঁচজন (তার মধ্যে জয় আর অমর সিং, নিসার আর রামজী) একত্র হয়ে ভারতবর্ষের তহবিলে গুণে গুণে মোট তিনখানি রান যোগ করলে। ভাবতে পারো সে দুর্দশার কথা? ভারত-সিংহ যা একটু থাবা মারতে পেরেছিলো, ল্যাজ নাড়তে পারলো না। জেতবার জন্যে ইংলণ্ডের মোটে চল্লিশ রান দরকার—সময়ও তার হাতে তখন যথেষ্ট। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের এক মিচেল মোটে ৯ রান করে আউট হলো—বাকি ৩১ রান ওয়ালটার্স আর বার্ণেট ভাগাভাগি করে অনায়াসে তুলে দিলে। এ দেশীয় প্রথম টেস্টে ভারতবর্ষ গেলো ইংলণ্ডের কাছে ৯ উইকেটে হেরে।

তারপর এম-সি-সি এলো কলকাতায়, ভারতবর্ষের পূর্বতন রাজধানীতে। ইডেন গার্ডেন গম্ গম্ করে উঠলো। চারিদিক ঘিরে গ্যালারির পাহাড়, সবুজ গ্যালারি, সাদা গ্যালারি, বাদামি গ্যালারি—কোথাও এক ইঞ্চি দাঁড়াবার জায়গা নেই। দ্বিতীয় টেস্ট খেলার আগে এম-সি-সিকে কতকগুলো খুচরো ম্যাচ খেলতে হলো। প্রথম, বাংলার ব্রিটিশ দলের সঙ্গে—বিশেষ উল্লেখযোগ্য খেলা নয়,

এক বার্ণেটের ৯৪ করা ছাড়া। বেচারা ওভার বাউণ্ডারি করে সেঞ্চুরি করতে গিয়েছিলো, দড়ির কাছে ধরা পড়লো লংফিল্ডর হাতে। একদিনের ম্যাচ, ড্র হয়ে গেলো। তারপর খেললে বাঙালী ও ফিরিঙ্গির সমবেত দলের সঙ্গে। একটা রোমাঞ্চকর খেলা, অনেক দিক থেকে। নিকলসের দ্বিতীয় বলেই জে এম ঘোষ আউট হয়ে গেলো—স্কোর তখন শূন্য। তারপর এলো কার্ত্তিক, বাংলার সেরা ক্রিকেটার। চমৎকার খেলে, নিখুঁত খেলে সেদিন সে ৪২ রান করলে। ক্যাপটেন নীরজা রায়ের সঙ্গে সর্ট রান নিতে গিয়ে রান-আউট হয়ে গেলো। তার এরকমভাবে আউট হওয়ার দুঃখ সেদিন জনতাকে বিক্ষুব্ধ, অভিভূত করে তুলেছিল। নইলে সেদিন অন্ততঃ পঞ্চাশ সে করতোই, আর ক্রিকেটে ৪৯ করার চাইতে ৫০ করার দাম সহস্র গুণ বেশি। আরেক রোমাঞ্চ, পেটেলের ঠিক প্রথম বলেই এম-সি-সির গ্রেগারি আউট হয়ে গেলো—অভূতপূর্ব ঘটনা। তৃতীয় বিস্ময় পরে আসছে। ব্যানার্জির দ্বিতীয় বলে এম-সি-সির ক্যাপটেন দুর্দমনীয় জার্ডিন আউট হয়ে গেলো—বউলড আউট। এতো সব কীর্তি করেও বঙ্গ-ফিরিঙ্গি দল হেরে গেলো আট উইকেটে, যদিও হারবার পর আরও তিনটে উইকেট তারা ভেঙে দিয়েছিলো।

তারপর খেলা হলো অল ইণ্ডিয়ার সঙ্গে তিন দিন ব্যাপী ম্যাচ—তার মধ্যে বাছাই করা সাহেবের সংখ্যাই বেশি। ভারতীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল নাইডু, লাল সিং আর কার্ত্তিক। কার্ত্তিক সেদিনো ৩৮ করলে। নীল পাগড়ী-বাঁধা লাল সিং-এর ফিল্ডিং ছিলো সেদিনকার দেখবার জিনিস। এমন দৌড় কখনও দেখিনি, এমন বিপজ্জনক ক্যাচ ধরা। লাল সিং ছুটছে না, ছুটছে যেন রঙিন একটা হরিণ, এমন দ্রুত অথচ লীলায়িত তার ছোটা। আর কী নিখুঁত, নির্ভুল সে বল ছোঁড়া, কী অসম্ভব ক্ষিপ্রতায়! ভারতবর্ষে দুর্ভাগ্যক্রমে তার জন্ম হয়নি বলে, ও মালয়ে সে বসবাস করে বলে ভারতীয় হয়েও সে টেস্টে জায়গা পেলো না। যাই হোক, সে খেলা ড্র হয়ে গেলো, বলতে পারো সাহেবের সংখ্যা বেশি থাকার উহ্য অজুহাতে। অল ইণ্ডিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে জনস্টন আর ওয়ার্ড যখন পিটতে এলো, (জার্ডিন অনায়াসেই ফলো করাতে পারতো, কিন্তু করায়নি, জেতবার তেমন বিশেষ ইচ্ছে ছিলো না বলে (তখন এম-সি-সির বল দেওয়া ও ফিল্ড করা চোখ মেলে একটা দেখবার জিনিস হয়েছিলো। যে সে বল করছে, যে সে ক্যাচ ফেলছে, যেখানে সেখানে বল ছুঁড়ছে। মনে হচ্ছিল এম-সি-সি নয়, কোনো থার্ড ক্লাস বাজে দল। সেই জন্যেই সেই খেলায় বিশেষ জোর দিচ্ছি না।

দ্বিতীয় টেস্ট খেলা সুরু হয় পাঁচুই জানুয়ারী, শুক্রবার। এর আগে ভারতীয় টিমের অদল-বদল হয়ে গেছে, জয়'এর জায়গায় এসেছে নাওমল, হ্যাভেলের জায়গায় দিলওয়ার হোসেন, কোলার জায়গায় নাইডুর ভাই সি, এস, নাইডু, রামজী ও জামসেটজীর জায়গায় যথাক্রমে গোপালম্, ও মাস্তাক আলি। সবাই আশা করেছিলুম কাত্তিককে নেওয়া হবে—গোপালম্-এ মাদ্রাজ পর্যন্ত স্থান পেলো, কিন্তু হায়, বাংলা রইলো নির্বাসনে।

পাঁচুই জানুয়ারী শুক্রবার, ক্যালেণ্ডারের এমনি একটা সাধারণ সাদা তারিখ, বাংলা গভর্নমেণ্ট ছুটি ঘোষণা করলে। সাদা তারিখ দেখতে দেখতে লাল হয়ে উঠলো! গভর্ণমেণ্টের ছুটি দেওয়া থেকেই বুঝতে পারছো এ খেলা, এ জাতীয় সমরকে কতখানি মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ছুটি বলে সেদিন ইডেন গার্ডেন ছাপিয়ে গেলো জনতার জোয়ারে—কলকাতার রাস্তাঘাট প্রায় মরুভূমি হয়ে গেলো। সব গাড়ি, মোটর, বাস, হাজার হাজার লোক নিয়ে চলেছে ইডেন গার্ডেনের দিকে—ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের সংঘর্ষ! টসে জিতলো এবার জার্ডিন, ব্যাট করতে এলো মিচেল আর ওয়ালটার্স। ভারতবর্ষের হয়ে দিলওয়ার হোসেন উইকেট কিপিং করছে, বল দিচ্ছে অমর সিং। সূচীভেদ্য নীরবতা।

পঁয়তাল্লিশ রান হবার পর ওয়ালটার্স প্রথম আউট হলো ২৯ করে। অমর-সিংএর বলে গোপালম্ তাকে ধরে ফেললে নাইডুর ফিল্ড সাজাবার কায়দায়। তারপর এলো বার্নেট, আউট হলো মোটে ৮ করে, মোট স্কোর তখন ৫৫। আমরা ক্রমে ক্রমে তখন খুসী হচ্ছি। এলো ল্যাঙ্গরিজ, কিন্তু পরের উইকেট আর পড়ে না। অনেক পরে গেলো মিচেল ১৩৫-এ, ৪৭ খানা রান করে। এবারো তাকে ধরলো গোপালম্, ক্যাপটেন নাইডুর বলে। মিচেল যদি বা গেলো, ল্যাঙ্গরিজকে নড়ানো যায় না, কিন্তু ৭০ খানা রান করে সে পেছনের দিকে একটা দ্রুত, তীক্ষ্ণ ক্যাচ তুললে, অমনি বিদ্যুৎগতিতে নিসার কাঁধের উপর থেকে তাকে লুফে নিলো। সে একটা অদ্ভুত ক্যাচ। রান তখন ১৮৫—চারজন আউট। জার্ডিনের সঙ্গে ভ্যালেন্টাইন তখন জুটেছে—দেখতে দেখতে ১৮৫ উঠে গেলো ২৫৬-এ। ভ্যালেন্টাইন ৪০ করে আউট হলো। পড়ন্ত দিন বলে জার্ডিন তখন ভালো ব্যাট না আনিয়ে লেভেটকে আনালো। খেলা সাঙ্গ হলো সেদিনের মতো—মোটে পাঁচটা উইকেট তখন পড়েছে, স্কোর ২৫৭।

শনিবার, ছয়ই জানুয়ারী—জার্ডিন আর লেভেট করছে ব্যাট। ২৮১-তে

লেভেট আউট হয়ে গেলো ৫ করে, নাইডুর বলে। ২৮১-তেই জার্ডিনও আউট হলো, মাস্তাক আলির বলে নাইডুর ভাই চমৎকার একটা ক্যাচ ধরলে। জার্ডিন ৬১, তার ব্যাট চালাবার ও পা ঘোরাবার কায়দা অপূর্ব। ভাবলুম সাতটা উইকেট পড়েছে ২৮১-তে—এম. সি. সি. বোধ হয় তিনশোতেই নেবে যাবে। নিকল্‌স্ এসেও বেশী কিছু করতে পারলো না, ভাগ্যহীন ১৩-তে আউট হয়ে গেলো। ৩০১এ আটটা আউট—আচ্ছা, বড় জোর সাড়ে তিনশো। হ'তোও তাই, কিন্তু একের পর এক নাইডুর ভাই, মাস্তাক আলি ও নাওমল হাতের থেকে ক্যাচ ফেলতে লাগলো। কোথায় সাড়ে তিনশো, স্কোর এসে দাঁড়ালো ৩৭১এ, যখন টাউনসেণ্ড হলো আউট দিলওয়ার হোসেনের হাতে। এলো ক্লার্ক, সবচেয়ে ব্যাটে যে আনাড়ি, সেও কম-সে-কম দশখানা রান করলে, আর টিকে থেকে ভেরিটিকে করতে দিলো পঞ্চান্ন—নট আউট। নাইন্থ উইকেটে ভেরিটির এই দীর্ঘায়ুতা প্রায় একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। এই ভেরিটিই গত অস্ট্রেলিয়ান টেস্টে পেণ্টারের সঙ্গে নাইন্থ উইকেটে অসাধ্যসাধন করেছিল, এই ভেরিটিই দাঁড়িয়েছিল টাউনসেণ্ডের সঙ্গে অল ইণ্ডিয়ার ম্যাচে—সেও আশ্চর্য, নাইন্থ উইকেটেই! যাক, ইংলণ্ড যখন দশজন আউট হলো, তাদের স্কোর ৪০৩! খেলা হয়েছে মোটে দেড় দিন!

ভারতবর্ষ যখন ব্যাট করতে এলো, তখন প্রায় আড়াইটে। আরম্ভ করলো দিলওয়ার হোসেন আর নাওমল। বাঁ হাতে বল দিচ্ছে ক্লার্ক, বল তো নয়, কামানের গোলা। তেমনি নিকলস্—ছুটে আসে যেন একশো গজ ফ্ল্যাট রেস দিচ্ছে। নিকল্‌সের তেমনি একটা দ্রুত, বিশ্রী বল এসে লাগে দিলওয়ারের মাথায়, দিলওয়ার আহত হয়ে মাটিতে মুহ্যমানের মত বসে পড়ে। স্কোর তখন মোটে সাত, দিলওয়ার প্যাভিলিয়ানে ফিরে যায়. সেদিনের মতো আর খেলতে পারে না। ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্যের প্রথম সূচনা। এলো ওয়াজির আলি, কিন্তু আসতে না আসতেই নাওমল আউট হয়ে গেলো ২ করে। প্রথম উইকেট যখন পড়লো, ভারতবর্ষের তখন ১২। এলো তখন আমাদের ক্যাপটেন, ভাবলুম, মেঘ যাবে কেটে। কিন্তু পাঁচখানা রান করবার পর নাইডু ক্লার্কের একটা তোলা বল হাঁকড়াতে গেলো ছেলেমানুষের মতো, পলকও পড়লো না, পরিষ্কার বউলড আউট হয়ে গেলো। ক্যাপটেন হয়ে নাইডুর এমনি অসাবধান উচ্ছৃঙ্খল খেলাকে সবাই শতমুখে নিন্দা করতে লাগলো, অন্তত তার এমন দায়িত্বহীনতা কেউ প্রত্যাশা করেনি। ভারতবর্ষের আকাশ অন্ধকার। এলো অমরনাথ, বোম্বাইয়ের বীরাগ্রগণ্য, গলায় ছিলো যার ফুলের মালা, হাতে

সোনার বাটি, পকেটে টাকার তোড়া; ভাবলুম ভয় নেই। ক্লার্ক প্রায় মাথা তাক করে বল দিল, অমরনাথ কট আউট হয়ে গেলো। আমাদের দুর্ভাবনা জমে জমে তখন নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে চলে এসেছে, তিন তিনটে উইকেটে মোট ২৭, যেখানে ইংলণ্ডের ছিলো ১৩৫। ভীষণ হেরে যাবো, পৃথিবীকে আর মুখ দেখাতে পারবো না। এলো মার্চেন্ট, ওয়াজির আলির সহযোগিতায় খেলা সুরু হলো ভীষণ সাবধানে। আস্তে আস্তে টুক টুক করে নম্বর উঠতে লাগলো। দিনের আলো মরে এসেছে, পাঁচটা প্রায় বাজে, আশা হলো এরা দুজন আজকের মতো টিকে যাবে। কিন্তু ঘটলো আবার দুর্ঘটনা, পাঁচটায় মিনিটের কাঁটার আসবার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজির আলি ঘরে ফিরলে। তখন তার নিজের হয়েছে ৩৯, আর মোট ভারতবর্ষের হয়েছে ৯০ চার উইকেটে।

পরদিন রবিবার মাঠে এসে দেখি দিলওয়ার ব্যাট করছে মার্চেন্টের সঙ্গে। বিশাল শরীর, মাথায় ফেটি বাঁধা, অদ্ভুত তার ব্যাট ধরবার ভঙ্গি—দিলওয়ার যেন সাক্ষাৎ হিমালয়। যখন সে উইকেট কিপিং করছিলো, তখন আহত হাতের জন্য তাকে অনেক বল ছাড়তে হয়েছিলো বলে দর্শকরা তাকে সমস্বরে বিদ্রূপ করেছিলো, এখন করতে লাগলো স্তুতি, প্রতি বলে অভিবাদন। বলতে গেলে মার্চেন্ট আর দিলওয়ারই সেদিন ভারতবর্ষের মুখ রক্ষা করলে। একবার কী মজা হলো, শোন। দিলওয়ার ঘন ঘন ব্লক করছিল বলে জার্ডিন লোকজন নিয়ে তাকে ঘিরে ধরলো তাকে লুফে নেবার জন্যে। দিলওয়ার, দৈত্যাকার দুর্ধর্ষ দিলওয়ার অমনি এগিয়ে এসে ভেরিটির বলে অভ্রভেদী একটা ওভার বাউণ্ডারি করলে। অবহেলার যোগ্য প্রত্যুত্তর—সর, সরে দাঁড়া সব দড়ির দিকে। দিলওয়ার নতুন খেলতে আসেনি ক্রিকেট।

মার্চেন্ট ৫৪ করে আউট হলো, এলো মাস্তাক আলি। কিন্তু দিলওয়ার বেশীক্ষণ আর টিকতে পারলো না। আবার ক্লার্কের বল এসে লাগলো দিলওয়ারের আঙুলে, আঙুল গেল থেঁতলে। তবু সে এসে ফের খেললে, কিন্তু আহত আঙুল নিয়ে বেশি সুবিধে করতে পারলো না। ৫৯ করে আউট হলো জার্ডিনের হাতে। তবু দিলওয়ার ছিলো বলেই ভারতবর্ষ ভদ্রলোকের মত দাঁড়াতে পারলো। তারপর নাইডুর ভাই এসে চারদিকে ব্যাট চালালে—সেও করলে একটা ছয়, মোটমাট ৩৬। মাত্র ছয় রানের জন্যে ভারতবর্ষকে আবার ফলো করতে হলো (১৫০ রানের তফাত থাকলেই আবার ফলো করতে হয়), নিসার আর গোপালম্ সেই ছয় রান তুলতে পারলো না। নিসার ওভার বাউণ্ডারি করে সেই ছয় করতে গিয়েছিলো হয়তো, হাতে

পেয়েও ওয়ালটার্স তাকে প্রথমবার ফেলে দিলে। কিন্তু পরে আবার সে সেই মার মারলে, এবার আর ওয়ালটার্স ভুল করলে না। ২৪৭ করে ভারতবর্ষ তিরোধান করলে প্রথমবারের মতো।

তখনও আধঘণ্টার উপর সময় আছে, মাত্র ছয় রানের জন্যে ভারতবর্ষকে আবার নামতে হলো ব্যাট নিয়ে। এলো এবার নাওমল আর মাস্তাক আলি, ৩০ রান উঠে গেলো বোর্ডে, তাদের বিচ্ছিন্ন করা গেলো না। ভাবলুম, একদিন মোটে বাকি, পুরো দশ দশটা উইকেট হাতে, ড্র কে ধরে রাখে। যারা প্রথমবার কিছু করতে পারেনি, নাইডু, নাওমল আর অমরনাথ, তারা দ্বিতীয়-বার এসে প্রতিশোধ নেবে।

সোমবার—লোকে লোকারণ্য। মাস্তাক আর নাওমল ব্যাট করছে, হু-হু করে উঠে যাচ্ছে নম্বর। একেবারে ৫৭, কিন্তু ও হরি, মাস্তাককে বার্নেট ধরে ফেললে। যাক, একজন তো মোটে গেছে, ওয়াজির আলি এলো। নাওমল ১ করলে, ওয়াজির আলি আউট হয়ে গেলো শূন্য। সুরু হলো আবার ভাগ্য-বিপর্যয়। এলো নাইডু, তার স্বাধীন স্বাভাবিক খেলা ছেড়ে ভীষণ সতর্ক হয়ে ব্যাট ধরে রইল। ৪৩ করে নাওমল আউট হলো, এলো অমরনাথ। কিন্তু এবারো অমরনাথ তার খ্যাতির অনুরূপ কিছু করতে পারলো না, স্টাম্পের পেছনে লেভেটের হাতে আউট হয়ে গেলো ৯ রান করে, সবাই ম্রিয়মাণ হয়ে গেলুম। অমরনাথের নাকি এখনো বিশ্বাস বল তার ব্যাট ছুঁয়ে যায়নি, কিন্তু আম্পায়ারের বিচারের বিরুদ্ধে কোনো কালেই আপীল নেই, এবং ক্রিকেট হচ্ছে ক্রিকেট! চার চারটে উইকেট পড়ে গেলো ৮৮ রানে—আগের বারের চেয়েও শোচনীয়। এলো মার্চেন্ট কিন্তু আগের বারের মতো বেশিক্ষণ টিকতে পারলো না, আউট হলো মোটে ১৭ করে। গেলো বার পাঁচটা উইকেট পড়েছিল ১৩১এ, এবার ১২৯এ—ভয় হতে লাগলো ড্র দূরের কথা, এক ইনিংসে না হেরে যাই।

এলো দিলওয়ার হোসেন,—ভারতবর্ষের পরম পরিত্রাতা। নির্ভয় আত্ম-বিশ্বাসী অপরাজেয় দিলওয়ার। আবার আশার গুঞ্জন উঠলো, উল্লাসের আভাস। কিন্তু নাইডুও সন্দেহজনক ভাবে আউট হয়ে গেলো—এল-বি-ডবলিউ, ৩৮ করে। নাইডু স্কোর বেশি করেনি বটে, কিন্তু অনেকক্ষণ টিকে থেকে ভারতবর্ষকে সময়ে অনেক এগিয়ে দিয়েছে। নাইডুর খেলা সে হিসাবে যে কতো মূল্যবান হয়েছিলো বলা যায় না। নাইডুর যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার মেঘ এলো ঘনিয়ে। কিন্তু দিলওয়ার ঘন ঘন ব্যাট চালিয়ে বলতে লাগলো, ভয় নেই, আমি আছি।

আবার সে করলে ওভার বাউণ্ডারি, সঙ্গে সঙ্গে নাইডুর ছোট ভাইও। প্রতি বলেই যার নম্বর ফুলে উঠতে লাগলো ১৪৯ থেকে একেবারে ২০১। ইংলণ্ডের নম্বর কোনকালে ছাড়িয়ে এসেছি, এখন যতো পারো মারো, সঙ্গে সঙ্গে সময় আনো খাটো করে। দিলওয়ার আউট হলো ৫৭ করে, ছোট নাইডু ১৫, অমর সিংও দোহাত্তা ব্যাট চালিয়ে ১৮, মোটমাট ভারতবর্ষের হয়ে গেলো ২৩৭—ইংলণ্ডের চেয়ে ৮১ রান বেশি।

আর আছে কুড়ি মিনিট সময়, পেরোতে হবে এই ৮১ রান। তবেই ইংলণ্ড জিততে পারে। ত্বরান্বিত হয়ে এলো বার্নেট আর ওয়ালটার্স, ভারতীয়রা দড়ি ঘেঁষে দাঁড়ালো, যাতে চারের বাড়িতে একের বেশি না কেউ করতে পারে। নিসার বল দিচ্ছে, বার্নেটের হাতে ব্যাট। তোলা বল পেয়ে প্রথম বলেই বার্নেট বিপুল বেগে সেটাকে বাউণ্ডারি করতে গেলো (তাদের তখন প্রতি বলে রান করা দরকার), কিন্তু সে বল এসে পড়লো গোপালনের হাতে। বার্নেট আউট—শূন্য। এক উইকেট হারিয়ে ইংলণ্ডের ঘরে শূন্য। এলো ভ্যালেনটাইন—হাঁকড়াতে আর তার সাহস কী। কিন্তু এমনই ক্রিকেটের মজা, ভ্যালেন্‌টাইন, বোম্বাইয়ের টেস্টে যে ১৩৬ করেছিলো, নাওমলের অখ্যাত বলে স্টাম্পড্ আউট হয়ে গেলো তিন করে। দু দুটো উইকেট গেলো, হাতে মোট পাঁচ।

তারপর এলো লেভেট—দুরান আরো যোগ হলো বটে, এদিকে সময়ও এলো ফুরিয়ে। খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্টাম্প, বেইল আর বল নিয়ে খেলোয়াড়দের মধ্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেলো। তোমরা জানো বোধ হয়, টেস্ট খেলার এই সব সরঞ্জামগুলি যে চায় কেড়ে নিতে পারে, এই সব চিহ্নগুলি স্মৃতির অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে অসীম মূল্যবান। আশ্চর্য, সেই কাড়াকাড়ির থেকে আম্পায়ার ফ্র্যাঙ্ক ট্যারেণ্টও বাদ পড়েনি—দিলওয়ারের সঙ্গে একটা স্টাম্প নিয়ে তার কী যে টানাটানি!

যাক, দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হয়ে গেলো—ভারতবর্ষের পক্ষে প্রায় সম্মানজনক ড্র ই বলতে পারো।

মাঝের কিছু বছরকে একদম বাদ দিচ্ছি। ১৯৬০-৬১ মরশুমের কথা ধরা যাক। এই বছরে ক্রিকেট নিয়ে যেসব লেখা হয়েছে, আমি সবিনয়ে জানাতে পারি, সেখানে সত্যই সাহিত্য আছে। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন লেখক শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারীর বাংলা

লেখার কথা বাদ দিচ্ছি ; বাংলাও তিনি সুন্দর লেখেন, অজস্র প্রবাদ ওগানের চরণের ব্যবহার তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য, তবু তিনি ইংরেজীরই বড় লেখক। কিন্তু বাংলাতেও উল্লেখযোগ্য লেখা হয়েছে।

উপযুক্ত বিষয়ের অভাবের কথা আগেই বলেছি, তবু কলম থেমে নেই। পাঁচদিনের ক্রিকেট হল খেলার দুর্গোৎসব। উৎসববাড়ির নানা অংশের কথা নানাজনে লিখেছেন সরস ভঙ্গিতে। সুপরিচিত রূপদর্শী তাঁর ব্রজদাকে খেলার মাঠে হাজির ক'রে আমাদের কম আনন্দ দেননি। ব্রজদা বাংলার 'ওডহাউস'।

দু'একটি রচনার নমুনা আমি হাজির করছি।

প্রথমে ধরুন কলকাতার সহজলভ্য মাঠের কথা, কর্পোরেশনের গলিপথ। পটলাদের গলিক্লাবের কথা আগে বলেছি। আনন্দ-বাজার পত্রিকায় 'কালকেতু' কলকাতার এই গলিমাঠকে সাহিত্যবস্তু করেছেন।—

"কলকাতার যে-কোন এলাকাতেই এখন তারক চাটুজ্জের গলিকে পাওয়া যাবে, কেননা শীত এসে গেছে।······

শীতকালে ছাদে ছাদে যখন ধ্রুপ ধ্রুপ ক'রে, ধুনুরীরা লেপ-তোষক তৈরী করে, ঠাকুরমারা লাঠি হাতে বড়ির ডালার পাশে বসে পাহারা দেয়, তখন গলির মাথা থেকে পা পর্যন্ত হয়ে যায় বোম্বাইয়ের ব্রাবোর্ণ মাঠ কিংবা কানপুরের গ্রীনপার্ক। 'দ'-এর (গলির চেহারা) মধ্যে তৈরী হয় দু'টি ক্রিকেট টেস্টম্যাচের মাঠ। প্রত্যেকটি মাঠেই পাক- ভারত প্রথম টেস্ট-ম্যাচ। দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ সুরু হলেই গলিতেও পাক-ভারত দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ। আর অন্তর্বর্তীকালে ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ অস্টেলিয়ার টেস্টম্যাচ।

দ্বিতীয় টেস্টম্যাচ সুরু হবার আগে পর্যন্ত কলকাতার গলি আপাতত ব্রাবোর্ণ মাঠ। বোলারের পক্ষে খেলার 'পীচ খুবই খারাপ, (পৌরপিতারা নানা ঝামেলায় ব্যস্ত কি না!) । সরষের তেলে চোবানো 'সিজন' করা ব্যাট হাতে হানিফ মহম্মদ নামল। দোতলার বারান্দায় মুখে চোঙা লাগিয়ে রিলে করছে পিয়ার্সন সুরিটা (অজয় বসু, কমল ভট্টাচার্যও) । আম্পায়ার সন্তোষ গাঙ্গুলী (গলিতে দুজন আম্পায়ার থাকার নিয়ম নেই) । পাকিস্তান দল আউট হোল ষোল রানে।

এর মধ্যে দু'বার খেলা থেমেছে দেওয়ালে বল লেগে ক্যাচ লোফা হলে আউট হবে কিনা তাই নিষ্পত্তির জন্য (এক্ষেত্রে আম্পায়ারের নির্দেশ মান্য করা হয় না)।

এ ছাড়া দু'বার উইকেট খুলতে হয়েছে রিক্সাকে পথ ক'রে দেবার জন্য; দু'বার ওভার বাউণ্ডারীতে ছাদে উঠতে হয়েছে; আর মাত্র একবারই পথচারী একজনের (পাড়ার কেউ নয়) মাথাকে উইকেট ভেবে বল ছোঁড়া হয়েছে। রানিং কমেণ্টারি মারফত জানা গেল, উইকেটকীপার ঘোশী যে, ক্যাচটা ধরতে পারেনি তার কারণ বলটা আস্তাকুঁড়ের দিকে যাচ্ছিল; এবং নোংরায় পা দিলে ঘোশীকে মা আস্ত রাখবে না বলেছে। খেলা হচ্ছে সুন্দর আবহাওয়ায়, স্টেডিয়ামে তিলধারণের জায়গা নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

ভারতীয় দলের প্রথম ইনিংস অসমাপ্ত রেখেই সেদিনের খেলা শেষ হয়েছে, কারণ পঙ্কজ রায়ের একটা স্কোয়ার-কাট সোজা পাশের বাড়ির রান্নাঘরে সেঁধিয়ে যায় (ইডেন গার্ডেনেও গ্যালারির নীচে বল ঢুকে পড়ে)। বল আনতে রায়কেই যেতে হয় এবং অন্যান্য খেলোয়াড়রা নিখুঁত স্কোয়ার কাটের নমুনা সেই রান্নাঘরে দেখে আজকের মত খেলা শেষ করতে বাধ্য হয়।

টুকু, ভাঁড়ু, ঝুলন, বাবলু, বিলু, গোবিন্দ নামগুলো কিছুক্ষণের জন্যে হানিফ, দেশাই, কণ্ট্রাক্টর, মঞ্জরেকর ইত্যাদি নামের মধ্যে নড়াচড়া ক'রে এল। অল্পক্ষণের জন্য এরা নিজেদের বীর ভাবল, ছোট্ট কাঁধগুলোয় তুলে নিল দেশের সম্মানরক্ষার দায়িত্ব।

শীতে কলকাতার গলিতে রূপকথার দেশ তৈরী হয়। দিনকাল বদলেছে, কল্পলোকের রাক্ষসবধের থেকেও বাম্‌পার বলে হুক মারার কৃতিত্ব বেশী। অর্ধেক রাজত্ব বা রাজকন্যার থেকে সেঞ্চুরী লাভের কাল্পনিক ভাবনায় এরা মশগুল।

এই সব গলির ইডেনে ক্ষুদে ক্ষুদে ব্রজদারাও থাকেন। তাঁদের খানিক কথা—

রোদ্দুরে পিঠ লাগিয়ে এঁরা অম্লান বদনে বলে যান, ইডেন গার্ডেনে ব্রাডম্যান ডবল সেঞ্চুরী করতে ক'মিনিট সময় নিয়েছিল, সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে ভারতের টেস্টম্যাচ খেলায় কটা হ্যাটট্রিক হয়েছিল, চায়নাম্যান বোলিং

চীনেরা প্রথম কবে আবিষ্কার করে, এবং প্রথম যে ভারতীয় চীন থেকে তা শিখে আসে তার নাম—স্বভাবতই তিনি গলির ক্ষুদে ব্রজদা।

গলির ইডেন থেকে চলে যাওয়া যাক সত্যকার গড়ের মাঠের ইডেনে। সেখানে—আমি সংবাদপত্রের খেলার পাতার একটি শিরোনামা তুলে দিচ্ছি—

তৃতীয় ভারত-পাকিস্তান টেস্টের প্রাক্কালে অভূতপূর্ব উন্মাদনা
টিকিট নাই—লোকমুখে অন্য কথাও নাই

প্রবেশপত্রের ফলাও কালোবাজার	বিক্ষুব্ধ জনতা নিয়ন্ত্রণে পুলিশের লাঠি চালনা	দুয়ারে দুয়ারে ক্রীড়ামোদীদের ধর্ণা

এই পরিস্থিতিতে দেড়দিন ধরে লাইন-দিয়ে-থাকা সত্যকার ক্রীড়ামোদীদের বার্তা পাঠকদের কাছে উপস্থিত করলেন বিশেষ সংবাদদাতা সরস কলমে। প্রথমে তিনি হাসিয়ে তাদের ছবি তোলার চেষ্টা করলেন। 'চী-জ' শব্দ উচ্চারণ করতে যে দন্তবিকাশ করতে হয়, স্টাফ ফটোগ্রাফারের স্ন্যাপে সেইটাই বিস্তৃত হাসি। কিন্তু বৃথা চেষ্টা, রাত-জাগা মুখ শুকিয়ে আমসি—'চী-জে' সরস হোল না।

অতঃপর—

বৃহস্পতিবার, রাত সাড়ে আটটা। ইডেন বাগানের উত্তর দুয়ারের তখনই অবরোধ দশা। কেউ উবু হয়ে, কেউ চিৎ। পান-বিড়ি-সিগারেট-চায়গ্রম।

তা ছাড়া তাস। মোমের আলোয় টুয়েন্টি-নাইন:—সত্তেরো? আছি। আঠারো? আছি।

আছি ত' কিন্তু থাকাটা সোজা নাকি?

'আমি আছি দাদা কাল, মানে বুধবার সন্ধ্যে থেকে। চব্বিশ ঘণ্টা হয়ে গেল, আরো কমসে কম বারো। টিকিট পাই বা না পাই, ছবি উঠবে না?'

বললুম, আর ছবির জায়গা নেই, নাম বলুন।

'লিখে নিন,—দিলীপকুমার দাস. নিবাস ভবানীপুর'।

নামের পর নাম নোটবুকে টোকা হয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব মজুমদার বালীগঞ্জ, ইত্যাদি।

'আমি এসেছি মাইথন থেকে। দামোদরে ডুব দিয়ে এসেছি। ফিরে গিয়ে দিন সাতেক বাদে আবার ডুব দেব।'

অফিসেও ডুব?

মৌনং স্বীকৃতি লক্ষণম্।

পুলিশভ্যান। খানিকক্ষণ সব চুপ। না, এই পিকেটিং-এর পিছনে আইন অমান্যের কোনো মতলব নেই।

আপনার?

'দর্জিপাড়া'।

আপনি?

'আমার রিলিফ ডিউটি। বদলীর লোক আসবে শেষ রাত্তিরে—ফার্স্ট ট্রামে—গঙ্গাযাত্রীদের গাড়ী জানেন তো?'

আমাদের স্যার সিফট্ ডিউটি। এই যে সাজানো ইট দেখছেন—তিন দোস্তের। পালা ক'রে রাত জাগব। জাগি পোহাইব বিভাবরী।'

বললুম, আহা! আর কেউ সুরুৎ ক'রে ঢুকে পড়লে?

'ইট আছে কি করতে?'

'ওই গাছগুলোও ভাড়া হয়ে গেছে।'

আশেপাশের গাছগুলোর দিকে চেয়ে দেখছিলুম। দু'চারজন রাখাল আগেভাগেই সেখানে উঠে বসেছে। মগডালে আপাতত তাদের অলিখিত ইজারা। ন্যায্য মূল্য পেলে তারা হয়ত সড়াৎ ক'রে নেমে আসতেও রাজী।

অল্প অল্প হিম, শির শিরে শীত, জাহাজের বাঁশী। আর ধোঁয়াটে কুয়াশায় শয়ে শয়ে লোকের ধর্ণা। বছর বদলায়, একদল মানুষ যায়, অন্য দল আসে, কিন্তু এ ছবিটা বদলায় না। শত রাণ তোলার চেয়ে পৌষের শীতে শত ঘণ্টা কাটানোর রেকর্ডই বা কম কী? কিন্তু ক্রিকেটের ইতিহাসে একথা লেখা হবে না।

সব সোরগোলের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল হাফপ্যাণ্ট-পরা গোবেচারী সেই ছেলেটি—যাকে তার মেজমামা দাঁড় করিয়ে রেখে গেছে। ফিরে এসে

তাকে নগদ এক সিকি দেবে। বারো নয়া পয়সার ঝালমুড়ি চিবোতে চিবোতে তের নয়া পয়সা খরচ ক'রে শেষ ট্রামে সে বাড়ী ফিরবে।

লেখাটি বিশেষ সংবাদদাতার। কিন্তু সাহিত্যিকরা যে বিশেষ সংবাদদাতার চাকরি করেন না একথা কেউ বলতে পারবেন না। ইনি সংবাদপত্রের পক্ষ থেকে এলেও টিকিট যোগাড় করতে পেরেছিলেন কি না লেখেন নি, পারেন নি বলেই মনে হয়, যে রকম বেদনারস তাঁর কলমে ঝরেছে। সাংবাদিকরা শুনেছিলাম দ্বারভঙ্গের মহারাজা, তাঁদের সর্বত্র গতাগতি। কথাটা ঠিক শুনিনি। একজন ব্যর্থ-টিকেট-সাংবাদিক আর একজনের কথা লিখেছেন—

ঠিক সওয়া দশটায় খেলা সুরু হওয়ার পর মাঠের বাইরের অবস্থা খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় একরকমই ছিল। উদ্যানের চারিদিকে শবরীর মত ধৈর্যহীন (?) অপেক্ষা। অনেকেই পোর্টেবল রেডিও নিয়ে এসেছেন, মাঠের দিকে মুখ রেখে বেতারের ধারা বিবরণী শুনছেন।

সওয়া চারটা নাগাদ ইডেন উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এক সাংবাদিক বন্ধুকে দেখলাম। তখনও গাছের তলায় বসে রেডিও শুনছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে ?

বন্ধুবর নির্বিকার—টিকিট দেয়নি।"

একই জিনিস সম্পাদকীয়ের আশ্রয়ে কি রূপ ধরে দেখুন—

কলিকাতায় মধ্যশীতের কয়েকটি দুপুর বরাবরই ক্রিকেটসহ সেব্য। এবারও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।····· গত সপ্তাহে সীজন টিকিট না পাইয়া যে হতাশ প্রার্থীদের সারি টিকিট-ঘরের সম্মুখ হইতে টিকটিকির লেজের মত খসিয়া পড়িয়াছিল, সেইটিই দীর্ঘতর হইয়া দৈনিক টিকিটের ফোকরের সম্মুখে ফিরিয়া আসিয়াছে।·········

অভিযোগ আজ প্রায় মুখে মুখেই ফিরিতেছে—খেলাটা ক্রিকেট হইতে পারে, কিন্তু টিকিট বিক্রয়ের প্রণালীটা ঠিক ক্রিকেট নহে।

খেলা শেষ হল। একজন 'নতুন দর্শক' হাজির হলেন সংবাদ পত্রের অফিসে তাঁর বিস্ময়ের লিখিত সঞ্চয় নিয়ে। রচনাটি চমৎকার। এরকম লেখা যদি 'নতুন দর্শকেরা' ইচ্ছামত লিখতে পারেন, তাহলে বলতে হবে, বাংলা সাহিত্যে উন্নতির জেট-যুগ এসে গেছে। ধরা যাক সন্তোষকুমার ঘোষের মত ক্রিকেটরসিক কথাশিল্পী এ লেখাটির দায়িত্ব নিলেন।

রচনাটি এই প্রকার—

সম্পাদক মহাশয়,

সমীপেষু!

কলকাতার আজ জ্বর ছাড়ল। বুঝতেই পারছেন, ক্রিকেটের ধূমকে আমি জ্বর বলছি। বুধবার বিকেলে ইডেন থেকে ঘরমুখো জনস্রোত দেখেছেন? আমার চোখে কুলুকুলু ঘামের মত ঠেকছিল। শুকনো পাতা, শূন্য গ্যালারি, ভাঙা গ্লাস, ফাঁকা স্টল—সেখানে শেষ বেলায় 'গুদাম সাবাড়' সেল চলছে। তাজেব্রাণ্ডে (তাজা+উবলা+আণ্ডা—মুরগীর) দাম দু'আনা। আমি এক গণ্ডা গালে পুরে রওনা দিলুম!

আমি বাংলাদেশের ছেলে, চিনবেন না আমাকে। আমি জীবনে এই প্রথম টেস্ট খেলা দেখলুম, আমার একমাত্র এই পরিচয়টাই প্রাসঙ্গিক। 'ইডেনে শীতের দুপুর' কাটাতে গেলুম, তবে কোন গুণেনদার হাত ধরে কিন্তু নয়, জন্মান্তরের মহাপুণ্যবলে একটি সীজন টিকিট যোগাড় হয়েছিল। জীবনের প্রথম টেস্ট খেলার সুযোগ শুনেছি খেলোয়াড়দের দেহে-মনে রোমাঞ্চ জাগায়। সম্পাদক মহাশয়, প্রথম টেস্ট খেলা দেখার সুযোগ কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়।

এবারকার খেলা নিয়ে যত লেখা আপনারা ছেপেছেন, সব পড়েছি—শ্রীযুক্ত সর্বাধিকারীর, শঙ্করীবাবুর, মায় আপনাদের স্টাফ রিপোর্টারদের বিশ্বস্ত এবং বিশদ বিবরণসুদ্ধ। একমাত্র আপসোস, নতুন দর্শকের চোখ দিয়ে কেউ খেলাটা দেখেননি, বা দেখাননি।

খেলা ভাল বুঝি না, তাই আমি থেকে থেকে পড়েছি কালো ফলকের মত স্কোরবোর্ড। দেখেছি এক-একজন ব্যাটসম্যানের নাম আঁকা হতে আর মুছে যেতে। একজন আউট হন, সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য দুটি হাত

এগিয়ে আসে, নামের বোর্ড কাত হয়ে পড়ে—বিসর্জনের প্রতিমাকে গঙ্গার ঘাটে কাত হতে দেখেছেন ?—ঠিক তেমনই।

খেলা ভাল বুঝি না, আমি তাই দেখেছি জেটিতে বাঁধা জাহাজের ধোঁয়ায় পশ্চিমের আকাশ কালো হয়ে যেতে। দেখেছি টকটকে সূর্যের মত লাল বল হাতে হাতে ঘুরে, ব্যাটের ঘায়ে ঘায়ে কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। হঠাৎ হাওয়া দিল, ঝাউগাছের চূড়া ঝাপসা হয়ে এল (এই বৃষ্টি নাকি এবার আমাদের দলের দ্বাদশ খেলোয়াড়, লোকের মুখে মুখে ফেরা এই গুজবটা কি সত্যি ?)।

আমি আরও এক রকম ঝিরঝিরে বৃষ্টি দেখেছি। শেষদিনে বাঁধানো স্টেডিয়ামের সারিতে "টাক" দেখা গেছে, কিন্তু প্রথমদিন ভিড় উপচে যখন মাঠে ভেঙে পড়ল, দেখেছিলেন ? লাঠি হাতে পুলিসের খবরদারি—সে-ও ঝিরঝিরে এক পশলার মত। শিহরণটা খুব সুখকর হয়নি, লাঠির ছোঁয়া আর সোনার কাঠির জাত যে একেবারে আলাদা।………

যদি বলেন, এ খেলায় সবচেয়ে মজার জিনিস কি দেখেছি, বলব বোলিং-চেঞ্জ। না, খেলা যখন প্রায় শেষ, তখন ফজল মামুদ কোনও জন্মে বল করেনি এমন খেলোয়াড়দের দিয়ে বল করিয়ে নীরস অধ্যায়ে কিঞ্চিৎ রস সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু আমি সে কথা বলছি না। শেষদিনে কায়দা ক'রে পঁয়ত্রিশ টাকার চৌহদ্দিতে বসবার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমার সামনের সারিতে সুকেশা এবং সুবেশা ভদ্রমহিলাকে আপনি হয়ত দেখেননি। দেখলে কথাটা বুঝতেন। লাঞ্চের আগে মেরুন রঙের সাড়ি, লাঞ্চের পরে টকটকে লাল। চা পানের পরে দেখলুম আবার অন্য রঙ, খোঁপার ধরনও আলাদা। পাশের ভদ্রলোক ফিস্‌ফিস্ ক'রে আমাকে বললেন, "বোলিং-চেঞ্জের" রকমটা দেখলেন ? কভজন ঘায়েল হয়েছিল জানিনে।

মজার জিনিস আরো কত কী। সব ফিরিস্তি দিতে ত পারব না। শুনলে কি বিশ্বাস করবেন ? শনিবার ঐ গ্যালারিতে বসেই আমি "অনুরোধের আসরের" সব কটা গান শুনেছি। ট্রানজিস্টারে সৃষ্টি ক'রে করেছে এ কী বৈজ্ঞানিক, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে।

আমাদের কিন্তু খারাপ লেগেছিল রবিবার দিন বিকেলটা আর সোমবারের সকাল যখন খেলা বন্ধ ছিল, যখন ওরা মুখে না হোক, চোখে চোখে বলাবলি করছিল, আমাদের দলে শুধু এগার জন খেলোয়াড়ই নেই, অন্তত তেরো জন আছে।

ঐ সংখ্যাটাই অপয়া কিনা!

হারি জিতি নাহি লাজ, আমরা চাইছিলুম খেলা হোক, খেলা দেখি। কড়কড়ে নোট খরচ ক'রে টিকিট কিনেছি, রোজ আরো দু'চার টাকা খসছে; পান সিগারেটের দেড়া দাম। এই অপব্যয়ের জন্যে এ মাসের বাকি কটা দিন আমার বাড়িতে বরাদ্দ দুধের আধসের বাদ যাবে। অফিসে ছুটি পাইনি, পালিয়ে খেলা দেখছি, কে জানে, হয়তো চার্জশীট হবে; কিন্তু যার জন্যে এই 'চুরি"—সেই খেলাও দেখতে পাব না? আফসোস একা আমার নয়, আমার মতো আরো অনেকের। একটা আস্ত রবিবারের দাম আমাদের কাছে কম নয়।······

আমাদের ব্যাটসম্যানরা যদি আরুণি যেভাবে শুয়ে পড়ে "আল" রক্ষা করেছিল, উইকেট রক্ষাতেও সেই কসরত দেখান, বলবার কিছু নেই। তবু আর একটু সাহস দেখালে ক্ষতি কি ছিল? ওই একই উইকেটে পাকিস্তানের নৈপুণ্য তো দেখলুম! তারা রান তুলেছে আর আমরা ক্যাচ ফেলেছি। সাধে কি পাশের লোকটি বললেন, ক্যাচ আমাদের কাছে নেমতন্ন বাড়ির পাতে মিষ্টি পড়ার মতো। আর একটা নিন, আর একটা নিন বলে সাধাসাধি না করলে ধরতে চাইনে। ·· ·· ··

এত আড়ষ্টতা কেন? আসলে তবে কি আমরা একটা টেস্টম্যাচের চেয়েও বেশী কিছু খেললুম? টেস্ট—কিন্তু কিসের "টেস্ট"? বাঁধা রেখেছিলুম প্রেসটিজ, কিন্তু আর কী? এমন কোন কথা আছে নাকি যে, রাবার যার, বেরুবাড়ি তার!

তবে কি তৃতীয় 'টেস্ট' নয়, কলকাতায় আমরা "ফোর্থ ব্যাটল অব পাণিপথ" লড়তে নেমেছিলুম?

এ সব বড়-বড় কথা থাক। হালকা সুরে বরং শেষ করি।

শেষ দিনের খেলা শেষ হল। চার উইকেটে আমরা একশো সাতাশ।

পাশের বন্ধু, সে খেলা কিছু বোঝে না, বলে উঠল, দূর দূর, যত সব চার-শো-বিশ। তার কথার তাৎপর্য বুঝলুম না। সবিস্ময়ে তাকাতে সে স্কোরবোর্ডের ঘড়িটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। দেখি, কাঁটায় কাঁটায় চারটে বেজে কুড়ি মিনিট।

খেলা-ভাঙা সময়টা কোন্ সুরসিক স্থির করেছিলেন জানিনে।

পুনশ্চ: খেলা যখন চলছিল, তখন মাঝে মাঝে 'মাইকের' ঘোষণা শুনেছিলেন? একটি নমুনা:

"এটেনশন, টিকেট নাম্বার অমুক ইজ্ লস্ট। ইফ এনিবডি ফাউণ্ড, প্লীজ রিটার্ণ অ্যাট সি-এ-বি অফিস।" "মিস্টার অমুক চন্দ্র অমুক, ইওর ফাদার ইজ সিরিয়াস ; প্লীজ গো হোম য়্যাট ওয়ান্স"।

ক্রিকেট-মাঠের পারিপার্শ্বিকের সাহিত্যের নমুনাই আমি এতক্ষণ ধরে দিলাম। মাঠের ভিতরকার সাহিত্য পাঠক দাবি করতে পারেন। সে সাহিত্য-সৃষ্টির মূল বাধা কোথায় তা জানিয়েছি আগেই। তবু খেলা যখন হচ্ছে, তাকে ধরতেও চাইছে বাংলা ভাষা, যতখানি সম্ভব। এবার সে দিকে চোখ ফেরানো যায়।

যুগান্তর পত্রিকায় বিখ্যাত তরুণ সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী 'দর্শক' নামের অন্তরালে থেকে পাঁচ দিনের টেস্টের বিবরণ লিখেছেন। আমি তাঁর লেখা থেকে এ ব্যাপারে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির দৃষ্টান্ত দিতে পারি।

ইডেন গার্ডেনে এ বছরের সজীব পিচের চরিত্র—

মাঠ বোলারের অনুকূল এবং সতেজ। কানপুর কিংবা বোম্বাইয়ের মাটির মত এ মাটি নিস্তেজ নয়। এ তো বাংলাদেশেরই মাটি। [প্রথম দিন]

আবহাওয়া ইত্যাদি—

মাঠে শিশির ছিল না, আকাশে হাওয়ার টান ছিল না, এবং সুরেন্দ্রনাথের সুইং-এ কামড় ছিল না। [দ্বিতীয় দিন]

কয়েকজন খেলোয়াড়—

জয়সীমার ব্যাট বীরের তরবারির মত ঝলক দিচ্ছিল। সেই ব্যাটে বহু প্রত্যাশিত ও বহু বঞ্চিত আক্রমণ ছিল। এবং সেই ব্যাটে জয়সীমাসুলভ অতিসতর্কতার কার্পণ্য ছিল না।.......

পরবর্তী ২৪ মিনিটে রানহীন যে শুষ্কতা এসেছিল, জয়সীমার প্রথম বাউণ্ডারীতে সেই অচলাবস্থা চূর্ণ হল। [দ্বিতীয় দিন]

মামুদ হোসেন হাইকোর্টের দিক থেকে, তাঁর দক্ষিণ বাহুকে উদ্যত ক'রে রণবিক্রমে ছুটে আসছেন এবং এদিকে প্যাভিলিয়নের প্রান্ত থেকে ব্যূঢ়স্কন্ধ

ফজল মামুদ—ক্রিকেট-জীবনের শেষ দুর্লভ গৌরবের প্রত্যাশায় যাঁর সমস্ত শক্তি বলের মধ্যে সঞ্চারিত হচ্ছে। মাঝখানে বোরদে ও দেশাই।

[চতুর্থ দিন]

দেশাই ইতিমধ্যে দুইটি চারের মার মেরে বোঝাতে চাইলেন যে তিনি টেকসই ও আক্রমণমুখী খেলা খেলবেন। [ঐ]

দীর্ঘশ্বাস ছিল বেগের পতনে। তাঁর অন্ধ ব্যাট হঠাৎ শূন্যে উঠে শেষ আশা ছুঁড়ে দিয়ে গেল সন্ধ্যার অন্ধকার কুয়াশায়। কেউ ভাবেনি, যে ব্যাটসম্যান সবচেয়ে প্রখর করতালি নিয়ে নামল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে ইডেন গার্ডেনের আবহাওয়ায় রৌদ্রের ঝলকানি দিল তিনটি অনিন্দ্য বাউণ্ডারীতে, যাঁর পরিচ্ছন্ন খেলা দেখার জন্য সমস্ত স্টেডিয়াম উৎকণ্ঠ,—সেই বেগ দিনের শেষের শেষ বলে এমন একটি অন্ধ ব্যাট শূন্যে ছুঁড়বে!

[দ্বিতীয় দিন]

ক্রিকেটের তারকারা কখনো কখনো চলচ্চিত্রের তারকাকেও পরাস্ত করেছেন তরুণীর হৃদয়ানুরাগ লাভের প্রতিযোগিতায়। বেগ তার মধ্যে অন্যতম। কিন্তু ক্রিকেট-আকাশের সেই নবাগত তারকা আজ মেঘে ঢাকা পড়েছে। [পঞ্চম দিন]

নেতিমূলক শ্লথ ও উদ্দেশ্যহীন খেলার চরিত্র—

প্রথমে ১২ রানে ইমতিয়াজের পতন দেখবার পর এবং মঞ্জরেকরের হাত থেকে একটি মূল্যবান ক্যাচ খসে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একবার উত্তেজনার ঝাঁকুনি লেগেছিল বটে। কিন্তু ক্যাচ ফস্কে হানিফ বাঁচলেন, খেলা মৃতপ্রায় হল, স্টেডিয়াম থেকে আর কোনো সাড়া উঠল না। ক্রিকেট সম্বন্ধে একটি মনোরম বাংলা বই বেরিয়েছে—"ইডেনে শীতের দুপুর"। কিন্তু ভাগ্য আমাদের বঞ্চনা করবেন স্থির করেই রেখেছিলেন। ইডেনে শীত ছিল না, দুপুরের রৌদ্রও ছিল না। ক্রিকেট ছিল কিনা, সেও ছায়াচ্ছন্ন মাঠের দিকে তাকিয়ে সন্দেহ হতে লাগল।······অদূরবর্তী একটি মহিলা মাঠের দিকে না তাকিয়ে ভিন্নতর বিষয়ে মনোনিবেশ করেছিলেন। আমার পাশের এক বন্ধু তাঁর অন্যমনস্কতার প্রতি বিদ্রূপ করেই তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—Cricket is here। আমি মনে মনে বললুম,

Cricket is no where।……দুই মল্ল যদি পরস্পরকে বাহুবদ্ধ ক'রে বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, কারও যদি পতন না ঘটে, তাহলে যেমন সেই আঁকড়া-আঁকড়িতে মন উঠে না, ক্লান্তি আসে, তেমনি কিছুক্ষণ পরে মাঠেও ক্লান্তি নামল, এবং আকাশের মেঘছায়ার মত আমাদের মনেও ক্লান্তি এল। [প্রথম দিন]

প্রকৃতির ভূমিকা—

প্রথম দিন থেকে আমরা ডিসিসান চাইছিলাম। আমরা চাইছিলাম এই পরিকল্পিত 'ডেডলক' ভঙ্গ হোক। সেই ডিসিসান যখন খেলোয়াড়দের হাত দিয়ে এল না—ক্রিকেটের বহুবাঞ্ছিত আকস্মিকতা যখন তাঁরা দেবেন না বলেই বদ্ধপরিকর, আকস্মিকতা আকাশ থেকেই নামুক। আমরা বলছিলাম, লক্ষ্মীরে হারাই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই। আসুক সেই অলক্ষ্মী ইডেন গার্ডেনে এবং সেই নিক স্কোরবোর্ডের ভার। [তৃতীয় দিন]

কোথায় 'ইডেনে শীতের দুপুর'? আলোর বিরুদ্ধে, আকাশের বিরুদ্ধে, বৃষ্টির বিরুদ্ধে মঞ্জরেকার তাঁর ক্লিষ্ট সংগ্রাম পরিত্যাগ ক'রে বিদায় নিতে চাইছিলেন না। [ঐ]

ইডেন গার্ডেনকে দেখছি নতুন চেহারায় এবং দাঁড়িয়েছি বাস্তবের মুখোমুখি। হাতে আছে এক ভাঁড় ধূমায়িত চা, মাথায় অকাল বর্ষার মেদুর আকাশ এবং সম্মুখে ভাগ্যের সঙ্গে মধুর ছলনার খেলা। [ঐ]

বিভিন্ন প্রসঙ্গের কয়েকটি লাইন—

পাকিস্তান নামলো দুটো একচল্লিশ মিনিটে। তাদের সম্মুখে জয়লাভের আশা তখন ঈদের দুর্লভ ক্ষীণ চাঁদের মত পশ্চিম গগনে দেখা দিতে চাইছে।
[চতুর্থ দিন]

দেশাই এবং সুরেন্দ্রনাথের হাত দুই ব্যাটসম্যানের টুঁটি টিপে ধরতে চাইছে, ফিল্ডিং ছোট বৃত্তে টেনে আনা হয়েছে ওৎ-পাতা শিকারীর মতো। অন্যদিকে পাকিস্তান চাইছে অপরাহ্নের শেষ বেলায় এই ব্যূহ ভেদ ক'রে দুরন্ত বেগে রানের সংখ্যা নিয়ে দৌড়তে। [ঐ]

একি ফুটবলের মাঠ নাকি, পৌনে এক ঘণ্টায় হাতাহাতি মারপিট এবং জয়পরাজয় পকেটে ভরে ফিরবেন ? [দ্বিতীয় দিন]

ক্রিকেট সেখানে সত্যই খেলা হয়ে উঠেছিল—

তারপর পড়ন্ত রোদ এবং স্কোরবোর্ডের মাথায় বসানো ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে দ্রুত তালে খেলা দৌড়তে আরম্ভ করল। ১৮৫-তে বাকি, ১৮৬-তে নসিমুল গনি, এবং ২০১ রানে প্রথম দিনের উপর দ্রুত যবনিকাপাত। স্কোরবোর্ড মুহূর্তে দ্রুত এক দৌড় দিয়ে আমাদের উত্তেজনার আস্বাদ মিটিয়েছিল। প্রথম উইকেট ১২-তে, দ্বিতীয় উইকেট ৮৪-তে, তৃতীয় উইকেট ১৩৪-এ, চতুর্থ উইকেট ১৬৪-তে, পঞ্চম উইকেট ১৮৫-তে, এবং ষষ্ঠ উইকেট ১৮৬-তে।
[প্রথম দিন]

সেই এক ঘণ্টা আমরা মৃত্যুর মুখোমুখি ; সেই এক ঘণ্টা নিশ্বাস স্তব্ধ, মন মৌন মন্ত্র জপ করছে। তথাপি যখন সেই শঙ্কিত মুহূর্তে বোর্দে এবং মঞ্জরেকার অভয়ের আশ্বাস নিয়ে দাঁড়ালেন, ফজল মামুদ বিজয়ের নিকটবর্তী তাঁর আশা হস্তচ্যুত হচ্ছে দেখে ক্রমে ক্ষিপ্ত থেকে ক্ষিপ্ততর হতে লাগলেন, যখন পাকিস্তানের বোলিং তার শেষ বিষাক্ত ছোবল তুলতে লাগল স্টাম্পের অদূরে, এবং যখন ভয়ঙ্করতম আক্রমণের মুখে সহাস্যে এবং স্থির প্রতিজ্ঞায় বোর্দে ও মঞ্জরেকার প্রতিবার ফজল মামুদের আক্রোশকে পিচের নরম ধুলোয় উড়িয়ে দিলেন, তখন—এই পাঁচ দিনের খেলায় মাত্র তখনই—একবার মাত্র চকিতে ক্রিকেটের নাটক ইডেন গার্ডেনকে উদ্ভাসিত করেছিলো।
[পঞ্চম দিন]

এক বছরের পক্ষে যথেষ্ট সুন্দর রচনার সঞ্চয়। বাংলায় যাঁরা ক্রিকেটের ভালো রচনা চাইছেন তাঁরা এতেও যদি খুশি না হন তাহলে তাঁরা স্বভাবে অতৃপ্ত। তাঁদের অতৃপ্তি উৎকৃষ্টতর রচনার সহায়ক হোক, এইমাত্র প্রার্থনা করতে পারি। আমার বক্তব্য, ভাষাটা অনেকটা তৈরী হয়ে গেছে, লেখকরা সাহিত্যের ভাষায় খেলার কথা লিখতে সঙ্কোচ বোধ করছেন না ; এখন প্রয়োজন কিছু লেখার সংবস্তু অর্থাৎ কিছু ভাল খেলা। শ্রীযুক্ত রাখাল

ভট্টাচার্য বলতে চেয়েছেন, ভারতীয় ক্রিকেটের যা অবস্থা, তাতে খেলা দেখার চেয়ে বাংলায় তার বর্ণনাপাঠে বেশী আনন্দ পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্য বাংলার ক্রিকেট-লেখা সম্বন্ধে চরম প্রশংসা করেছেন।

ইডেন গার্ডেনে

ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্ট

৩০শে, ৩১শে ডিসেম্বর (১৯৬০), ১লা, ৩রা, ও ৪ঠা জানুয়ারী (১৯৬১)

॥ ভারতের নবনায়ক ॥

ইডেন উদ্যানে তৃতীয় টেস্টের প্রাক্কালে ভারতের নবনায়ক নরী কন্ট্রাক্টার সম্বন্ধে কিছু কথা লিখেছিলুম। প্রথমেই সেই কথাগুলো উপস্থিত করা যায়।—

নরী কন্ট্রাক্টার ভারতের তরুণতম অধিনায়করূপে ভারতের প্রাচীনতম ক্রিকেটমাঠ ইডেন গার্ডেনে পদার্পণ করতে যাচ্ছেন, তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তাঁর নিজেরই একটি কীর্তির কথা। চার বছর আগে তিনি এই মাঠে বেডসার-ট্রুম্যান-মস-ট্রাইব-ডুল্যাণ্ডের বলের বিরুদ্ধে ১৫৭ রান করেছিলেন। এম-জে-ও-সি দলের বিরুদ্ধে ডাঃ বি সি রায় একাদশের পক্ষে তিনি খেলেছিলেন। খেলাটি ছুটির হাওয়ায় ভরা ছিল। কিন্তু বিপক্ষ বোলারের নামগুলি বড় মারাত্মক। স্থানীয় দলের জয়ের পক্ষে ব্যাটিং-এ কন্ট্রাক্টারের দানের পরিমাণ ছিল সর্বোচ্চ।

সেদিনকার বাইশ বছরের কন্ট্রাক্টার আজ ২৬ বছরে অনেক বড় খেলোয়াড়। ফজল-ফারুক-গণি-হাসান-এর বোলিংকে ছুটির মেজাজে ভেঙে দেওয়া তাঁর পক্ষে কিছু অসম্ভব নয়। কন্ট্রাক্টার যেন এই কথাটি মনে রাখেন।

কন্ট্রাক্টারকে স্মরণ করাবো আরো একটি তথ্য। ইডেন থেকে লর্ডসে চলে যাওয়া যাক। ১৯৫৯ সালের ১৮ই জুন সকালবেলায় লর্ডসে ভারত-ইংলণ্ড দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে স্ট্যাথামের হাতের দু'টি বল অজ্ঞাত প্রেরণায় ঐতিহাসিক হয়ে উঠেছিল। একটি বল নিখুঁত লেংথে পড়ে হঠাৎ লাফিয়ে উঠে পঙ্কজ রায়ের কানের পাশ

দিয়ে উড়তে শুরু করল, সদা-তৎপর ইভান্স লাফ দিয়ে ডানা-মেলে-দেওয়া বলটিকে থামালেন। দ্বিতীয় বলটিও লাফাতে চাইছিল। কণ্ট্রাক্টার থামালেন পাঁজর দিয়ে। পাঁজর জখম হল ভয়ানকভাবে। জখম পাঁজরে চার ঘণ্টার বেশী সময় মাঠে দাঁড়িয়ে থেকে ট্রুম্যান-স্ট্যাথাম-মস্-এর বিরুদ্ধে কণ্ট্রাক্টার করলেন ৮১, দলের মোট রান যেখানে ১৬৮।

সাহসী এবং সংগ্রামী খেলোয়াড়। ভারতীয় ক্রিকেটে কণ্ট্রাক্টার অপরিহার্য হয়ে গেলেন। স্থির হয়ে গেল, নতুন বলের মুখোমুখি তাঁকেই দাঁড়াতে হবে অতঃপর। ১৯৬০ সালে আরো একটি জিনিস স্থির হয়েছে। কণ্ট্রাক্টার কেবল ব্যাটিং-এ এক নম্বর খেলোয়াড় নন, মর্যাদাতেও পয়লা নম্বর। কণ্ট্রাক্টার অধিনায়ক। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। নির্বাচকমণ্ডলী অধিনায়ক নির্বাচনের টসে এবার যে মুদ্রাটি হাতে নিয়েছেন, তার দু'দিকেই কণ্ট্রাক্টারের মুখ আঁকা। দু'দিকেই হেড।

অধিনায়করূপে বিশাল সাফল্যলাভ করতে হলে যে দু'টি জিনিসের দরকার—সহজাত প্রতিভা এবং বিপুল অভিজ্ঞতা—কণ্ট্রাক্টারের তা নেই। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ ও সতর্ক, নিষ্ঠাবান ও নিঃস্বার্থ। তাঁর রক্ষণশীল ক্রীড়ারীতি কিছু পরিমাণে পরিচালনরীতিতে প্রতিফলিত হতে পারে, হয়েছেও,—কণ্ট্রাক্টার প্রথম দু' টেস্টের অধিনায়করূপে ইতিমধ্যে বড় কোনো সাহস দেখাননি। কিন্তু বড় কোনো ভুলও তিনি করেননি। তাই যথেষ্ট। অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় ক'রে নেবেন। জলে না নেমে কেউ সাঁতার শেখেনি। অধিনায়ক না হয়ে কেউ অধিনায়ক হয়নি। কণ্ট্রাক্টার একটি নিপুণ হিসেবী যন্ত্র। অ-প্রতিভ ভারতীয় দলের পক্ষে কঠিন ও কিছু পরিমাণে কল্পনাশূন্য নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে।

তাছাড়া কণ্ট্রাক্টার অধিনায়ক-যোগ্যতার অন্য দাবি পূরণ করেছেন। অধিনায়কদের দলভুক্তি সম্বন্ধে যেন প্রশ্ন না ওঠে। অধিনায়ক ড্রেসিংরুম থেকে মাথা উঁচিয়ে মাঠে নামবেন; নির্বাচকদের

মিটিংরুম থেকে নিয়োগপত্র করতলগত ক'রে চতুরভাবে মাঠে প্রবেশ করা শোভন নয়।

কন্ট্রাক্টার-এর যোগ্যতা আজ প্রশ্নাতীত। প্রথম জুটির ভারতীয় প্রধানদের সারিতে ইতিমধ্যে তিনি উঠে পড়েছেন। গত মরশুমে ইডেন গার্ডেনে শেষ টেস্টে জয় যখন অস্ট্রেলিয়ার মুঠোর মধ্যে, তখন ভারত দ্বিতীয় ইংনিস শুরু করতে নামছে,—অগ্রিম অভিনন্দন প্রত্যাখ্যান ক'রে অস্ট্রেলিয়ান ম্যানেজার লক্সটন বললেন, যতক্ষণ কন্ট্রাক্টার ক্রীজে, ততক্ষণ কিছু বলা যায় না। কন্ট্রাক্টারের ৪১-৩৪, ২৪-৭৪, ১০৮-৪৩, ৭-৪১ স্কোরগুলো তীক্ষ্ণভাবে তাঁর মনে খোঁচা দিচ্ছিল।

আমাকে এই মুহূর্তে পৃথিবী-একাদশের ওপেনিং জুটি বাছতে দিলে ভারতীয় উপমহাদেশের দুই ছোকরার নাম আমি করব,– ডান হাতের হানিফ ও বাম হাতের কন্ট্রাক্টারকে দিয়ে পৃথিবী-একাদশের সব্যসাচী ব্যাটিং শুরু হবে।

হানিফ ও কন্ট্রাক্টারের নির্বাচন অবশ্য পৃথিবীতে ওপেনিং ব্যাটস-ম্যানের ক্ষেত্রে ঘাটতির রূপ দেখিয়ে দেয়। হাটন ও মোরিসের জায়গায় যাচ্ছেন হানিফ ও কন্ট্রাক্টার। হাটনে ও হানিফে আছে টেস্ট ক্রিকেটে তিনশো রানের কাড়াকাড়ি। মোরিসে ও কন্ট্রাক্টারের ঐক্য হল, দু'জনের বাম হাতে ও আরো একটি ব্যাপারে; প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রথম অবতরণে দু' ইনিংসে দু'টি সেঞ্চুরী এই দু'জনই করেছেন। তবু সকলে জানেন, হবসের স্থানপূরণে এসেছিলেন যে হাটন তাঁর সঙ্গে হানিফের তুলনার কথা উঠতে পারে না, এবং যে মোরিসকে ব্রাডম্যান ফ্রাঙ্ক উলীর চেয়ে বড় ল্যাটা ব্যাটসম্যান বলেছেন (অতি বিতর্কিত মন্তব্য), সেই মোরিসের সঙ্গে কন্ট্রাক্টারের বিপুল পার্থক্য!

তবু পৃথিবী-একাদশে যে এই দু'জনের নাম তুলতে পেরেছি, সেই মস্ত গৌরব।

এবং আমাদের আরো একটি ভরসা—হানিফ ও কন্ট্রাক্টার

আরো অনেকদিন ক্রিকেট খেলবেন। শীতের দিবা দ্বিপ্রহরে আসুন আমরা স্বপ্ন দেখি, হানিফ এগিয়ে গেছেন হাটনের থেকে এবং কণ্ট্রাক্টারের রেকর্ড দেখে ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন মোরিস।

ইডেন গার্ডেনে নামতে যাচ্ছেন অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টার। তাঁর কাছে আমাদের সকলের একটি অনুরোধ আছে, একটি বিশেষ অনুরোধ—বোম্বাইয়ে, কানপুরে কণ্ট্রাক্টার ড্র-এর কণ্ট্রাক্ট নিয়েছিলেন, এবার নিন জয়ের। অন্তত জিততে চান তা ফুটিয়ে তুলুন ভাবে ভঙ্গিতে। কলকাতার মানুষ আবেগপ্রবণ, উত্তেজনালোভী।

ভারতের তরুণতম অধিনায়ককে অভ্যর্থনা করছি ইডেন গার্ডেনে। তিনি একদিন ভারতের প্রবীণতম অধিনায়করূপে এই ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন থেকেই বিদায় নেবেন এই সম্ভাবনাকে নমস্কার জানাচ্ছি।

॥ ক্রিকেট-ক্রিকেট খেলা ॥

ইডেন গার্ডেনে ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনটিকে নিন্দা না করতে পারতুম, যদি-না দুটো ছেচল্লিশ মিনিটের সময়ে মাইকে দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-আকর্ষণ একটি সংবাদ ঘোষিত হত। শোনা গেল---অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজ টেস্টে প্রথমদিনে অস্ট্রেলিয়া আউট হয়ে গেছে ৩৪৮ রানে এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গেছে এক রানে একটি উইকেট। নতুন ক'রে মন খারাপ হল, কারণ স্বভাবত চোখ উঠে পড়ল স্কোরবোর্ডের উপরে। সেখানে লেখা আছে ২২৬ মিনিটের পাকিস্তানী সঞ্চয় ১৫৪ রান।

আপনারা ভাবছেন, আমি ভারত-পাকিস্তান টেস্টকে ছোট করছি। আমি সেইসব বিদেশী শত্রুদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি, যাঁরা দু'থাকের টেস্টের ব্যবস্থা করতে বলেছেন। মোটে নয়। বিশ্বাস করুন, আজকের খেলা তুলনায় ভালই হয়েছে। পাকিস্তান একদিনে ২০১ রান করেছে এবং ভারত ঐ রানের মধ্যে তাদের ৬টি উইকেট ফেলে দিয়েছে। প্রথম দিনের হিসেব বজায় থাকলে পাঁচ দিনের শেষে দু'দলের অন্তত

সাড়ে তিনটে ইনিংস শেষ হবার সম্ভাবনা। মেঘে ঢাকা সন্ধ্যায় সে সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বিশ্বাস করুন, টেস্টে অন্যায়ভাবে স্থান-বঞ্চিত সুরেন্দ্রনাথ আজকে অসাধারণ বল করেছেন, এবং পাকিস্তানের অক্সোনিয়ান বার্কি মারের উচ্চারণে বৈদগ্ধ্য দেখিয়েছেন। সঈদের ব্যাটিং-এর মধ্যে স্থিরবুদ্ধি-আক্রমণমুখিতার পরিচয় পাওয়া গেছে এবং নাদকার্নী সুরেন্দ্রনাথের বলে যে ক্যাচ ধরে সঈদকে আউট করেছেন এবং তামানের হাতের খসে-পড়া ক্যাচ যেভাবে উমরিগড় ছিনিয়ে নিয়েছেন শূন্যে, তা যথেষ্ট দর্শনীয় ছিল। তবু বলতে হবে, অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তুলনায় নিজেদের বিশেষ দীন মনে হয়েছে এবং একই সময়ে দু'টি টেস্ট শুরু করায় পাক-ভারতের প্রতি ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার কোনো প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়নি।

ইডেন গার্ডেনে ৩০শে ডিসেম্বর সকালে সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্যালারির স্তরে স্তরে বিকশিত দেখে কেমন একটা গলা-বুজে-আসা আবেগ বোধ করলুম। আমাদের ভারতবর্ষ এমনই 'আনন্দবাজার' হোক।

ক্রিকেটের মজার কাহিনীগুলো বাদ দিয়ে ক্রিকেট ক্রিকেট নয়—যে কাহিনীগুলো প্রতিদিন রচিত হচ্ছে। আমার ব্যবসায়ী দাদার অবাঙালী সমব্যবসায়ী বন্ধুটির করুণ কথাগুলি হয়ত আপনারা এখনও শোনেননি। আমার দাদাকে উক্ত সমব্যবসায়ী দুঃখার্তভাবে বলেছিলেন,—'সোন্তোস্ বাবু, লাইনমে ছটো আদমীকো ভেজা থা', এক মুহূর্ত থেমে, 'দো—হাসপাতাল। বাকী চার আদমীকো—মারকে নিকাল দিয়া।' এবং শেষকালে ভেঙে পড়ে,—'একো টিকিট নেহি মিলা।' আমার দাদা বললেন,— শোভানাল্লা!!

আর একটি মহিলার কথা শুনেছি। তিনি টিকেট পেয়ে খুব খুশী। কারণ অনেকদিন ধরে কাজটা আর হয়ে উঠছে না। এবার হবে। স্বামীকে ও বাচ্চা ছেলেটাকে নিয়ে তিনি মাঠে যাবেন এবং পাঁচদিনে দু'টো সোয়েটার হয়েও যাবে। মাপ নিয়ে কোনো গণ্ডগোল হতে পারবে না, কারণ তিনি স্বামী-পুত্রকে অবিরত মেপে মেপেই বুনবেন।

আমার সহযাত্রী ভদ্রলোকটির কথায় আসা যেতে পারে। ভদ্রলোক স্থূলকায় বিচক্ষণ কেরানী। তাঁর ছেলে ক্রিকেট খেলে। মাইডিয়ার বাবাকে কমপ্লিমেণ্টারি টিকেট দিয়েছে। ভদ্রলোকের এক হাতে পেটফোলা বিরাট ব্যাগ, অন্যহাতে কুঁজোর আকারে ফ্যামিলি ওয়াটার-বটল। আমি সবিস্ময়ে বললুম, মশাই, খাবারের ঐ আকারের থলি না হয় আপনার চেহারা দেখে বুঝতে পারি। আপনি খেতে ভালবাসেন। কিন্তু তা বলে অত বড় ওয়াটারবটল? ভদ্রলোক বললেন, বলেন কেন, মেয়রের জন্য এই ঝামেলা। গিন্নী শুনেছেন, টিকেট না পেয়ে কাউন্সিলাররা জল বন্ধ ক'রে দেবেন বলেছেন। তাইতে—

বুঝতে পেরেছি,—অট্টহাস্য ক'রে ভদ্রলোককে থামালুম।

আরো কত জীবন্ত গল্প আছে। যেমন, এই একান্ত সংলাপটি—

ছোট মেয়ে—মা, লেগ গ্লান্স কাকে বলে?

মা—তোমার সে কথা জেনে কাজ নেই।

মেয়ে—আর লেগ পুল?

মা—থাম, বড় হয়ে জানবে।

কিংবা আপনারা যদি আমার বেশরম বন্ধুটিকে ক্ষমা করেন, তিনি মাঠের রকম-সকম দেখে বিহ্বল হয়ে আমার কানে কানে লিণ্ডওয়ালের লেখা সে কাহিনীটি বলেছিলেন। কেপটাউনে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে টেস্টের সময়। সন্ধ্যেয় ককটেল পার্টি। অটো-গ্রাফারে পার্টি ভর্তি। তার মধ্যে এক অটোগ্রাফ-প্রার্থিনী এসেছেন বিশেষ সেজে অর্থাৎ বিশেষ না-সেজে। তিনি অটোগ্রাফ চান অস্ট্রেলিয়ান্ খেলোয়াড়দের। একটা কলম তিনি যোগাড় করতে পেরেছেন। কিন্তু কাগজ বা খাতা জোটেনি। তাহলে কি অটোগ্রাফ মিলবে না? বদান্য ও ব্যাকুল জনৈক অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার সহসা-প্রতিভায় ঝলসে উঠলেন। মেয়েটির মুক্ত কাঁধকে বেছে নিলেন দস্তখতের স্থানরূপে। মুহূর্তের মধ্যে দেড় ডজন সই।

কিংবা ধরুন মিস্ত্রিরদাকে। এক মাথার তিন বাচ্ছার মাঝে

গ্যালারিতে বসে। প্রশ্ন হল—এরা? চকিতে উত্তর—আমার হ্যাটট্রিক।

আমার পাঠক নিশ্চয় ব্যস্ত হয়েছেন খেলার কথা জানতে। তা যদি চান, গোড়াতেই বলব, সুরেন্দ্রনাথ। সুরেন্দ্রনাথই মূল কথা। সামরিক ও পরিশ্রমী সুরেন্দ্রনাথ। আক্রমণী সুরেন্দ্রনাথ। নিখুঁত লেংথে, পরিমিত সুইঙ্গে যিনি অবিরত আঘাত ক'রে গেছেন। উইকেট পেয়েছেন তিনটি, দমিয়ে রেখেছেন সেরা ব্যাটসম্যানদের। তাঁর অপর প্রান্তে ছিলেন দেশাই। দেশাই আজকে কিছু বেশী ব্যস্ত, উৎকণ্ঠিত, কিছু বেশী নেতিমূলক, এবং উইকেট ও মস্তকের প্রতি সম-আক্রমণশীল, বাম্‌পার-বজ্রক্ষেপে ইন্দ্রতুল্য। লাঞ্চের পরে পুরনো প্রাণবন্ত দেশাইকে পাওয়া গেলেও লাঞ্চের আগে বিশেষ এলো-মেলো। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ অধিনায়কের নির্দেশে, দলের প্রয়োজনে কোনো এক অফুরন্ত উৎস থেকে শক্তি এবং 'ন্যায্য বিরক্তি' সঞ্চয় ক'রে ভারতীয় বোলিংকে টেস্ট পর্যায়ে তুলে দিয়ে গেছেন।

বোলিং-এর ব্যাপারে আজ কণ্ট্রাক্টার তাঁর দ্রুত বোলারদের উপরই বেশী নির্ভর করেছেন। ৮৪ ওভারের মধ্যে ৫৮ ওভার দিয়েছেন সুরেন্দ্রনাথ ও দেশাই। উমরিগড়কে কিছু সময়ের জন্য ডাকা হয়েছিল, এবং বোরদেকে। আরো বেশী কিছু সময়ের জন্য গুপ্তেকে। নিতান্ত নিস্পৃহভাবে গুপ্তে বল করেছেন। ফ্লাইট দিতে পারেন নি ভালভাবে। যখন ফ্লাইট দিতে চেয়েছেন, তখনই লেংথ নষ্ট হয়েছে। গুপ্তের গুপ্ত বলের কাহিনী আজকের হিসেবে শুধুই কাহিনী। লিণ্ডওয়ালের নামে একদা এক ক্রিকেটীয় ব্যাধির সৃষ্টি হয়েছিল—লিণ্ডওয়ালাইটিস, বেডসারের নামে বেডসোর। গুপ্তেও একদা রোগ-বিশেষ ছিলেন। সেই গুপ্তে এখন ব্যাটসম্যানের বন্ধু, রানের গৌরীসেন। ভারতের ফিল্ডিং?—

"সবচেয়ে নৈরাশ্যকর হচ্ছে ভারতের ফিল্ডিং—যার মধ্যে তাগিদের লেশমাত্র ছিল না। কভার পয়েণ্টে গাইকোয়াড়ের কিছু যোগ্যতা ছিল,

সুরেন্দ্রনাথ একবার দর্শনীয়ভাবে বল থামিয়েছিলেন এবং নাদকার্নী একটি চমৎকার ক্যাচ ধরেছিলেন। এ ছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড়দের রকম দেখে মনে হল, এগারো জনের একটা দল দাঁড় করাবার কেতা বজায় রাখবার জন্যই তারা মাঠে খাড়া আছে।"

১৯৫৯ সালে ইংলণ্ড-সফরকারী ভারতদল সম্বন্ধে ইংরেজ সমালোচকের ঐ বক্তব্য। গাইকোয়াড়ের নাম বাদ দিলে কথাগুলো আজকের ভারতীয় ফিল্ডিং সম্বন্ধে কি নির্মমভাবে সত্য! নাদকার্নীর চমকপ্রদ ক্যাচটির কথা পর্যন্ত ইংরেজ লেখক পূর্বেই লিখে গেছেন।

উইকেটকীপাররূপে তামানে বলের গতিবিধি সম্বন্ধে কোনো পূর্ব ধারণা রাখতে না পারায় মাঠে ডন-বৈঠক দিয়ে বল থামিয়েছেন অবিরাম। এবং কত অসমর্থকে টেস্ট-টুপি পরানো হতে পারে তার দৃষ্টান্তরূপে দাঁড়িয়েছিলেন মঞ্জরেকার। এই প্রবীণ স্থূলকায় ব্যক্তিটি মাঠে অসহ্য। অমার্জনীয় শৈথিল্যবশে ইনি ৫ রানের মাথায় হানিফের ক্যাচ ধরার কোনো চেষ্টা করেননি, এবং একবার শ্লিপে বল ধরতে গিয়ে যখন শ্লিপ খেয়েছেন, তখন তাঁকে হাতে ধরে তুলতে হয়েছে। ব্যাপারটায় বোধহয় মঞ্জরেকারের রসিকতা ছিল, যা দৃশ্যের আপাতকটুতায় মোটেই উপভোগ্য হয়নি। মঞ্জরেকার ক্যাচ না ধরে এবং বাউণ্ডারী না আটকে যত রান দিয়েছেন, ব্যাট ধরে কিভাবে তার ক্ষতিপূরণ করেন তা দেখতে অনেক উৎসুক। অন্যান্যের মধ্যে বেগ আশানুরূপ লঘুপদ হননি। কণ্ট্রাক্টার সময়মত বোলিংচেঞ্জ করলেও নিরুপায়ভাবে দলের ক্ষতি করেছেন টসে হেরে। পরপর তিনটি টেস্টে টসে হারলেন। এ বিষয়ে অমরনাথের রেকর্ডের অভিমুখীন তিনি, এবং পাকিস্তান এই সফরে এ-পর্যন্ত সব কয়টি টসে জিতে নিশ্চয় কোনো নতুন রেকর্ডের প্রান্তবর্তী।

পাকিস্তানের ব্যাটিং-এর মধ্যে আজ গৌরবজনক কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি। হানিফ শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারীর কঠোর সমালোচনা সত্য প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের বলে হানিফ সারাক্ষণ অস্বস্তিবোধ করেছেন এবং যদি কখনো দু'একটা ভালো মার

মেরে থাকেন, এত সময়ের ব্যবধানে তা ঘটেছে যা মনে রাখা দুষ্কর। কোথায় 'ক্ষুদে ওস্তাদ', কোথায় 'প্রকৃতিকে ফাঁকি দেওয়া খেলোয়াড়'?— বার বার মাঠে শোনা গেছে সেই প্রশ্ন।' মনে হয় হানিফের এখন 'ক্ষীণ' ক্ষণ যাচ্ছে, যার সম্মুখীন প্রত্যেক বড় ব্যাটসম্যানকে হতে হয়। একমাত্র বাকির মধ্যে জৌলুস দেখা গিয়েছিল, যে কথা আগেই বলেছি, এবং ভয়ের কারণরূপে প্রতীয়মান হয়ে ছিলেন সঈদ। সঈদ হাতের ঘড়ি খুলে আম্পায়ারের কাছে জমা দিয়েছিলেন, নিশ্চয় বিশেষ কারণে কিন্তু আমাদের মনে হয়েছিল তাঁর খেলা দেখে, তিনি অনেকক্ষণ খেলবেন, ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে যে খেলা হয় না।

দর্শকেরা আজ চমৎকার ধৈর্য দেখিয়েছেন। যে রকম ভিড়ের চাপ ছিল, তাতে মাঝে মাঝে যে তাঁরা বেড়া উপচে মাঠে পড়েছেন এবং পুলিসের সঙ্গে সর্ট ও লঙ রান কাড়াকাড়ি করেছেন, তাতে বড় কিছু অন্যায় হয়নি। তাঁরা যে মাঝে মাঝে 'বল হরি' ধ্বনি করেছেন, তা না করলেই ক্লান্তিকর খেলা আরো ক্লান্তিকর হয়ে উঠত, ব্যাটস-ম্যানেরা হয়ত ঘুমিয়ে পড়তেন। তাঁরা যখন "আর কেন, আর কেন, যাও না, যাও না" সুরে হানিফের বিরুদ্ধে বিউগিল বাজিয়েছেন, সেটা, নিতান্তই অনিবার্য ছিল, কেননা ঐ সময়ে গঙ্গার উপর থেকেও একটা জাহাজের বুক-ভাঙা ভোঁ ভেসে এসেছিল। বরঞ্চ বিচিত্র ছিল পঁয়ত্রিশ টাকার আচরণ। যখন আমি বন্ধুর ট্রানজিস্টার রেডিওর তার-লাগানো ছিপি কানে দিয়ে বেতার-সংগীতের আনন্দ আহরণ করছি অন্য কেন্দ্র থেকে, তখন চমকে উঠলুম দূরবর্তী হৈ চৈ-এ। মেডেনের বন্ধ্যা হাততালি দিয়ে দিয়ে বিরক্ত পঁয়ত্রিশ মারামারি শুরু করেছে। নীল রক্তের বিদ্রোহ থামাতে দেখা গেল লাল পাগড়ি ছুটছে।

এই খেলা। তবু খেলা। এবং ক্রিকেট খেলা। এর অনেকটা ক্রিকেট-ক্রিকেট খেলা। কিছুটা সত্যই ক্রিকেট খেলা। দিনের শেষে, সন্ধ্যার মেঘল আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে সেই কথাই মনে

হল। ইডেন গার্ডেন কলকাতার হৃৎপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়েছিল। পাঁচদিন তাই থাকবে। দশটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ইডেন গার্ডেন কলকাতার সারা দেহের রক্ত টেনে নেবে, তারপরে ছড়িয়ে দেবে সন্ধ্যা ও রাত্রি বেয়ে। মধুর ও বিষণ্ণ লাগল। অনেক মানুষকে একসঙ্গে দেখলে আমার তেমনি মনে হয়। গ্যালারি থেকে নামতে নামতে শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে সেই ছেলেটির কথা মনে পড়ল। আমাদের পাড়ার ছেলে। সিজন টিকেটের জন্য দুপুর থেকে শুরু ক'রে লাইন দিয়ে সারারাত জেগে কাটিয়েছে; ধাক্কাধাক্কি, মারামারি সত্ত্বেও কাউণ্টারের সামনে হাজির হতে পেরেছে; টিকেট নিতে যাবে—পকেটে হাত দিয়ে দেখে, টাকা নেই, চুরি হয়ে গেছে। তাকে কিন্তু আমি নিজের টিকেট দিতে পারিনি। নিজের স্বার্থটাই বড় হয়েছিল। কিন্তু আমি জানি, এই হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে এমন কেউ না কেউ আছেন, যিনি ক্রিকেট-পাগল হয়েও নিজের টিকেটটা দিতে পারতেন ছেলেটিকে। নিশ্চয় পারতেন।

পাকিস্তান—প্রথম ইনিংস

হানিফ মহম্মদ ক বেগ ব দেশাই	৫৬
ইমতিয়াজ আমেদ ব সুরেন্দ্রনাথ	৯
সঈদ আমেদ ক নাদকার্নী বা সুরেন্দ্রনাথ	৪১
বার্কি এল বি ডবলিউ ব বোরদে	৪৮
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস ক উমরিগড় ব দেশাই	৮
মুস্তাক মহম্মদ নট আউট	২৮
নসিমুল গনি ব সুরেন্দ্রনাথ	০
ইন্তিখাব আলম নট আউট	৩
মোট (৬ উইঃ)	২০১

উইকেট পতন—১।১২ (ইমতিয়াজ); ২।৮৪ (সঈদ); ৩।১৩৫ (হানিফ); ৪।১৬৪ (ম্যাথিয়াস); ৫।১৮৫ (বার্কি); ৬।১৮৬ (গনি)।

দেশাই: ২৫—২—৭০—২ সুরেন্দ্রনাথ: ৩৩—১৪—৬৭—৩; উমরিগড়; ৫—২—৯—০; গুপ্তে: ১৬—৫—৩৭—০; বোরদে: ৫—২—১০—১।

দেখেই ভয় হচ্ছিল। প্রায়-সন্ধ্যার অন্ধকারে ইডেন গার্ডেনের স্কোর-বোর্ডটিকে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর মত দেখাল। সারাদিন পাঁশুটে মেঘে-মাজা আকাশ বিকালে মিনিট পনেরো সোনালি আলো গায়ে মেখে আবার আঁধারে নিজেকে ঢেকে নিল। জয়সীমা আলো কমের আবেদন জানালেন। অগ্রাহ্য হল। সেই সময় ভয়াবহ ছবিটা দেখলুম। অন্ধকারে স্কোর-বোর্ডের লাল চোখ দপ্‌দপ্‌ করছে অজ্ঞাত আক্রোশে। সি-নি-স্টা-র! তারপরেই আব্বাস আলী বেগ বোল্ড। দিনের শেষ বল।

গল্প উপন্যাসের খুব চেনা ছবি। হঠাৎ ঝড়ে-ধুলোয় সব ঝাপসা হয়ে মুছে যাওয়া। কিংবা একটা সুন্দর শিশুর, স্বর্গের সৃষ্টির, অপমৃত্যু। শিশু নিজের আলোয় নিজেই পুড়ল। আব্বাস আলী মাথা চাপড়ে, ব্যাট ঠুকে প্রায় চীৎকার ক'রে কেঁদেছিলেন।

কিন্তু আব্বাস জানেন না, তিনি কতখানি হারিয়েছেন। কলকাতায় প্রথম এলেন। ইডেনে প্রথম খেললেন। এখনো বাঙালী দর্শকের মনের চেহারা তাঁর জানা হয়ে ওঠেনি। জানলে বুঝতে পারতেন, তিনি কিভাবে শুকিয়ে দিয়ে গেলেন আমাদের মনকে। আব্বাস জীবনের সবচেয়ে বড় ভালবাসার অভিনন্দনকে না পেয়েই ফিরে গেলেন।

আব্বাস আলী সত্যই শিশু প্রতিভা। ফুটে উঠেন সহজ আবেগে। বিকিরণ করেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়। জানেন না কতখানি দেন অপরকে। জানেন না বলেই সঞ্চয়ের লোভে আক্রান্ত নন। এবং সেই জন্যই অনিবার্য ভালবাসা ধাবিত হয় তাঁর পিছনে।

একেবারে মুস্তাক আলী,—একজন বললেন। ঠিক কথা। মুস্তাক আলীর পরে আব্বাস আলী। মুস্তাকের প্রথম বলে বাউণ্ডারী, আব্বাসের শেষ বলে বাউণ্ডারী। মেজাজে ও সুষমায় এক জাত।

দু'জনেই রচনায় অনবদ্য, অথচ প্রায়ই পরিসমাপ্তিতে কাঁচা করুণ রস সৃষ্টি করেন।

আব্বাসের বিরুদ্ধে তাই অভিযোগ। পাত্র আমাদের ঠোঁটের সামনে তিনি তুলে ধরতে পেরেছিলেন, দু'এক চুমুক পানও করেছি; তারপরেই সে পাত্র কেড়ে নিয়ে বালকের অধীরতায় মাটিতে ফেলে চূর্ণ করেছেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে এমন ছেলেমানুষি দেখিনি, এমন অনুচিত চাপল্য। যেখানে আব্বাসের সহযোগী খেলোয়াড় আলো কমের আবেদন জানিয়েছেন, সেখানে সেই 'কম আলোয়' কেউ হুক করার কথা চিন্তাও করতে পারে? করবার নৈতিক অধিকার ছিল না তাঁর। করলে 'আবেদনটা' মিছামিছি করা হয়েছিল বোধ হয়। দিনের শেষ ওভারের শেষ বলে, যখন দলের অবস্থা কিছু আহা-মরি নয়, তখন আক্রমণের পাগলামির কথা বাদই দিচ্ছি।

কিন্তু আব্বাস যা খেলেছেন! এমন একটা উনিশ রানের জন্য লাইন দেওয়া, মারামারি করা সার্থক হয়ে ওঠে। 'ব্যাটবলের সংঘাতের মধুরতম কূজন' আব্বাসের ব্যাটিং থেকে শুনেছি। যে স্কোয়ার কাট মেরেছেন, তার যা লাবণ্যকোমল প্রকাশভঙ্গি, অথচ তার মধ্যে নিশ্চিত শক্তির যে ব্যঞ্জনা—মাঠের বাইশজন খেলোয়াড়ের মধ্যে বোধহয় আব্বাস আলীই তা সম্পাদনে সমর্থ।

কিশোর কুমার আব্বাস তাহার নাম। সে চলে গেছে। কাল এসে আর কী দেখব? হাজার হাজার রসিক দর্শকের নিঃশ্বসিত প্রশ্ন।

কাতরোক্তি থাক। সকালের কথায় আসা যাক। দ্বিতীয় দিনেও মাঠ যথারীতি আকণ্ঠ। ইডেন গার্ডেন লোভীর মত মানুষ গিলেছে। বেড়া উপচে উদ্‌গিরণ করেছে সারাদিন। ডাক্তারের ভূমিকায় পুলিস সে বমনরোধের চেষ্টা করেছে। প্রভাতে মাঠের চারপাশে ঘিরে ছিল মানুষের মালা, যার সম্বন্ধে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গিতে বলা চলত—

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে ইডেনঃ
ওহে মাঠ-দলপতি!

যারা মাঠে ঢুকতে পারেনি তারা পূর্বের মতই গাছের উপরে কিংবা রেডিও-ভবনের মাথায়। মানবশীর্ষ রেডিও-ভবন যেন কুঞ্চিত কেশযুক্ত। সকাল থেকেই মেঘলা আবহাওয়া, যা 'হোম ওয়েদার'-রূপে আব্বাস আলী কিংবা জাবেদ বাকির ভালো লাগার কথা। এই পরিবেশে বিশেষ প্রত্যাশা নিয়ে ভারতীয় দর্শক উপস্থিত। পাকিস্তানকে বেঁধে দেওয়া গেছে। আড়াইশো রানের মধ্যে নির্ঘাত ইনিংস শেষ।

পাকিস্তান গতকালের রানের সঙ্গে আরো ১০০ রান যোগ করল। দেখিয়ে দিল লেজ-মোটা ব্যাটিং কাকে বলে। ইন্তিখাব আলম ঠিক-ভুল মিলিয়ে চালিয়ে গেলেন। চমৎকার খেললেন মুস্তাক মহম্মদ; হানিফের ভাই—সত্যই মনে হল। কারো কারো মনে হল, বড় ভাই। দেশাইয়ের বাম্পারের উত্তর জানা আছে, তা মুস্তাক দেখিয়েছেন হুক ক'রে। এবং তিনি যে 'মহম্মদ'-ঘরানা তা প্রমাণ করেছেন লেট কাট ক'রে। হানিফ মহম্মদ চমৎকার লেট কাট করেন এই রকম জনশ্রুতি। পাকিস্তানের শেষ দিকের ব্যাটিং কর্তৃপক্ষের কিশোর-নীতির দৃঢ়তাপূর্ণ পক্ষ সমর্থন।

অবশ্য পাকিস্তানের দোহারা ইনিংসের পিছনে ভারতের স্বার্থত্যাগ অল্প নয়। ক্যাচ মিস ক'রে নির্লোভ সদাশয়তার পরিচয় দিয়েছেন ভারতীয় খেলোয়াড়েরা। সংখ্যায় এত যে, গণনা করতে পরিসংখ্যান বিভাগে খবর দিতে হয়। এই উদারতার ব্যাপারে দলরক্ষক কন্ট্রাক্টার এবং উইকেটরক্ষক তামানের ভূমিকা মুখ্য। তামানের কেবল ধড়পড় করেছেন, ঝাঁপ দিয়েছেন অকারণে এবং ক্যাচ ফস্কে ঘাড় হেলিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন দুঃখিতভাবে, যার দুঃখটাই মাত্র দলের লাভ। ফিল্ডিং-এ মঞ্জরেকার যথারীতি; তাঁর যন্ত্রণা, যত ক্যাচ-মার্কা বল তাঁর কাছেই আসে। ভারতীয় বোলিং কিন্তু মারাত্মক না হয়েও আক্রমণাত্মক হয়েছে। কালকের হীরো সুরেন্দ্রনাথ ভালো বল করেছেন। কালকের 'পতিত' দেশাই নিজেকে উত্তোলন ক'রে পুরনো শক্তিতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। নাদকার্নী টানা-ধাঁচের অফ

ব্রেক ক'রে গেছেন মাপা লেংথে, প্রতিটি বল ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার্তভাবে এগিয়ে গেছেন সুযোগগ্রহণের চেষ্টায়, যা দেখে ফণাধরা সাপের ছোবলের কথা মনে হয়েছে। সবচেয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন বোরদে, এক চুলের জন্য বহু বল উইকেটে না-ছোঁয়ার দুর্ভাগ্য সত্ত্বেও যা পেয়েছেন তা যথেষ্ট প্রশংসার। আজ তাঁর অ্যাভারেজ ২১ রানে ৪ উইকেট।

৩০১ রানের শক্তিশালী একটি শত্রুর বিরুদ্ধে ভারতের প্রারম্ভিক প্রতি-আক্রমণ মোটামুটি নিন্দের নয়। খুব আত্মবিশ্বাসপূর্ণ খেলা না হলেও কন্ট্রাক্টার ও জয়সীমা বিনা পতনে প্রথম উইকেটের রান-সংখ্যাকে নিয়ে গেছলেন ৫৯ পর্যন্ত। শেষ দু'টি রান সংগৃহীত হয়েছিল কন্ট্রাক্টারের মনোহর একটি লেগপুল থেকে। ঠিক পরের বলে ইস্তিখাব আলমের প্রতি কন্ট্রাক্টার সদয় হয়ে তাঁকে উইকেট দিলেন। কন্ট্রাক্টারের ব্যাটের ঝাঁটায় বল পরিষ্কার না হয়ে উইকেটে লেগেছে। জয়সীমা এতক্ষণ ছড়িয়ে ছিলেন। কন্ট্রাক্টারের বিদায়ের পরে স্বাভাবিকভাবেই দর্শকের সমর্থনে গুটিয়ে গেলেন। তারপর আনন্দ-রবি বেগের আবির্ভাব ও তিরোভাব, যে রোমান্টিক ট্র্যাজেডির কথা আগেই বলা হয়েছে।

অর্থাৎ ভারতের অবস্থা প্রীতিপ্রদ নয়। পাকিস্তানকে ৮৩ রানের বিনিময়ে দুইটি উইকেট উপহার দেওয়া হয়েছে। উইকেট দুইটি বোলারের ন্যায্য অর্জন নয়। ইস্তিখাব, যিনি দু'টি উইকেট পেয়েছেন, তাঁর চেয়ে সমর্থ বোলিং দেখা গিয়েছে নাসিমুল গণির হাতে। নাসিমুলের বিচিত্র নিক্ষেপভঙ্গি। বল ছাড়বার আগের মুহূর্তে হাত, বুক, মাথা একেবারে উল্টে দিয়ে আল্লার কাছে আবেদন জানিয়ে যেন বল ছাড়েন। ফজল,—প্রতিভার দন্তহীন হাসি। চলা ফেরায় ফজলের অধিনায়কোচিত মর্যাদা। দীর্ঘচ্ছন্দ ফজলকে দেখে অস্ট্রেলিয়ান বেনোডের কথা সকলের মনে পড়েছে। ফজলের বোলিং-রীতির মধ্যে একদা-ক্রূরতার ছাপ আছে। পিছনে হাত লুকিয়ে এগিয়ে আসেন

এবং একেবারে শেষকালে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বল ছোঁড়েন। ছোঁড়ার বেগে মাথার সব চুল নড়ে যায়। কিন্তু গোপন অভিসন্ধির ছায়া ভঙ্গিতে থাকলেও বলে তার চিহ্ন নেই। মামুদ হোসেন তাঁর বিশাল টাক, অনাবশ্যক নেগেটিভ বল এবং অযথা মাঝ-মাঠে ধাপানো বাম্পারের জন্য পরিচিত হয়েছেন।

দর্শকেরা আজ কিছু জীবন্ত ক্রিকেটের সন্ধান পেয়েছে। সকালের দিকে দর্শকের অভিরুচিমত পাকিস্তান-ইনিংস শেষ না হতে অবশ্য কিছু হতাশা ছিল। আক্ষেপ ছিল, সকালের বোলারেরা কেন প্রাতরাশ সারতে পারছেন না। আত্মিক শক্তিপ্রয়োগের জন্য ভারতীয় বোলারদের উপদেশ দিতে হয়েছে বার বার। সব জড়িয়ে বিপক্ষের ভালোয় দর্শকেরা দেশপ্রেমিকরূপে অসুখী হয়েছেন, তবু ক্রিকেটের একটা নিরপেক্ষ রসিক মন আছে, যা আনন্দিত হয়েছে মুস্তাক মহম্মদের যথার্থ ভালো ব্যাটিং এ, উত্তেজনাবোধ করেছে নিজেদের ফিল্ডারদের যথার্থ মন্দ ফিল্ডিং-এ, শেষ পর্যন্ত মোটামুটি তৃপ্ত হয়েছে ফিল্ডারদের অসহযোগিতা সত্ত্বেও ভারতীয় বোলারদের সাফল্যে। মাঠের অধিকাংশ দর্শক আজ রৌদ্রহীন আবহাওয়া উপভোগ করেছেন, অনুরাগে-বিরাগে লেবুর খোসা ছোঁড়াছুঁড়ি করেছেন, সন্ধ্যের ঝোঁকে খেলোয়াড়দের জল খাওয়ার বাড়াবাড়িতে চটাচটি করেছেন এবং নানা কৌতুক করেছেন, 'একটি বলের করুণ হত্যাকাণ্ডে।' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আজ খেলা শুরুর পনেরো ওভারের মধ্যে নতুন বল নষ্ট হয়ে গেল। আম্পায়ারেরা বল সম্বন্ধে দীর্ঘ পরামর্শ করলেন, শেষে বল বদলে নতুন বল এল। পুরুষ দর্শক বললেন, পাকিস্তান ঠেঙিয়ে বলকে চেপ্টা ক'রে দিয়েছে। রাগ করলেন তাঁরা,—এমন দুর্বল বল দেওয়া কেন? কটাক্ষ করলেন,—কোথাকার কোন্ চেনা দোকানের বল, প্রতি টেস্টে থেঁতলে যায়? অপরপক্ষে মহিলা দর্শকেরা খুব মুহ্যমান হয়ে পড়লেন যখন আম্পায়ারেরা নতুন বল মাটিতে ঘষে পুরনো করতে ব্যাপৃত রইলেন।

—'কি নোংরা মন ভাই, নতুন বলটাকে ঘষে ময়লা করে দিল ?' এই সব যখন ঘটছে, পুরনো বলটি গুলীবিদ্ধ মুমূর্ষু রেসের ঘোড়ার মত নতুন বলকে (হয়ত) অশ্রুতকণ্ঠে বলল,—যাও ভাই! আমি মরে বেঁচেছি। তুমি বেঁচে মর। অবিরত ব্যাটের চাবুক খাওগে যাও!

এসবের মধ্যে যথেষ্ট মজা ছিল না, যা ছিল কুকুর-কাহিনীতে। ইডেন গার্ডেনের কুকুর-পুরাণ প্রতিদিন দীর্ঘ হয়ে উঠছে। প্রতি বছর কুকুর। প্রতিদিন কুকুর। গতকাল কুকুর। আজ কুকুর। মাঠটা শ্বাপদসঙ্কুল হয়ে উঠেছে। গতকাল যে কুকুরটি ঢুকেছিল, পুলিস নাকি তার টিকেট দাবি করতে সে তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়েছিল। আজ সে কিছুতে যেতে চায়নি। বঙ্গজ জীবটি বঙ্গজ মানুষের মতই রসিক, বেগের খেলা না দেখে সে যাবে না। ফাঁকি দিয়ে অনেক কষ্টে তাকে ঢুকতে হয়েছে। কুকুরকে মাঠে দেখে কেউ বললেন,—আম্পায়ার, হাউজ দ্যাট ? কেউ বললেন, আম্পায়ার, আউট দাও। সে কথা কে শোনে। শুনলে কুকুর হবে কেন ?

দ্বিতীয় দৃশ্যের যবনিকাপাত হয়েছে। এখনো তিন দৃশ্য বাকি। তবেই পাঁচ দৃশ্যের অঙ্ক শেষ।

তৃতীয় অঙ্কে সাধারণত ক্লাইম্যাক্স হয়। মনে হয় এখানেও তাই হবে। অতএব সকলে প্রতীক্ষা করুন শেষ তিন দৃশ্যের অভাবিতের জন্য।

মানুষের রচিত নাটকের এই রীতি। ক্রিকেট মানুষের এবং বিধাতার রচিত নাটক। সেখানেও একই রীতি আশা করা যায়।

সুতরাং রবিবার আমরা মাঠে হাজির হব।

পাকিস্তান—১ম ইনিংস

হানিফ মহম্মদ ক বেগ ব দেশাই	৫৬
ইমতিয়াজ আমেদ ব সুরেন্দ্রনাথ	৯
সয়িদ আমেদ ক নাদকার্নি ব সুরেন্দ্রনাথ	৪১
বার্কি এল বি ডবলিউ ব বোরদে	৪৮
ওয়ালিস ম্যাথিয়াস ক উমরিগর ব দেশাই	৮
মুস্তাক মহম্মদ ক জয়সীমা ব বোরদে	৬১
নাসিমুল গনি ব সুরেন্দ্রনাথ	০
ইনতিখাব আলম ক তামানে ব সুরেন্দ্রনাথ	৫৬
ফজল মামুদ এল বি ডবলিউ ব বোরদে	৮
মামুদ হাসান ব বোরদে	৪
হাসিব আসান নট আউট	১
অতিরিক্ত	৯
মোট	৩০১

উইকেট পতন—১।১২ (ইমতিয়াজ) ; ২।৮৪ (সয়িদ) ; ৩।১৩৫ (হানিফ) ; ৪।১৩৪ (ম্যাথিয়াস) ; ৫।১৮৫ (বার্কি) ; ৬।১৮৬ (গণি), ৭।২৭৪ (মুস্তাক) ; ৮।২৯৬ (ইনতিখাব আলম) ; ৯।২৯৬ (ফজল মামুদ) ; ১০।৩০১ (মামুদ হাসান) ।

দেশাই : ৩৫—৩—১১৮—২ ; সুরেন্দ্রনাথ : ৪৬—২০—৯৩—৪ ;
উমরিগড় : ৬—২—১৫—০ ; গুপ্তে : ১৮—৬—৪১—০ ;
বোরদে : ১৬.২—৭—১১—৪ ; নাদকার্নী : ৬—৫—৪—০ ।

ভারত—১ম ইনিংস

নরী কণ্টাক্টার ব ইনতিখাব আলম	২৫
জয়সীমা নট আউট	২৮
আব্বাস বেগ ব ইনতিখাব আলম	১৯
অতিরিক্ত	১১
মোট (২ উইঃ)	৮৩

উইকেট পতন—১।৫৯ (কণ্টাক্টার) ; ২।৮৩ (বেগ) ;
মামুদ হোসেন : ৯—৪—২৩—০ । ফজল মামুদ : ৭—৪—৬—০ ;
ইনতিখাব আলম : ১৩—৬—১৮—২ ; নসিমুল গণি : ১১—৫—২৫—০ ।

কলকাতার ক্রিকেট-রসিকেরা ভাগ্যবান, তাঁরা দেশে বসে বিদেশকে পেয়েছেন। আজ দুপুর একটার সময় থেকে ইডেন গার্ডেনের গ্যালারিতে বসে কেবলই সন্দেহ হচ্ছিল, অন্তত সন্দেহ করতে ইচ্ছা হচ্ছিল, আমরা বোধহয় ইডেনে নেই, লর্ডসে বসে আছি। লর্ডসের সেই সবুজ মাঠ, ধোঁয়া-কুয়াশা-বৃষ্টিতে বিবর্ণ আকাশ, ঘনিষ্ঠ পরিবেশ এবং হাজার হাজার রসিক দর্শকের সমাবেশ। আমি বললুম, ঠিক লর্ডস। লর্ডস না দেখেও বললুম, কেন না আমি লর্ডসের আশে-পাশে বহু দিন মন-পদে হেঁটেছি, স্বাধীনতাপূর্ব মধ্যবিত্ত আকাঙ্ক্ষা যেমন স্বপ্নে ইংলণ্ডের পথে পায়চারি করত।

কাল রাত সাড়ে দশটার সময় যখন দখিনা বাতাস বইল, তখনি বোঝা উচিত ছিল—শীতের দক্ষিণ পবন আসলে অদক্ষিণ। আজ সকাল দশটার সময় মাঠে ঢুকতে যাচ্ছি—কয়েক ফোঁটা জল পড়ল গায়ে। তবু কিছু বুঝলাম না। বরং উল্টো ভাবলুম। এ জল ভারতের প্রতি সহানুভূতিতে, যে ভারত 'বেগ'-বর্জিত, তার প্রতি আকাশের অশ্রুজল। হায়, আকাশের চোখের জলের কি সর্বনাশা স্নেহ! খেলা শুরুর দ্বিতীয় বলেই জয়সীমা আমাদের হতাশ ক'রে, তাঁর সারাদিন-ব্যাপী আত্মরক্ষার বিরুদ্ধে পরম পবিত্র সমালোচনার কোনো সুযোগ আমাদের না দিয়ে, বিদায় নিলেন। মঞ্জরেকার রইলেন, এলেন উমরিগর, চেহারায় ও প্রতিভায় পয়লা নম্বর ক্রিকেটার। দুই বোম্বাই-ব্যূহের যুদ্ধ-ব্যাপার যখন দেখতে প্রস্তুত, উমরিগর নির্ভাবনা হয়ে উইকেটকীপারকে ক্যাচ উপহার দিলেন। তখন সবাই কাঁদছি। ভারতের চার উইকেটে ৮৫। হায় হায়! আমাদের দুঃখ দেখে উর্ধ্বলোক অশ্রুমেঘস্তম্ভিত হয়ে রইল। বোরদে নামলেন। লাঞ্চ পর্যন্ত দুজনে অনেক চেষ্টায় চালিয়ে গেলেন। কিন্তু লাঞ্চের পরে তিন ওভার কাটতে না কাটতে মঞ্জরেকার 'ফজলের বলে সম্পূর্ণ পরাভূত

হয়ে যখন বোল্ড হয়ে গেলেন—তখন আকাশলোক আর সামলাতে পারল না। ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলল। সেই কান্নার মধ্যে নাদকার্নী প্রবেশ করলেন ও কান্না বাড়িয়ে প্রস্থান করলেন প্যাভিলিয়ানে। তখন আম্পায়ারেরা বরুণরসের প্রকোপে বাধ্য হয়ে বিগলিতচিত্তে খেলা বন্ধ করে দিলেন। সে খেলা আর শুরু হল না।

আমি কিন্তু উল্লসিত হয়েছি। ভারতের দুর্দশাতেও খুসী হয়েছি। আমার বিশ্বাস, হার-জিত খেলার মূল কথা। ড্র নয়। সুতরাং এক দলকে হারতেই হবে। যদি ভারত হারে? নিশ্চয় দুঃখিত হব। কিন্তু আরো দুঃখিত হব যদি হারবার ভয়ে জেতার চেষ্টা না করে। খেলায় একবার হারলে দেশের সম্মান ধুলোয় লুটোবে এমন সোহাগী দেশপ্রেম আমার নেই। দেশের মর্যাদা রক্ষার ভার আমরা রাষ্ট্রনীতিকদের উপর দিয়ে রেখেছি, এবং সকলেই জানেন কিভাবে তাঁরা, কত মূল্যে, সে মর্যাদা রক্ষা করেছেন। আমরা চাই খেলা, পুরুষের খেলা। মার যে খাবে এবং মার যে দেবে এমন মর্দানা ব্যাপার। ভারতীয় ক্রিকেট-কর্তৃপক্ষ পিচে সিমেন্ট বিছিয়ে খেলার ফলাফল নির্ধারণের ভার নিজেদের উপর নিয়েছেন। যে সময়ে ভারতে ক্রিকেট খেলা হয়, তখন আবহাওয়া মধ্যবয়সী চরিত্রবান পুরুষ—ছায়াহীন আলো। সুতরাং উল্লসিত হলুম, যখন আবহাওয়া খেলার স্থির রূপের উপর অস্থির প্রভাব বিস্তার করতে আগ্রহী হল। একটা কিছু হবে—যাই হোক।

খেলা দেখতে দেখতে আজ তাই দৃশ্যপটের পরিবর্তনে চাপা উত্তেজনা বোধ করেছি সারাক্ষণ। যখন সকালেই জয়সীমা-উমরিগর বিদায় নিলেন, তখনি প্রত্যাশায় সূচিমুখ হয়ে আছি। মঞ্জরেকার ও বোরদে একেবারে ঝিমিয়ে না গিয়ে রান তুলতে লাগলেন। এবং মঞ্জরেকার বিদায় নেবার পর যখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়তে লাগল, আকাশ ধোয়া-ইজেলের মত দেখাতে লাগল, বেতার-ভবনের শীর্ষ হয়ে উঠল ছাতায় ছত্রাকার, তখন শীতের হাওয়ায় অল্প কাঁপুনির মধ্যে ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছি। দেখছি বোরদে তাঁর সমস্ত প্রতিভা ও

ল্যাঙ্কাশায়ারীয় অভিজ্ঞতা আকর্ষণ ক'রে ব্যাট ক'রে যাচ্ছেন এবং ইন্তিখাব আলমের বল দেখে ভাবছেন, যেমন রামাধীনের বল দেখে কম্পটন ভাবতেন,—'মেঘলা দিনে দেখেছিলেম মাঠে কালো হাতের রাঙা বলের রোখ,'—তখন আমরা ভাবছি, ক্রিকেট কী অপূর্ব—কী নাটকীয়!

নাটক অপূর্ব অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হল ১টা ৩০ মিনিটে। খেলা স্থগিত রইল। এই প্রথম মনে হল, সমান না হোক ভারত-পাকিস্তান টেস্ট খেলা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার কিছু ক্ষুদ্র সংস্করণ। সেখানেও বৃষ্টির জন্য খেলা বন্ধ।

বলা বাহুল্য আবহাওয়াই আজকের খেলার প্রধান চরিত্র। বাকি চরিত্রদের মধ্যে প্রথমে আসেন খেলোয়াড়েরা। খেলোয়াড়দের মধ্যে প্রথমে আসেন, বোরদে। আমার কেমন বিশ্বাস, চাঁদু বোরদে ইডেন গার্ডেনকে ভালবেসে ফেলেছেন। গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইডেনের বোরদেকে নিশ্চয় মনে আছে। নিশ্চয় মনে আছে কিভাবে তিনি জীরো থেকে হীরো হয়েছিলেন। এ বছরও যখন দল থেকে খসে যাবার কথা, তখনই ইডেনের মেঘলা পরিবেশ বোরদের বোঁটা শক্ত ক'রে দিল। গতকাল বোরদের বোলিং এবং আজ বোরদের ব্যাটিং। বোরদে আজ বহু অস্থির ক্ষণ কাটিয়েছেন। তাঁর আত্মরক্ষায় অনিশ্চয়তা ছিল। কিন্তু সেরা কয়েকটি মার মেরেছেন, অন্তত একটি সুইপ (ইন্তিখাবের বলে) ও দু'টি লেট কাট। শেষেরটি তো (হাসিবের বলে) এই ম্যাচের এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ লেট কাট। আবার বোরদের বহু মার নিতান্ত নাম-হারা, যে মার দেখে অপরপ্রান্তে মঞ্জরেকারের হয়েছে হৃৎকম্প এবং দর্শকেরা তাঁকে লিখে রেখেছেন খরচের খাতায়। তবু বোরদেই প্রিয়, কারণ তিনিই রান দেন, তিনি 'খেলা' শব্দটি আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করেন এবং দর্শককে ভয় পাইয়ে উল্লসিত রাখেন। বোরদেকে কোনো সময় দুর্ভেদ্য মনে হয় না, তাই নিজস্ব কিছু ক'রে উঠতে পারেন তিনি। অর্থাৎ তাঁর যে 'ফাঁক' দিয়ে বল গলতে পারে, সেই অনির্দেশ্য ভূমি থেকে সৃষ্টিও আসতে পারে। সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যময় বোরদে সদানন্দ যৌবন।"

তিন দিনের মধ্যে আজকে সত্যিই কিছু খেলেছেন দর্শকেরা। অন্য দিন মূলত দেখেন। প্রথম দিকে তাঁদের মনোভঙ্গ, যখন বিশ্বাসী জয়সীমার বিদায়। তার পরেই হৃদয়ভঙ্গ—সুন্দর চেহারার উমরিগরের প্রস্থানে। দুঃখের মধ্যে চাঞ্চল্য,—একটা কিছু তো হচ্ছে। তারপরে যখন বোরদে-মঞ্জরেকার খেলছেন, তখন উৎসাহের পুনরাবর্তন। পতনের মধ্যেও ভারতের উর্ধ্বগতিতে তৃপ্তি। কিছু সময়ের জন্য মামুদের টাক নিয়ে ব্যস্ততা (স্টেডিয়ামে), বোরদের অধৈর্যের বিরুদ্ধে 'পেসেন্স! পেসেন্স!' নির্দেশ (৩৫৲ টাকায়, অধ্যাপকের) এবং সকলে মিলে বোরদে-মঞ্জরেকারকে বহির্গামী বল সম্বন্ধে অস্পৃশ্যতার উপদেশ।

তারপর যখন পালে সত্যিই জল পড়ল, সকলের কী উদ্দীপনা! প্রথমত বিশেষজ্ঞরা আলোচনা শুরু করলেন—অ্যাপীল, পিচ-ঢাকা, ক্যাপ্টেনের এ ব্যাপারে অধিকার, আম্পায়ারের দায়িত্ব কতখানি! তারপরে ইতিহাসের মন্থন। এ জিনিস কবে ইডেনে হয়েছে? স্মৃতিকে অন্তর টিপুনি। তারপর আরও জল বাড়ল। মাইকে না কোথায় শোনা গেল, অমুকের দাদা ছাতা নিয়ে বাইরে অপেক্ষমাণ অমুকের ড্রাইভারকে দরকার ইত্যাদি। ইতিমধ্যে যাঁর মাথা ঢাকার কিছু আছে তাঁর সম্বন্ধে ঈর্ষা, যাঁর ছাতা আছে তাঁর প্রতি বিদ্বেষ। পনেরো টাকার সিজন টিকিটের প্রতি এই প্রথম প্রলুব্ধ হল পঁয়ত্রিশ টাকা। 'ওরা কেমন মজায় ছাতের তলায়।' জল আরো বাড়ার দিকে—জল নামল বরবর্ণিনীদের উপর। ঠোঁটের রঙ, চোখের কাজল, গালের এনামেল বিগলিত। চায়ের কদর, কয়েক লক্ষ সিগারেটের সতীদাহ এবং আইসক্রীমের অব্যাহতি। সকলেই দণ্ডায়মান, খেলা আরম্ভের পক্ষে সবাই, পুরুষেরা উত্তেজিত এবং মহিলারা বিব্রত। জলের জন্য ঘোমটা টানলেন আধুনিকারা, ঘোমটা-টানা লক্ষ্মীশ্রী প্রথম দেখা গেল পঁয়ত্রিশ টাকায়। তাসের আসর বসেছে চার টাকায় স্টেডিয়ামে। ব্রহ্মতালুতে রুমাল চেপে ঘোরাঘুরি করছেন কর্মকর্তা।

আজকে কিছু না লেখবার সুযোগ ছিল। সেই বিশ্বপাজি ছেলেটার মত রচনা লিখতে পারতুম। ছেলেটা স্কুলে এক মিনিটে ক্রিকেটের বিষয়ে রচনা লিখে দিয়েছিল,—'বৃষ্টি। খেলা বন্ধ।' কিন্তু আমার প্রিয় পাঠকেরা ক্রিকেট ছাড়া অন্য কিছু চান বলে শীতের ভিজে রাতে কলম ধরতে হয়েছে। গত দিন তাঁদের বলেছিলুম—ক্রিকেট নাটকের মত, আজও বলছি তাই।

আমার থেকেও অনেক সুন্দরভাবে কথাটা সত্য করেছেন এক দর্শক। নাদকার্নী যখন আউট হয়ে গেলেন, অন্ধকারের মধ্যে একটি বিশাল দীর্ঘশ্বাস শুনলুম—

আউট! আউট! ব্রীফ ক্যাণ্ডল!

হায় শেক্সপীয়ার!

পাকিস্তান—১ম ইনিংস—৩০১

ভারত—১ম ইনিংস

নরী কণ্টাক্টার ব ইনতিখাব আলম	২৫
জয়সীমা ক ওয়ালিস ম্যাথিয়াস ব মামুদ হোসেন	২৮
আব্বাস বেগ ব ইনতিখাব আলম	১৯
মঞ্জরেকার ব ফজল মামুদ	২৯
উমরিগর ক ইমতিয়াজ ব মামুদ হোসেন	১
বোরদে নট আউট	৩৩
নাদকার্নী ক ইমতিয়াজ ব ফজল	১
দেশাই নট আউট	০
অতিরিক্ত	১১
মোট (৬ উই:)	১৪৭

উইকেট পতন :—১।৫৯ (কণ্টাক্টর); ২।৮৩ (আব্বাস); ৩।৮৩ (জয়সীমা); ৪।৮৫ (উমরিগর), ৫।১৪৫ (মঞ্জরেকার); ৬।১৩৭ (নাদকার্নী)।

মামুদ হোসেন : ২২—৯—৪৩—২; ফজল মামুদ : ১৪·৪—৮—১৪—২; ইন্তিখাব আলম : ২৪—১১—৩৫—২; নসিমুল গণি : ১২—৫—৩২—০; হাসিব আসান : ৫—১—১২—০।

—প্রভাতের প্রার্থনা—

আর রোদ দিও ইডেন গার্ডেনটিকে, হে সূর্য।

মঙ্গলবার সকাল থেকে মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে সিজন টিকেটের সঙ্গে পরিণীত কয়েক সহস্র সম্পন্ন ব্যক্তি এক গরীবের কবির কথা প্রার্থনাসুরে উচ্চারণ করেছেন। তাঁরা রোদ চেয়েছেন ইডেন গার্ডেনের জন্য, যাতে খেলা আরম্ভ হতে পারে। দশটার সময় সূর্য দেখা দিয়েছেন প্রকাশ্য প্রভায়, যে সূর্য পাকিস্তানের সৌভাগ্য-সূর্য। হয়ত শেষ করা যাবে ভারতকে, ভিজে মাঠে, অনিশ্চিত পিচে, ফজলের বলের ও নামের ভীতিতে।

খেলা আরম্ভ হল দুপুর একটায়, খাওয়া-দাওয়ার পর।

আগের দিন বলেছিলাম ভারত-পাকিস্তান খেলোয়াড়দের নেতি-মনোভাবে এবং কর্তার ইচ্ছায় কৃত সহিষ্ণু পিচে যখন ড্র-সহ পাঁচদিন-ঠাসা খেলার ব্যবস্থা ঠিক হয়ে আছে, তখন নিরুপায় প্রকৃতি বিদ্রোহ করেছে বৃষ্টি ঝরিয়ে। চেতনের বিরুদ্ধে জড়ের এই মহত্তম বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত উভয়পক্ষের সমবেত চেষ্টায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে চলেছে। ভারতের শেষ চার উইকেট সঙ্গত কারণেই হয়ত ৯০ মিনিটে ৩৩ রান করেছে। ভারতের পক্ষে আত্মরক্ষার চেষ্টা স্বাভাবিক এবং ভারত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ নয় যে, পতনের মুখে পিটিয়ে যাবে। কিন্তু আরো বেশী কিছু আশা করা গিয়েছিল পাকিস্তানের কাছে। তাঁরা যখন প্রথম ইনিংসে ১২১ রানে এগিয়ে আছেন, তখন হয়ত ঝুঁকি নিয়ে দ্রুত রান তুলে দান ছেড়ে ভারতকে শেষ দিনের ভাঙা ও ভিজে পিচে হারাবার চেষ্টা করবেন। ইমতিয়াজের খেলার সেই সুস্থ মনের চেহারা দেখা দিয়েছিল। তিনি যেভাবে সুরেন্দ্রনাথের বল লাফ দিয়ে মারতে চেয়েছেন, তা নিছক প্রয়াস হিসাবে প্রশংসনীয় এবং ভারত ও পাকিস্তান উভয় দলের খেলোয়াড়দের কাছে আদর্শস্বরূপ। কিন্তু

ইমতিয়াজের বিদায়ের পর থেকে মনের মন্দগতি ফুটে উঠল, এবং সুবিখ্যাত হানিফ, যিনি নাকি প্রয়োজনে আক্রমণ করতে অভ্যস্ত, তিনি করলেন ৭৫ মিনিটে ৯ রান এবং ৭৫ মিনিটে পাকিস্তানের হল মোট ৩০ রান।

মনে হচ্ছে নৈসর্গিক কোন উপায়ে জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনা নাই। খেলোয়াড়-যোগীদের তিতিক্ষা ও সংযমের কাছে প্রকৃতিকে ভারতবর্ষে হারতেই হবে।

—ক্যাচ ধরে যে—

পাকিস্তানকে হারাবার যোগ্য নয় ভারত অন্তত একটি কারণে। সে ভুলে গেছে ক্রিকেটের একটি মূল নীতিকথা—'ক্যাচ ধরে যে, ম্যাচ জেতে সে।' সে সচ্চরিত্র আদম, শূন্যের লাল আপেলের দিকে কোনমতে হাত বাড়াবে না। তার উইকেটরক্ষক তামানে ও যোশীরা দু হাতের চওড়া গ্লাভসকে যথেষ্ট চওড়া পাননি। তার অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টার হুক মার থেকে মাথা বাঁচাতে ব্যস্ত থাকবেন, (যথা সুরেন্দ্র-নাথের বলে ইমতিয়াজের মারে), কেন না অধিনায়ক কণ্ট্রাক্টারের মাথা মানে ভারতের মাথা। তার সকল খেলোয়াড় মিলে খেলায় আন্দাজ বলে যে একটা কথা আছে একেবারে ভুলে যাবেন ক্যাচ লোফার ব্যাপারে (যথা, পুনশ্চ কণ্ট্রাক্টার,—দেশাইয়ের বলে ইমতিয়াজের একস্ট্রা কভারে ক্যাচে কিংবা সুরেন্দ্রনাথ,—দেশাইয়ের বলে হানিফের সিলি মিড অনে ক্যাচে) ইত্যাদি। ক্যাচ ছেড়ে কণ্ট্রাক্টার রীতিমত জনপ্রিয় হয়েছেন জনতার কাছে। তাঁকে 'ফিল্ডিং-শিক্ষা' গ্রন্থ এবং একটি ছেলেধরা থলি উপহার দিতে অনেকে প্রতিশ্রুত হয়েছে।

—তবু বৃষ্টির দান—

বৃষ্টির অন্যতম দান ফজলের গত-গৌরবের অনুভব। ফজলের দ্বিতীয় দিনের বল দেখে বলেছিলাম, প্রতিভার দন্তহীন হাসি। শুকনো মাঠে সত্যই তাই, কিন্তু ভিজে বা হাওয়া-ভারী নরম মাঠে ফজলের মাড়ির জোর বোঝা গেছে। রবিবার এবং মঙ্গলবার ফজলই পাকিস্তান

পক্ষে তীক্ষ্ণতম বোলার। রবিবার তিনি যে-বলে মঞ্জরেকারকে আউট করেছেন, সে বলের কাছে পরাজয়ে লজ্জা নেই, সেকথা স্বয়ং মঞ্জরেকার হাত তুলে স্বীকার ক'রে গেছেন। বাকি উইকেটের ব্যাপারে অবশ্য ফজলের সেরা বলগুলি ব্যর্থই হয়েছে, অপেক্ষাকৃত মাঝারি বলেই উইকেট পেয়েছেন, এবং উভয়ক্ষেত্রেই ফজল হেসেছেন—ক্রিকেটের বিচিত্র স্বভাব তাঁর হাসিতে ফুটে উঠেছে।

মামুদ হোসেনও যোগ্যভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। একই ডেলিভারীতে দুই দিকের উইকেট তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছে। তিনি দূর প্রান্তের উইকেট আক্রমণ করেন বল দিয়ে এবং নিকট-প্রান্তের উইকেট ক্ষত করেন (নিশ্চয় অজ্ঞান্তে) পা টেনে। তাঁর 'পদচিহ্নের পদাবলী', আম্পায়ারদের গভীর আলোচনার বিষয় হয়েছে।

আজ খেলা শুরুর পরে বল পড়ে গোড়ার দিকে স্লো হয়েছে। পরে মাঝে মাঝে লাফিয়েছে। নীচু হয়েছে গোঁ-ভরে। এবং এমন কয়েকটি আচরণ করেছে যার পিছনে বোলারের অভিপ্রায় অপেক্ষা মাঠের খুশীই প্রধান প্রেরণা।

এর ফলে ব্যাটসম্যানদের পিচের ছাদে ব্যাট পিটতে হয়েছে ; ভূমিক্ষয় নিরোধে নিযুক্ত থাকতে সারাক্ষণ।

—বোরদেই আবার, কিংবা দেশাই—

দেশাইয়ের কথা বলে নেওয়া যাক। 'ক্ষুদে ওস্তাদ' কথাটা হানিফের কাছ থেকে কেড়ে না নিয়েও দেশাইকে অর্পণ করা যায় কিনা ভেবে দেখা উচিত। দেশাই মাঠে থাকলে একটা কিছু করবেনই। আমার নিজের ধারণা, মাঠের মধ্যে সজীবতম শক্তির নাম দেশাই। বল করলে বাম্পার, ব্যাট করলে স্কোয়ার ও লেট কাট এবং ফিল্ডিং করলে লাইন ধরে অন্তত আধখানা মাঠে দৌড়। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে আজকে গৌরবজনক বোলিং করেছেন দেশাই। নরম মাঠে বাম্পার সম্ভব নয় বলে প্রাণপণে ইয়র্কারের চেষ্টা করেছেন। যে প্রবল চেষ্টায় বলে অস্বাভাবিকগতি এনেছেন তা বিশেষ প্রশংসার বস্তু। হানিফকে তিনি সুস্থির হতে দেননি। ভিজে বল ঘষে ঘষে জামার

উপর রক্তলেখা নিয়ে তিনি ভারতীয় বোলারের পক্ষে আউট করার প্রধানতম, সম্ভবত শেষতম উপায় অবলম্বন ক'রে ইমতিয়াজকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। বলের ধাক্কায় ইমতিয়াজের লুটিয়ে-পড়া মাঝকাটি ভারতীয় সমর্থকদের দিনশেষে একমাত্র সান্ত্বনা এবং তা দেশাইয়ের দান।

দেশাই আরো কিছু করেছেন। তিনি এমন দুটি লেট কাট করেছেন, যাতে ইডেন মাঠ খুশীতে হেসে উঠেছে। দুটোই ফজলের বলে। তার আগে দেশাই ফজলের বলে বেঁচে এবং বেঁচে খেলেছেন। পরে, তারই উত্তরে, মেরেছেন এবং মেরেছেন। দেশাই 'চিহ্নিত' ব্যাটসম্যানদের কিছু ব্যাটিং শেখাতে পারেন। আগামী দু'টি টেস্টে এই ক্ষুদে অলরাউণ্ডারটি বিপক্ষের বলে আরো কিছু ব্যাটের স্বাক্ষর রাখলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

দেশাইয়ের কথায় বোরদের কথা স্থগিত আছে। বোরদে যে-কোন সুন্দর প্রশস্তি দাবি করতে পারেন, এই বলাই যথেষ্ট। দলের বিপদের মুখে তাঁর ব্যাটিং। বোঝা গেল, বোরদে কেন ইংলণ্ডে ভাল করেছেন। তাঁর হালকা পা, চঞ্চল হাত এবং সচকিত মন। তিনি সৃষ্টিধর্মী, তাই অধৈর্য, এবং আত্মঘাতী। কিন্তু অন্যে যেখানে অসমর্থ, সেখানে তিনি অকুতোভয়। আজ ৪ ৪ রানে তিনি আউট হয়েছেন। তাঁর অর্ধশত-বঞ্চনায় সকলে বিশেষ দুঃখিত। ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে বড় বিদায়সম্বর্ধনা পেয়েছেন।

—একটি বৈশিষ্ট্য—

ভারতের ১৮০ রানের প্রথম ইনিংসে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবার মত। মঞ্জরেকারকে বাদ দিলে বাকি ব্যাটসম্যানেরা প্রায় কেউই উচ্চাঙ্গের কোনো বলে আউট হননি। দ্বিতীয় দিনে কণ্ট্রাক্টার ঝাড়ু চালিয়ে, এবং বেগ চরকি ঘুরিয়ে যেভাবে আউট হয়েছেন, তা তাঁদের বোলার-প্রীতির পরিচয়, একথা আগেই বলেছি। তৃতীয় দিনে উমরিগরের আউট সম্বন্ধেও একই কথা। চতুর্থ দিনে দেশাই, তামানে ও গুপ্তে সম্বন্ধে নতুন কথা বলা যাবে না। নাদকার্নী ও বোরদে মন্দ না হলেও শ্রেষ্ঠ বলে আউট হননি।

একথা সত্য, ব্যাটসম্যানেরা অনেক সময় মন্দ বলে আউট হন। কিন্তু মন্দের কাছে হার স্বীকারের এহেন দলবদ্ধ চেষ্টা অল্পই দেখা যায়।

—'নাম ভূমিকায়'—

তৃতীয় এবং চতুর্থ দিনে 'নাম ভূমিকায়' যাঁরা এসেছেন তাঁরা কিন্তু খেলোয়াড় নন—তাঁরা খেলা-পরিচালক—আম্পায়ার। ক্রিকেট যে একটা ওয়াণ্ডারফুল খেলা তা আর একবার প্রমাণিত হল এই আকর্ষণের স্থানান্তরে। সাধারণত খেলার মাঠে আম্পায়ারকে বিশেষ লক্ষ্য করা হয় না ; করলেও ভালবাসার চোখে তাদের কেউ দেখে না। খেলার এই বিচারকদের অবস্থা বিয়ে-বাড়ির পুরোহিতের মত, দু'টি দলকে একত্র করার পবিত্র কর্মে নিযুক্ত থেকেও তাঁরা অবজ্ঞাত। যখন লক্ষিত—গালাগালির লক্ষ্য। ক্রিকেটের যত তামাসা তার শতকরা ৮০ ভাগ আম্পায়ারকে নিয়ে। তাঁরা কখনো ভ্রাম্যমাণ বস্ত্রাগার, কখনো সাদা আলখাল্লাপরা প্রধান ধর্মযাজক, কখনো হাত-তোলা ট্রাফিক-কন্ট্রোলার। তাঁদের ভুল (?) সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা তাঁদের পিতৃপুরুষসহ কবরস্থ হন, কিন্তু কোনো ঠিক সিদ্ধান্তের জন্য তাঁরা প্রশংসিত হন না। প্রথম কথা, কোন্ সিদ্ধান্ত ঠিক তা বুঝবার বুদ্ধি শতকারা ৯৯ জনের নেই। দ্বিতীয়ত, যদি কেউ বোঝেও—ওতে আর আশ্চর্য কি, ওই জন্য তো আমরা যখন টিকেট পাচ্ছি না, তখন তোমাদের সদক্ষিণা মাঠে দাঁড় করানো হয়েছে।

সেই আম্পায়াররা শোধ তুলেছেন। প্রকৃতির সহায়তায় তৃতীয় ও চতুর্থ দিনে তাঁদের প্রতিটি পদক্ষেপের পিছনে তাঁরা টেনে নিয়ে গিয়েছেন বিস্ফারিত, কিংবা দূরবীনে ও চশমায় আবৃত হাজার হাজার ব্যাকুল নয়নকে। 'আবহাওয়াতত্ত্ববিদ্' এবং 'মৃৎতত্ত্ববিদ্' রূপে তাঁদের অধিকারকে মান্য করতে হয়েছে।

কাউকে ভূমিকায় বঞ্চনা করেনা যে খেলা, তার নাম ক্রিকেট।

—আসল কথা—

আসল কথাটি এবার বলেই ফেলি। বেশী কিছু আশা করবেন না। ভারত-পাকিস্তান বিস্ময়ের সৃষ্টি করতে পারবে না—সে ক্ষমতা

তাদের নেই, তারা এত মাঝারি। সম্ভবত দশটি ড্র-এর অমীমাংসিত সীমান্ত সমস্যা নিয়েএই সিরিজ শেষ হবে—পনেরটি ড্র-এর সম্ভাবনাকে জাগিয়ে রেখে। ড্র-এর মাথায় রেকারিং বিন্দু পড়ে গেছে।

তবু এটা ক্রিকেট খেলা, বিস্ময়ে অশেষ, সম্ভাবনায় নিত্য আক্রান্ত। জপ করা যাক কথাটা।

পাকিস্তান—১ম ইনিংস—৩০১

ভারত—প্রথম ইনিংস

নরী কণ্ট্রাকটার ব ইস্তিখাব আলম	২৫
জয়সীমা ক ওয়ালিস ব মামুদ হোসেন	২৮
এ এ বেগ ব ইস্তিখাব আলম	১৯
পলি উমরিগড় ক ইমতিয়াজ ব মামুদ হোসেন	১
সি জি বোরদে ক ইমতিয়াজ ব ফজল	৪৪
বাপু নাদকার্নি ক ইমতিয়াজ ব ফজল	১
আর দেশাই ব হাসিব আসান	১৪
তামানে ব ইস্তিখাব আলম	০
সুরেন্দ্রনাথ নট আউট	৫
এস গুপ্তে ব ফজল	০
অতিরিক্ত	১৪
মোট	১৮০

উইকেট পতন:—১।৫৯ (কণ্টাক্টার): ২।৮৩ (বেগ); ৩।৮৩ (জয়সীমা); ৪।৮৫ (উমরিগড়); ৫।১৪৫ (মঞ্জরেকার); ৬।১৪৭ (নাদকার্নী); ৭।১৭৪ (দেশাই); ৮।১৭৫ (বোরদে); ৯।১৮০ (তামানে); ১০।১৮০ (গুপ্তে)।

মামুদ হোসেন: ৩২—১২—৫৬—২; ফজল: ২৫·৩—১৩—২৬—৫; ইস্তিখাব: ২৪—১১—৩৫—২; গনি: ১২—৫—৩২—০, হাসিব: ৭—১—১৭—১

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস

হানিফ মহম্মদ নট আউট	৯
ইমতিয়াজ আমেদ ব দেশাই	৯
সঈদ আমেদ নট আউট	১১
অতিরিক্ত	১
মোট (১ উইকেট)	৩০

উইকেট পতন—১।১৫ (ইমতিয়াজ)।

দেশাই: ১১—৪—১৪—১; সুরেন্দ্রনাথ: ৮—১—১৪—০; উমরিগড়: ৩—২—১—০; গুপ্তে: ১১—১—০—০

জাহাজটা তার সমস্ত যাত্রী নামিয়ে দিল। অপরাহ্ণ শেষ হয়ে গেছে। সন্ধ্যা নেমেছে। যাত্রীরা সরে চলে গেল দূরে। ধীরে অতি ধীরে অতল জলের অন্ধকারে নেমে গেল আহত জাহাজখানি।

ঠিক এই ছবিটাই, এই বিষণ্ণ মহান ছবিটাই, আমার মন অধিকার করল, যখন খেলা ভেঙে যাবার অনেকক্ষণ পরেও ইডেনের গ্যালারিতে বসে রইলুম। ইডেন তার সকল যাত্রীকে ফিরিয়ে দিয়ে ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারের মধ্যে।

একি শুধু একটি ছবি? পাঁচদিন ধরে হাজার হাজার মানুষকে যে আসন দিয়েছে, আশা ও নিরাশার মধ্যে ত্বলিয়েছে, ভাবিয়েছে, ভরিয়েছে আনন্দ-বেদনায়,—বিশাল উৎসবের প্রহরশেষে যদি তার সম্বন্ধে কিছু ভাবোদ্বেল হই, আমার পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। খেলা তো শেষ হল, স্টাম্প তুলে নিলেন আম্পায়ার, তের জন খেলোয়াড় আলো-ছায়া-মাখা নরম ঘাস মাড়িয়ে ফিরতে শুরু করলেন, নির্গমন-পথের মুখে মন্থর ভিড়, পুলিস ঘিরে ফেলেছে মাঠ, গ্যালারি থেকে শেষ ছিন্নপত্র সঞ্চয় করছে পথের বালকেরা, সেই সময়ে চোখ পড়ল স্কোরবোর্ডের দিকে, দেখলুম, বোর্ডের মাঝখানকার ঘড়িটিকে। এখনো চলছে, এখনো ঘুরছে। ঐ ঘড়িটাই ইতিহাস। বিনা দমে চলবে নিজের প্রাণ-প্রবর্তনায়। ঋতুর পাখিরা আসবে, ফিরে যাবে, গাড়ীর নীড়ে কিংবা পথের ভিড়ে; এসেছে তরঙ্গ তুলে, চলে যাবে একটানা স্রোতে,—কেউ থাকবে না, কেবল ঘড়িটা থাকবে। ঘড়িটা ইডেনের পুরাতন ইতিহাসের নূতন লিপি।

চলে গিয়েছিলুম অস্তসূর্যের আলোয়, যেখানে গড়ের মাঠে ছবির মত সারে সারে দাঁড়িয়েছিল ঘোড়সওয়ারেরা। ভাবালু হয়ে উঠেছিলুম। ফেরা উচিত সকালের ইডেনে। সকালের পর দুপুরে। তারপর বিকালে।

পঞ্চম দিনই পাঁচ দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন, যেদিন ভারত-

পাকিস্তানের তৃতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। আরো একটি অসমাপ্ত কাহিনী, স্পষ্টতাবাদী আমরা যার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড সমালোচনা করেছি, সেই আমরাও নিতান্ত দুঃখিত হইনি, যদিও ড্র-এর আঙুল গণায় আটের গাঁটে পৌঁছে গেছি। ড্র না হলেই ভালো ছিল। তবু অনেকখানি ক্লান্তিহরণ করেছে শেষ দিন, খেলাটিকে বিবর্ণতা থেকে উত্তোলন করেছে অনেকাংশে। দর্শকেরা পঞ্চম দিনের খেলার মধ্যে গোটা খেলার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ পেয়েছে, পেয়েছে সেই থ্রিলের সন্ধান, যা না থাকলে খেলার মাঠে বসে থাকা সময়ের ও অর্থের অপব্যয়।

আজকের চঞ্চল খেলাটিকে খুলে দেখা যাক। গতকাল পাকিস্তান ৭৫ মিনিটে ৩০ রান ক'রে যে ভুল করেছে, আজ তার পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছুক নয় দেখা গেল। সঈদ আউট হলেন সুরেন্দ্রনাথের বলে লেগবিফোর হয়ে, বার্কি এলেন। এসেই খেলার জাত পালটে দিলেন। বার্কি খেললেন ৬৭ মিনিট, করলেন ৪২ রান। নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর এই খেলা পাকিস্তানের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং। প্রথম ইনিংসেও বার্কি ভাল খেলেছেন। তাঁর মারের ঔজ্জ্বল্যের কথা বলেছি পূর্বে। তবু সে ইনিংসে সাময়িক বিভ্রান্তির কোনো কোনো ছায়াপাত ছিল। এই ইনিংসে বার্কি সব কিছু দুর্বলতা সরিয়ে (একবার একটি চান্স ছাড়া) পরিচ্ছন্ন প্রখর ও প্রদীপ্ত ভঙ্গিতে বার্কি খেলে গেছেন। আক্রমণ ছিল অথচ উগ্রতা ছিল না। অপূর্ব বিস্ময়ের সৃষ্টি না করেও নিপুণ চমৎকার রচিত হয়েছে। তাঁর ড্রাইভ নেই, কাটই বেশী, সুন্দর প্লেসিং করেন, সমাপ্তির সৌকর্যে পরিতৃপ্ত রাখেন সর্বসময়। পাকিস্তানের নির্ভাবনা ইনিংসের পটভূমিকায় বার্কি মুক্ত হস্তে খেলেছেন একথা বলা চললেও, সেই সঙ্গে এও সত্য, বার্কি যে-কোনো সময়ের উৎকৃষ্ট খেলোয়াড় হওয়ার যোগ্যতা রাখেন। তিনি পাকিস্তানী ক্রিকেট-পতাকায় ক্রিসেন্ট মুন,—তারকাদের মধ্যে নবোদিত চন্দ্র।

বার্কির গৌরবময় খেলার মতই চাঞ্চল্যকর আউট। তিনি

উমরিগড়ের বলে শেষ মুহূর্তে সুদৃশ্য একটি স্পর্শের গুণে বলকে লাইনের ধারে পাঠিয়ে নিশ্চিন্তে রান নিচ্ছেন,—প্রথম রান সমাপ্ত,—সহজেই দ্বিতীয় রান নেওয়া যাবে,—কেননা গুপ্তের দিকে বল,—হঠাৎ গুপ্তে, যেন সহসা ঘুম থেকে উঠে, নিজের দিকে ছুটে-আসা বলটিকে মহা বিরক্তিতে ছুঁড়ে দিলেন উইকেটের দিকে (নাকি ব্যাটসম্যানের দিকে ?), এবং অত্যাশ্চর্য ব্যাপার,—উইকেটকীপার মারফত উইকেট ভেঙে তচ্‌নচ্‌। বার্কি রান আউট। যেমন খেলা তেমনি আউট। দিনের প্রথম চাঞ্চল্য !

বার্কির সঙ্গে খেলেছেন হানিফ। বলা উচিত ছিল, হানিফের সঙ্গে খেলেছেন বার্কি। কারণ, হানিফ দলের এক নম্বর খেলোয়াড়। হানিফ মোট তিন ঘণ্টা খেলে ৬৩ রানে নট আউট। গতকালের অসুন্দর অনড়তার পরে আজ হানিফ যথেষ্ট নড়েছেন. ক্রীজ ছেড়ে লাফ দিয়ে মিড অফ, মিড অনের উপর দিয়ে তুলে বাউণ্ডারী করেছেন, কয়েকটি ড্রাইভ মেরেছেন, যাতে বোঝা গেছে ড্রাইভ তিনি করতে পারেন, সুরেন্দ্রনাথের বলে তাঁর স্কোয়ার লেগে বাউণ্ডারীটি মনোরম, কিন্তু ইডেন গার্ডেনের হানিফ সম্বন্ধে বক্তব্য, তিনি যেন খুসী থাকেন স্কোরখাতায় "৬৩ নট আউট", এই লেখাটি দেখে। তার বেশী দাবি করবার অধিকার তাঁর নেই। তাঁকে ঠেকিয়ে, থামিয়ে, এগিয়ে, পেছিয়ে ক্যাচ তুলে ও ফসকাবার পরে আবার আত্মরক্ষার নীরস চেষ্টা ক'রে, রানের জন্য লড়াই করতে হয়েছে। তিনি যে খুবই বর্ণহারা তাও বোঝা গেছে। ক্ষুদে হানিফ ইডেনে বড় হননি।

পাকিস্তান ইনিংস ডিক্লেয়ার করল বেলা দু-প্রহরে। ভারতের চেয়ে ২৬৭ রান এগিয়ে। ভারতকে শেষ করার জন্য বাকি আছে ১৮৭ মিনিট। সকলে বলল, ফজল তুমি ভারতের বন্ধু। তুমি ড্র চাইছ। তুমি সেই পরাজয় এড়াতে চাইছ, যে-পরাজয় ভারতের। ভারতের প্রাক্তন টেস্ট-ক্রিকেটাররূপে কি তোমার এই ভালবাসা ? অনেকেই কৌতুক বোধ করল ?

কন্ট্রাক্টার-জয়সীমা খেলাটিকে প্রত্যাশিত আত্মরক্ষাত্মক গতানুগতিকতার দিকে নিয়ে চললেন। জয়সীমা কিছু স্বচ্ছন্দ খেললেন। মিড অনে ও মিড অফে উল্লেখযোগ্যভাবে সজোরে ড্রাইভ ক'রে বাউণ্ডারী করলেন। তাঁর চোখে কুটো পড়া সত্ত্বেও এবং পেটে বল লেগে যন্ত্রণা হওয়া সত্ত্বেও, খেলে চললেন। পরিশেষে ম্যাথায়াসকে এই ম্যাচের অতি দর্শনীয় স্লিপ-ক্যাচ লুফবার সুযোগ দিয়ে প্রস্থান করলেন। ইন্তিখাবের বল ড্রাইভ করতে গিয়ে পিছনে ক্যাচ তুলেছিলেন তিনি।

জয়সীমার বিদায় এমন কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করল না, যা করল মাঠের নবরাজকুমার বেগের উদয়। আসলে সকলেরই মনে বেগের আসার জন্য একটা অস্ফুট অনুচিত প্রার্থনা ছিল। সকলেই চাইছিল, একজন কেউ আউট হয়ে বেগ আসুক। সুন্দরের প্রতি মানুষের চিরন্তন অবৈধ প্রেম।

পরের ওভারে প্রথম আশঙ্কার আঘাত এল। কন্ট্রাক্টারের বিদায়। হাসীবের বল ড্রাইভ করতে গিয়ে ক্যাচ তুলেছেন। ফজল ধরেছেন। কন্ট্রাক্টারও গেলেন! বিশ্বাসী কন্ট্রাক্টার। অধিনায়ক কন্ট্রাক্টার। অষ্ট্রেলিয়ার সম্ভ্রমের পাত্র, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ন্যাটা ব্যাটসম্যান কন্ট্রাক্টার। কন্ট্রাক্টারের বিদায় ভীতির সৃষ্টি করলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেনি ; এতই অস্বস্তিতে ছিলেন, এমনভাবে বার বার পরিত্রাণ পেয়েছেন ; নার্ভাসনেস দেখিয়েছেন অনাবশ্যক সর্ট রান করার ব্যগ্রতা দেখিয়ে, নিজের ভুলে অতিরিক্ত হেসে সার্ভাসনেসকে ঢাকবার নার্ভাস চেষ্টায়। আত্মরক্ষার জন্য প্যাড ও ব্যাট এক সঙ্গে ব্যবহার ক'রে, প্রচুর মিস হিট ক'রে, ৯০ মিনিটে ১২ রান ক'রে কন্ট্রাক্টার দেখিয়ে দিয়েছেন, তাঁর মত বড় খেলোয়াড়ের উপর কতখানি চেপে বসতে পারে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব। কন্ট্রাক্টারের বড় সংখ্যায় ক্যাচ-মিসও এর মধ্যে পড়ে।

এখন মনে হচ্ছে, বোধ হয় আমাদের বেছে নিতে হবে অধিনায়ক

কন্ট্রাক্টার ও খেলোয়াড় কন্ট্রাক্টারের মধ্যে একজনকে। আমি খেলোয়াড়ের পক্ষে আছি।

পাকিস্তানের শিবিরে হঠাৎ শিহরণ। ছু'টি প্রধান শিকড় কাটা হয়ে গেছে। বাকিরা ?

বেগ ফিরে গেলেন ছু'টো সাঁইত্রিশ মিনিটে এক রান ক'রে।

ঐ সময়ে হাসীব আসানের একটি ওভার বেগ যেভাবে খেলেছিলেন :

হাসীবের প্রথম বলে ড্রাইভ করতে গিয়ে বেগ ধুলো উড়িয়ে, বুট প্যাড ও ব্যাট দিয়ে কোনক্রমে বল থামালেন।

পরের বলে এল-বি আবেদন বেগের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পরের বলে বেগ ফরোয়ার্ড খেলতে গেলেন। বোল্ড।

আসা অবধি 'থতমত' বেগ বিদায়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এই সত্যকার প্রতিভাটি প্রশংসা, প্রত্যাশায় ও এ-বছরের ক্রমিক ব্যর্থতায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। শান্ত ও সুস্থির হয়ে বেগকে স্বাভাবিক প্রতিভাকে আকর্ষণ করতে হবে ভবিষ্যতে।

তিন উইকেটে ভারতের ৪৮।

হাসীব শূন্য রানে ছু'উইকেট।

উমরিগড় এলেন। হাসীব লজ্জাদায়ক পদ্ধতিতে উমরিগড়কে ঘিরে ফেললেন। সিলি মিড অন থেকে উইকেটের পিছন দিয়ে সিলি মিড অফ পর্যন্ত সাতজন খেলোয়াড় উমরিগড়কে মানুষের ঘোড়ার ক্ষুর পরিয়ে রাখল। স্পিনারের মহাভয় উমরিগড়ের কী ছুর্দশা!

ছু'টো ছেচল্লিশ মিনিটের সময়ে লেগের কোনো স্পটে-পড়া, দ্রুত ঘুরে আসা ইস্তিখাবের একটি বলে উমরিগড় ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বোল্ড হয়ে গেলেন! সুদীর্ঘ সুদর্শন উমরিগড়কে দেখলে কান্না আসে।

ভারতের ততোধিক অসহায়ত্ব। চার উইকেটে ৬৫। এইভাবে চলল্লে—। দর্শকেরা চিন্তা করতে পারছে না। দাঁতে দাঁত দিয়ে

সবাই খেলা দেখছে। বোরদে নামছেন। সকলের বুক গুরু গুরু। বোরদে কতখানি পারবেন? কতক্ষণ?

যন্ত্রণাকর নীরবতার মধ্যে একের পর এক বল পড়তে লাগল। রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়া। পাকিস্তানীরা ছোটাছুটি করছে চা-এর আগে একটা ওভার পাওয়ার জন্য।

তিনটে বাজল। স্বস্তির চা।

হাসীব আসান গৌরবময় বোলিং করলেন। চা-পূর্বের প্রথম মোহ-বিস্তারে—৪ ওভার বল, ৫টি মেডেন, ২টি উইকেট। শেষ পর্যন্ত ১৪ ওভার বল, ৬ মেডেন, ২৫ রান, ২ উইকেট।

হাসীব এখনো মার-খাওয়া বোলার হননি। স্বাভাবিক প্রতিভায় এবং ময়দানের দিকে অফ স্টাম্পের বাইরে কোনো এক ক্ষতের সাহায্যে বল করেছেন। যা করেছেন তা ভয়াবহ। কিন্তু তাঁকে খেলা যায়, পরবর্তীকালে প্রমাণ করেছেন বোরদে ও মঞ্জরেকার।

চায়ের পরে ভারতের আর কোনো উইকেট না পড়ে হয়েছে চার উইকেটে ১২৭ রান। অনবদ্য বোরদে ও স্থিতধী মঞ্জরেকার। মঞ্জরেকারকে পূর্বে যথেষ্ট নিন্দে করেছি ফিল্ডিং-এর জন্য। সে নিন্দে প্রত্যাহার করছি না। কিন্তু তিনি তাঁর দেহ-ভার সত্ত্বেও দলের বিপদের মুখ সঠিক স্থানে ব্যাট রাখতে পারেন এবং ড্রাইভ, কাট, পুল প্রভৃতি সব রকম মারের ক্ষমতা ধরেন। শরীরের ঐ আয়তন সত্ত্বেও ব্যাট চালিয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, কেননা তিনি ছেলে বয়সে ব্যাটিং-এর 'দ্বিতীয় ভাগ'টা ভাল ক'রে আয়ত্ত করেছিলেন। সর্ট রান নেওয়া তাঁর পক্ষে 'আর পারি না বাপু' পরিশ্রম; ধস্ ধস্ ক'রে দৌড়ে অপর প্রান্তে পৌঁছবার পরে এই স্ফীত আদুরে ছেলেটিকে সহাস্যে ধরে থামাতে হয়েছে ফজলকে, কিন্তু সেই মঞ্জরেকার দিনশেষে যখন টুপি খুলে মুখ মুছেছেন, তখন তাঁর গোল মুখে পরিপূর্ণ পরিতৃপ্ত

হাসি দেখা গিয়েছে। মঞ্জরেকার ভারতের অচলিত ক্লাসিক্‌স্‌। মেদ ঝরিয়ে একটু সহজ সংস্করণ হতে পারেন না?

।

বোরদের কথা আবার বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। আমার বোরদে-প্রীতি অনেকের পরিহাসের বস্তু। তবে পরিহাসটি আজ সমর্থনে কমনীয় এবং প্রশ্রয়ে মধুর। বোরদে আবার নিজেকে ব্যাটে ছন্দোময় করেছেন। আগের ইনিংসে হয়ত কিছু সংশয় ছিল, যার মূলে আছে বিরূপ প্রকৃতি,—এই ইনিংসে তাঁর নিঃসংশয় অবহেলার বিস্তার। বোরদের প্রথম ১২ রান তিনটি বাউণ্ডারীতে, যখন ভারতের অবস্থা সঙ্গীণ। তিনি ব্লেডের পুরোটি দেখিয়ে ব্লক করেছেন। যখন ফজল দ্রুত ও ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে আঘাত করতে চাইছেন, অতি প্রশান্ত-ভাবে ব্যাটটি পেতেছেন সামনে। পরের বলে অফে মনোরম কাট করেছেন এবং ফজল আরো উত্তেজিত হয়ে তাঁর প্রথম যৌবনের রীতিতে টক্‌ টক্‌ ক'রে তিন পায়ে লাফিয়ে বল দিতে ব্যস্ত হলে পরমানন্দে মধ্য-মাঠে গিয়ে মঞ্জরেকারের সঙ্গে বিশেষভাবে পরামর্শ করেছেন। বোরদে জানতুম বল বিক্ষিপ্ত করতে পটু, ড্রাইভেও কত বড় শক্তিমান সেনানী বোঝা গেল যখন ইস্তিখাবের বলকে মিড অফ দিয়ে চালালেন, যেটি গোটা পথ ঘাস বেয়ে গিয়ে ক্ষণেকের মধ্যে দর্শকের করায়ত্ত হল বেড়ার ধারে। ইস্তিখাবকে কভারে অনুরূপভাবে বোরদে পাঠিয়েছেন। এবং জনতার দাবিতে যখন বোলাররূপে হানিফ এসেছেন, তখন তাঁকেও একই ভাগ্য দিয়েছেন। মিড অনে ড্রাইভে-বাউণ্ডারীতে বোরদে প্রায় অনির্বচনীয়।

পাকিস্তানের ফিল্ডিং হয়েছে অনবদ্য। নাসিমূল, মুস্তাক আমেদ, ম্যাথায়াস, বার্কি,—এঁরা এঁদের কৈশোর-তারুণ্যকে নিক্ষেপ করেছেন ধাবমান বলের পিছনে। সফল হয়েছেন অভাবিতভাবে। দৃষ্টান্তের লোভ সংবরণ করাই ভাল। এক্ষেত্রে অভিযোগ করা চলে, হাত দিয়ে বল না গলিয়ে পাকিস্তান ভারতের বিষয়ে বিশেষ কার্পণ্য

দেখিয়েছে। হাত দিয়ে বল গলে না এমন কৃপণ—ছি !—মহিলারা বলেছেন।

ফজল শেষ দিকে বিশেষ ব্যস্ততা ও ব্যগ্রতা এনেছিলেন খেলায়। কৌতুকপূর্ণ ক্রোধে অস্থির ছিলেন তিনি। পাকিস্তান এই কালে সংবদ্ধ দলের মত খেলবার চেষ্টা করেছে তাঁর অধিনায়কত্বে। ভারতের সামনে পুরানো ভয়ের ইঙ্গিতটা সে তুলে ধরেছে,—মুঠোয় পেলে পাকিস্তান মুঠি আলগা করে না।

ফজল এই আগ্রহ এত বিলম্বে দেখালেন কেন, তাই প্রশ্ন।

ভারতের ফিল্ডিং? এই টেস্টের পরে পাড়ার ক্লাবে তামানের জায়গা হওয়া শক্ত হবে। গুপ্তে যেভাবে হানিফের সোজাতম ক্যাচ ছেড়ে নিজের স্পিনিং আঙুল বাঁচিয়েছেন, তাতে ইডেন গার্ডেনের বুড়ো দেবদারু তার সবকটা পাতা দুলিয়ে হেসে উঠেছে।

শেষ দিনের খেলায় কিছু আনন্দের স্বাদ পেয়েছে দর্শক। প্রথম দিকে কণ্ট্রাক্টারের ধীর খেলার বিরুদ্ধে ব্যারাক ক'রে তাঁরা ক্রিকেটের নিরপেক্ষতা প্রমাণ করেছেন, আসন নিয়ে মারামারির সময় বিউগলে রণধ্বনি বাজিয়ে যুযুধান প্রতিযোগীদের উৎসাহ দিয়েছেন, বোরদের মারের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে যন্ত্রের কোকিলকে বাজিয়ে কু-উ-উ সুর তুলেছেন, এবং দিনশেষে বোরদে-মঞ্জরেকারকে প্রভান্বিত দেখে আবেদন করেছেন—আরো একদিন খেলা বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

তৃতীয় টেস্ট শেষ হল। চতুর্থ ও পঞ্চম টেস্টের জন্য রেডিওর ধারে প্রতীক্ষা করার সময় আসছে। ইডেন গার্ডেন থেকে মানুষের বন্যা সরে গেছে। পাঁচ দিন ধরে একটি বৃহৎ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলাম আমরা। যাবার আগে আমরা সবাই কিছু স্মৃতি রেখে গেলাম, যার কোনো কোনো রেখা বন্যাহারা মৃত্তিকায় হয়ত লেখা থাকবে।

পাকিস্তান—১ম ইনিংস—৩১০

ভারত—১ম ইনিংস—১৮০

পাকিস্তান—দ্বিতীয় ইনিংস

হানিফ নট আউট	৬৩
ইমতিয়াজ আমেদ ব দেশাই	৯
সঈদ এল বি ডবলিউ ব সুরেন্দ্রনাথ	১৩
বার্কি রান আউট	৪২
ইনতিখাব আলম নট আউট	১১
অতিরিক্ত	৮
মোট (৩ উইঃ ডিঃ)	১৪৬

উইকেট পতন—১।১৫ (ইমতিয়াজ) ; ২।৩৪ (সঈদ) ; ৩।১১৬ (বার্কি) ।

দেশাই : ১৬—৪—৩৭—১ ; সুরেন্দ্রনাথ : ১৮—২—৫১—১ ; উমরিগড় : ১০—২—১৪—০ ; গুপ্তে : ১—১—৯—০ ; নাদকার্নী : ৭—০—৩৬—১ ।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

নরী কন্ট্রাক্টার ক ফজল ব হাসিব আসান	১২
এম এল জয়সীমা ক ওয়ালিস ব আলম	২৬
এ এ বেগ ব হাসিব আসন	১
ভি এল মঞ্জরেকার নট আউট	৪৫
পলি উমরিগড় ব আলম	৪
সি জি বোরদে নট আউট	২৬
অতিরিক্ত	১৬
মোট (৪ উইকেট)	১২৭

উইকেট পতন—১।৪৭ (জয়সীমা) ; ২।৪৭ (কন্ট্রাক্টার) ; ৩।৪৮ (বেগ) ; ৪।৬৫ (উমরিগড়) ।

মামুদ হোসেন : ৮—৩—৯—০ ; ফজল মামুদ : ১২—৫—১৯—০ ; ইন্তিখাব আলম : ১৫—২—৩৩—২ ; হাসিব আসন : ১৪—৬—২৫—২ ; নাসিমুল গনি : ২—১—৫—০ : সঈদ আমেদ : ১—১—২—০ ; মুস্তাক মহম্মদ : ৩—১—৯—০ ; হানিফ মহম্মদ : ১—০—৬—০ ; জাভেদ বার্কি : ১—০—৩—০ ।

গ্রেটেস্ট টেস্ট

১৯৬০-৬১ সালের অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট সিরিজ 'টাই'-হওয়া ব্রিসবেন টেস্টের কথা

ভস্মঅপমানশয্যা ছেড়ে ক্রিকেট উঠেছে। বীরের তনুতে তনু নিয়েছে সে। ক্রিকেট-ইতিহাসের নতুন বীরযুগে পুনরায় কৃষ্ণই নায়ক।

গ্রেটেস্ট টেস্টম্যাচ,—ব্রাডম্যান বলেছেন।

ব্রাডম্যান এ যুগের গ্রেটেস্ট ক্রিকেটার।

কেবল ক্রিকেটের নয়, যে কোনো খেলার ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা,—বলেছেন ওরিলি।

ওরিলি এ যুগের গ্রেটেস্ট বোলার।

বলেনি কে! না বলে পেরেছেন কে! যে দেখেছে সে বলেছে, যে পড়েছে সে বলেছে। বলায় অক্লান্তকণ্ঠ সকলে। ফিঙ্গলটন বলেছেন,—আমি ভবিষ্যতে একটি অসহ্য 'বোর' হয়ে দাঁড়াব, কারণ আমাকে ভাবী যুগের মানুষদের বলতেই হবে বারবার,—জানো, আমি সেই ব্রিসবেন-টেস্ট স্বচক্ষে দেখেছি?

১৯৬০ সালের ডিসেম্বর মাসের ব্রিসবেন টেস্ট সম্বন্ধে লিখতে আমার সংকোচ হচ্ছে! যে খেলা সম্বন্ধে বলা হয়েছে,—না দেখলে তাকে সত্য বলে বিশ্বাস হবে না, দেখলেও বিশ্বাস হওয়া শক্ত,—যে খেলা দেখতে দেখতে রসিক দর্শকের মনে অপূর্ব অবাস্তবতার চেতনা সঞ্চারিত হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে,—সে খেলার সত্যরূপ ফোটাব কি ক'রে? আমি তো ছার, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাকে কলম দিলেও তিনি কুণ্ঠা বোধ করবেন, কারণ স্রষ্টাও শেষ পর্যন্ত সৃষ্টির সব রহস্য জানেন না; আর তাছাড়া, সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা অনেকটা নাট্যকারের মত। নাট্যকার নাটক লেখেন কিন্তু সে'নাটক প্রাণ পায় অভিনয়ে।

ক্রিকেট-বিধাতা অদৃশ্যে থেকে ব্রিসবেন টেস্ট-নাটকটি লিখে দিয়েছিলেন—কিন্তু সে নাটকের মাঠ-রূপের সফলতা এনেছিলেন কয়েকজন ক্রিকেটার-অভিনেতা তাঁদের অভিব্যক্তির স্বাধীনতায়।

ক্রিকেটের সমস্ত নীতি-নিয়ম ব্রিসবেন মাঠে চরিতার্থ হয়েছে মহাপৌরুষের আত্মপ্রকাশে। অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন বেনোড বলেছেন,—ঐ হল ক্রিকেটের আদর্শ রূপ, ক্রিকেট সম্বন্ধে ঐ আমার সমস্ত কল্পনার সিদ্ধিরূপ। নেভিল কার্ডাস বলেছেন,—ক্রিকেট বাঁচল সঞ্জীবনী সুরায়। অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ১৯৬০-৬১ সিরিজ শুরু হবার আগে দুই দলের অধিনায়কের কাছে ক্রিকেটের এই মহাকবি ব্যাকুল কণ্ঠে আবেদন জানিয়েছিলেন,—তোমরা ক্রিকেটকে বাঁচাও। টেস্ট ম্যাচকে বাঁচাও! পৃথিবীর সেরা খেলা কবরে ঘুমিয়ে আছে। তোমরা রক্ষা কর তাকে। বেনোড-ওরেল কার্ডাসের আবেদনে উত্তর দিয়েছিলেন জীবনের ভাষায়।

ব্রিসবেন টেস্ট সম্বন্ধে সবচেয়ে সত্য কথা কিন্তু বলেছেন পৃথিবীর সবচেয়ে বঞ্চিত একটি মানুষ। জনৈক অন্ধ ফ্রাঙ্কি ওরেলকে কয়েকটি লাইন লিখে পাঠিয়েছিলেন। ঐ কয়টি লাইনের মধ্যে জীবনরসের একটি সেরা গদ্য-কবিতা রাগে রক্তে ঝলমল ক'রে উঠেছে।

ব্রিসবেন ধন্য হয়েছে ঐ কয়েক লাইনে।

ফ্যামিয়েসন অ্যাভিনিউ।
ফেয়ার লাইট, সিডনি,
ফেব্রুয়ারী ১২

প্রিয় ফ্র্যাঙ্ক,

আমি সিডনির এক অন্ধ অধিবাসী। আমার এবং আমার অনেক অন্ধ সঙ্গীর পক্ষ থেকে আমি তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তুমি এবং তোমার দলের খেলোয়াড়রা বহু ঘণ্টার আনন্দদায়ক ক্রিকেট আমাদের দান করেছ।

ফ্র্যাঙ্ক, বহু বছর ধরে আমি অন্ধ। কিন্তু আমার অন্ধত্বের জন্য আমি একবার মাত্রই দুঃখ পেয়েছি—যখন ব্রিসবেনে গারফিল্ড সোবার্স তাঁর অবিস্মরণীয় ব্যাটিং করছিলেন এবং তার বিবরণ আমি শুনছিলাম। হায়!

যদি তার ব্যাটিং-এর সময়টুকু আমাকে দৃষ্টি ফিরে দেওয়া হত, জীবনের পূর্ণ সন্তোষ তাহলে আমি পেতাম!

আমার কিছু অন্ধ সঙ্গী কানহাইকে তাঁর পূর্ণোচ্ছ্বাসের সময়ে দেখতে চান। অন্যেরা চান ডায়নামিক ওপেনার স্মিথ ও হান্টকে দেখতে। গিবসের বোলিং আমাদের কাছে সদা আলোচনার বস্তু এবং আলেকজাণ্ডার যে সর্বকালের সেরা উইকেটকীপার-ব্যাটসম্যান সে বিষয়ে আমাদের কারোরই কোনো সন্দেহ নেই।

তোমার কুশলী নেতৃত্ব এবং মনোহারী মারের ঝলক শোনার চেয়ে দেখতেই আমাদের ইচ্ছা হয়। যাদের উল্লেখ করেছি, তাদের সঙ্গে থেকে তোমার দলের সকল ছোকরাই এই মরশুমকে স্মরণকালের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-মরশুম ক'রে তুলতে মহান ভূমিকা নিয়েছে।

কথা প্রসঙ্গে জানাই, আমার এক অন্ধ বন্ধু স্বীকার করেছেন যে, বাড়ি ফিরতে কখনো কখনো রাত হলে তাঁর স্ত্রী যে গতিতে জেরা করেন, তার চেয়েও জোরে বল করেন ওয়েস্‌লি হল। বিশ্বাস কর, হলের পক্ষে এটা একটা বিরাট প্রশংসা—আমি আমার বন্ধুর স্ত্রীকে জানি, সে বাস্তবিক জেট বিমানের গতিতে প্রশ্নবর্ষণ ক'রে থাকে।

লক্ষ্য করো, শেষ টেস্ট শেষ হবার দু'দিন পরে এই চিঠি লেখা হয়েছে। কাগজে কলমে অস্ট্রেলিয়া শক্তিশালী দল, কিন্তু আমি বাজি রেখে বলতে পারি, প্রত্যেক যথার্থ ক্রিকেট-প্রেমিক তোমাদের জয়কামনায় অধীর।

আজ এই পর্যন্ত, ফ্র্যাঙ্ক! তোমার ছোকরাগুলিকে তাড়াতাড়ি আবার নিয়ে এসো! তারা ক্রিকেটকে তার ঠিক নিজের জায়গাটিতে পৌঁছে দিয়েছে—পৃথিবীর এক নম্বর খেলার জায়গায়। তাদের ধন্যবাদ।

একান্তই তোমার
লেন হ্যালেট

ফিঙ্গলটনকে আন্তরিক ধন্যবাদ, তিনি এই চিঠিটি সংগ্রহ ক'রে উপহার দিয়েছেন সকলকে।

॥ কারা গ্রেট ॥

ভূমিকা এই পর্যন্ত। আমার দায়িত্ব ঐতিহাসিকের। গ্রেটেস্ট টেস্ট ম্যাচ কোনটি? ব্রিসবেন টেস্টের পূর্ব পর্যন্ত ব্রাডম্যানের কাছে "আমার বিবেচনায় এইটেই একালের শ্রেষ্ঠ টেস্ট ম্যাচ" ছিল যে টেস্ট ম্যাচটি, সেটি খেলা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে লীডসে, ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে। উচ্চাঙ্গের খেলারূপে স্যার ডন আরো কতকগুলি খেলার নাম করেছেন পর্যায়ক্রমে—১৯৩২-৩৩-এ মেলবোর্ন টেস্ট, ১৯৩০-এ লর্ডস, ১৯৩৪-এ নটিংহ্যাম, ১৯৪৭-এ সিডনি, ১৯৪৮-এ লীডস। কিন্তু ১৯৩৮-এর লীডস টেস্ট যে 'অনন্য' সে বিষয়ে স্যার ডনের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

সেই 'আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্টের' বর্ণনা আমি স্যার ডনের রচনা থেকে উপস্থিত করছি! এখানে বলে নেওয়া দরকার, ১৯৩৮ সালের ঐ সিরিজে পূর্ববর্তী তিন টেস্টের মধ্যে প্রথম দুই টেস্ট ইংলণ্ডের প্রাধান্যের সঙ্গে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল। ওল্ড ট্রাফোর্ডে তৃতীয় টেস্টে এমন বৃষ্টি যে, একটি বলও মাঠে পড়েনি। চতুর্থ টেস্টে লীডসে। লীডস অস্ট্রেলিয়ার সৌভাগ্যভূমি।

ব্রাডম্যান লিখেছেন—

যখন লীডসে পৌঁছলাম, তখন আমার মনোভাব, যদি কিছু হয় এখানেই হবে, নচেৎ নয়। এই ইয়র্কশায়ারের মাঠে অস্ট্রেলিয়ান দল ইতি-পূর্বে দুর্দান্তরকম ভালো করেছে, এবং এই স্থান সম্বন্ধে আমার নিজের সুখজনক অভিজ্ঞতা আমাকে আশাবাদী ক'রে তুলল। বড় স্কোরের উপযোগী মনে হল উইকেটকে। কিন্তু ইংলণ্ড প্রথমে ব্যাট করবার অধিকার লাভ করায় দমে গেলেন। তারপর, ভালো বোলিং ছাড়া যার অন্য কোনো বহির্গত কারণ দেখানো যাবে না,—ইংলণ্ডের উইকেট পড়তে শুরু ক'রে তাদের ইনিংস শেষ হল ২২৩ রানে। ওরিলির লাঞ্চ-পূর্ব বোলিং-হিসেব জানাবার

মত,—১৪ ওভার বল, ১১ মেডেন, ৪ রান, ১ উইকেট। ঐ ৪ রানের মধ্যে ২ রান নো বল থেকে হয়েছে। তিনটি ক্যাচ ফসকেছিল তাঁর বল থেকে।

এই রান-সংখ্যার পিছনে ধাওয়া ক'রে আমরাও ঝঞ্ঝাটে পড়লুম, উইকেটের অবস্থার জন্যই নয় শুধু, মাথার উপর তখন বর্ষার ঘন মেঘ। সুনিশ্চিত মনে হল—একেবারে ভেসে যাব।

আমি চিন্তা ক'রে দেখলাম, ভিজে পিচে ভালো আলোর অপেক্ষা শুখনো পিচে ঐ অন্ধকারের মধ্যেও আমরা বেশী রান করতে পারব। তদনুযায়ী আমাদের ব্যাটস্‌ম্যানদের 'আলোর আবেদন' না করতে নির্দেশ দিলুম। অবশ্য ফিল্ডিং-ক্যাপ্টেনের তা করবার অধিকার ছিল। এই অধিকার সাউথ আফ্রিকার এক টেস্ট ম্যাচে একবার প্রয়োগ করা হয়েছিল, কিন্তু সাধারণভাবে ফিল্ডিং-দলের পক্ষে তা করা অস্বাভাবিক, কারণ খারাপ আলোয় তাদেরই সুবিধা। আজকের থেকে বেশী অন্ধকারে আমি কখনো ব্যাট করিনি। একজন প্রেস রিপোর্টার তাঁর সহযোগীকে বলেছিলেন, যদি আমি আলোর আবেদন না করি, তিনিই করবেন, কারণ তাঁর পক্ষে নিজের লেখা দেখা সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না। এমন অন্ধকার যে, গ্র্যাণ্ডস্ট্যাণ্ডে জ্বালানো দেশলাই মাঠের মাঝখান থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল।

আমরা প্রথম ইনিংসে এগিয়ে গেলাম, কিন্তু ব্যবধান সামান্য।

তারপর বিশালকায় বিল ওরিলি 'ভয়ঙ্করতম শত্রুতায় শ্রেষ্ঠ' যে-বোলিং শুরু করলেন, তা তাঁর পক্ষেই করা সম্ভব। ফ্লিটউড স্মিথ তাঁর সহযোগিতা করলেন যোগ্যভাবে।

এখনো আমি চোখের সামনে ছবির মত দেখতে পাচ্ছি সেই অসম্ভব বলটিকে, যা হার্ডস্টাফকে হতভম্ব ক'রে তাঁর উইকেট ভেঙে দিল, এবং ঠিক তার পরের বলটি,—যার থেকে সর্ট লেগে হ্যামণ্ডের দেওয়া নীচু ক্যাচ এক হাতে ছোঁ মেরে ধরে নিলেন ব্রাউন।

স্পিন নিচ্ছে অথচ অসম্ভবভাবে কঠিন নয় এমন উইকেটে ইংলণ্ড সংগ্রহ করল মাত্র ১২৩ রান। মনে হল খেলার ফলাফল স্থির হয়ে গেছে, কিন্তু কোথায়,—অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসের উইকেট পড়তে শুরু করল,—মাথার উপরে বৃষ্টিঘন মেঘ জমতে শুরু করেছে তখন।

ঝড় বৃষ্টির আশঙ্কা ক'রে আমি আমার ছোকরাদের বললুম, যত তাড়াতাড়ি পার রান কর। উইকেট ধ্বসে পড়তে লাগল। খেলাটি এমন

উত্তেজনাসংকুল হয়ে উঠল যে, আমি আমার জীবনে সেই প্রথম খেলা দেখা সহ্য করতে পারলুম না। এদিকে আমাদের ড্রেসিংরুমের দৃশ্য বোধহয় কল্পনা করাও যাবে না। প্যাডপরা ওরিলি ঘরের মাঝখানকার টেবিলের একদিকে এপাশ থেকে ওপাশে পায়চারি করছেন; আর সর্বক্ষণ আশা ও প্রার্থনা করছেন, হে ঈশ্বর, আমাকে যেন মাঠে যেতে না হয়। টেবিলের অপর পাশে আমিও তাই করছি, আর দাঁতের ঠক্‌ঠকানি থামাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে জ্যাম লাগানো রুটি চিবুচ্ছি এবং কাপ কাপ চা গিলছি। সহযোগী খেলোয়াড়েরা ধারা-বিবরণী শুনিয়ে যাচ্ছে—তাতেই জানছি সব।

আমাদের ম্যানেজারের অবস্থা আরো শোচনীয়। তিনি ড্রেসিংরুমেও টিকতে পারলেন না, বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন, কিন্তু সেখানেও টিকেট-না-পাওয়া হাজার হাজার লোক লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

এ এমন এক ধরনের ক্রিকেট যাতে দর্শকের শিরায় রক্তের গতি বেড়ে যায়। খেলা থেকে কেউ এক মুহূর্তের জন্যও চোখ সরাতে পারছে না, যদি তারই মধ্যে চাঞ্চল্যকর কিছু ফসকে যায়।

সেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট পরিবেশের মধ্যে হ্যাসেট ঘটনার গতি নির্ধারণ ক'রে দিলেন। ঐ অবিচলিত ভিক্টোরীয় পতঙ্গটি, সংকটে যিনি সর্বসময় সুযোগ্য খেলোয়াড়, তুলে তুলে ড্রাইভ করতে লাগলেন; প্রকৃতিকে পরাভূত করবার প্রয়াসরূপে তাঁর মায়ের শাসানি ছুটতে লাগল সবত্র।

সুমহান জয়গৌরব আয়ত্ত হল। রাবার হারাবার আর সম্ভাবনা নেই। আরো বড় কথা এই, আমার একান্ত বিশ্বাস, আমরা আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্টম্যাচ দেখলাম (অথবা শুনলাম)।

স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান তাঁর দাবি প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছেন। তিনি স্বীকার করেছেন সানন্দে,—ব্রিসবেন টেস্টই 'গ্রেটেস্ট টেস্ট ম্যাচ'। নিজের ক্ষতির বিনিময়েই তাঁর এই স্বীকারোক্তি। পূর্ববর্তী 'আধুনিক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ টেস্ট ম্যাচে'—ঐ ১৯৩৮-এর লর্ডস্ টেস্টে —তিনি ছিলেন অংশগ্রহণকারী অধিনায়ক। তা সত্ত্বেও ব্রাডম্যান যে, ব্রিসবেন টেস্টকে মহাসম্মান দিয়েছেন, সে তাঁর সত্যবোধ ও উদারতার পরিচয়, যে-কোনো গ্রেট ক্রিকেটারের যা আছে।

অবশ্য স্যার ডন গর্ব ক'রে বলতে পারেন, খেলোয়াড়রূপে না

হোন, তিনি যখন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি, তখনি ঐ 'যে-কোনো খেলার প্রধান ঘটনাটি' ঘটেছিল।

ইংলণ্ড কিন্তু মনেপ্রাণে ব্রিসবেন টেস্টকে 'গ্রেটেস্ট টেস্ট ম্যাচ' বলতে দ্বিধা করবে। একটি বিশেষ খেলাকে সে এতদিন বলে এসেছে 'গ্রেটেস্ট'। তার ক্রিকেটের মহান ঐতিহ্য সেই খেলাটির সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। ১৮৮২ সালের ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়ার একটি টেস্ট ম্যাচ সেই মহাগৌরবের অবিসংবাদিত অধিকারী। সে খেলায় ইংলণ্ড যদিও পরাজিতপক্ষ, তবু সংশ্লিষ্ট দল। ঐ খেলাটিতে ইংলণ্ডের পরাজয় থেকে 'এসেজ' প্রতিযোগিতার উদ্ভব। সে খেলায় ইংলণ্ড তার একজন সেরা দর্শককে হারিয়েছিল চিরদিনের জন্য; দর্শকটি উত্তেজনায় মাঠের মধ্যে মূর্ছিত হয়ে পড়েন; পরে মূর্ছা থেকে মৃত্যুতে উপনীত হয়ে ক্রিকেটের প্রতি চরম ভালোবাসার অমর প্রমাণ দিয়ে যান।

ক্রিকেটের মাতৃভূমিতে ইতিহাসের সেরা খেলা হবে না, এটা বিস্ময়ের ও বেদনার। ইংলণ্ড পরাজিত হয়েও ১৮৮২ সালের খেলাটিকে গ্রেটেস্ট বলে আঁকড়েছিল এবং ইংলণ্ডের ক্রিকেট-সাহিত্য ঐ মহাসমরের মহাকাব্য বহু বিচ্ছিন্ন গাথায় রচনা ক'রে এসেছে। অস্ট্রেলিয়া অর্বাচীন দেশ। এতদিন সে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলাকেই প্রধানতমের মর্যাদা দিয়ে এসেছে। এখন সে নূতনের প্রতি আকর্ষণ বোধ করছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সঙ্গে খেলাকে তুলে আনছে ঐ স্তরে। অবশ্য '১৮৮২' বা '১৯৬০'—যে টেস্ট ম্যাচই 'গ্রেটেস্ট' হোক, অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি নেই, কারণ ঐ দুই খেলাতেই অস্ট্রেলিয়া হাজির—এবং বিজয়ী দলরূপে।

১৯৬১ সালে ওল্ড ট্রাফোর্ডে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টকেও 'অন্যতম শ্রেষ্ঠ টেস্ট ম্যাচ' বলা হয়েছে। এই টেস্টেও অস্ট্রেলিয়ার জয়।

কিন্তু ইংলণ্ড—তার ক্রিকেট—১৮৮২ সালের একটি টেস্ট ম্যাচের 'ভস্ম'-টীকা ললাটে নিয়ে এখনো খেলার তপস্যা ক'রে যাচ্ছে।

১৮৮২ সালে সেই 'গ্রেটেস্ট ম্যাচটির' বর্ণনা উদ্ধৃত করছি ক্রিকেটের সেরা কবির রচনা থেকে। ১৯২১ সালের বসন্তকালের

কোনো এক মধ্যাহ্নে নেভিল কার্ডাস ঐতিহাসিক তথ্যের পাখায় ভর ক'রে ভেসে গিয়েছিলেন ১৮৮২ সালের ওভাল মাঠে,—একটি সুবিখ্যাত রচনার জন্ম হয়েছিল তার ফলে। এই সেই রচনা—

……আমি চারিদিকে তাকালাম। বেশ বড় একটি দর্শকদলের মধ্যে আমি ব'সে আছি। আমার সামনে বসে একজন পাদরী। তিনি 'টাইমস্' পড়ছিলেন। আমার পাশে যিনি বসেছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'মশায়, গতকাল আপনি কোথায় ছিলেন?' আমি উত্তর দেবার আগেই তিনি যোগ ক'রে দিলেন—'গতকাল খেলাটি বেশ হয়েছে, কি বলেন? মর্নিং পোস্ট-এ তার চমৎকার বিবরণ বেরিয়েছে, বোধহয় দেখেছেন।' এই বলে তিনি মর্নিং পোস্ট এগিয়ে দিলেন। ধন্যবাদ দিয়ে সেটা হাতে নিলাম। ১৮৮২ সালের ২৯শে অগস্টের কাগজ। 'ইংলণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া' শিরোনামার তলায় লেখা আছে, আমি পড়লাম,—গতকাল অস্ট্রেলিয়া বার্লো এবং পীট-এর বোলিংয়ে ৬৩ রানে নেমে গেছে এবং এ. এ. হর্নবি'র অধিনায়কত্বে ইংলণ্ড তার উত্তরে করেছে ১০১। আমি বুঝলাম আমি এখন কেনিংটন ওভাল মাঠে……নবম টেস্ট ম্যাচের দ্বিতীয় দিনের দর্শক এখন আমি…যে খেলাটি টেস্ট ম্যাচরূপে সর্বাধিক খ্যাতিলাভ করবে।

কোনো কথা না বলে সঙ্গীকে মর্নিং পোস্টটি ফিরিয়ে দিলাম। 'গতকাল খেলাটি বেশ হয়েছে, তা ঠিক—সামনের বেঞ্চের পাদরী বললেন,—'কিন্তু ইংলণ্ডের আরও বেশী রান করা উচিত ছিল। আমাদের ব্যাটিং সুস্পষ্টভাবে মাঝারি ধরনের, বলতে গেলে অস্ট্রেলিয়ার মতই খারাপ।' এক উচ্চ চীৎকারের শব্দ তাঁর কথা ডুবিয়ে দিল। প্যাভিলিয়নের সিঁড়ি দিয়ে লাইন ধরে ইংলণ্ড-একাদশ হর্নবিকে সামনে নিয়ে মাঠে নামছে। হর্নবির সঙ্গে ডবলিউ জি গ্রেস,—তিনি যখন হেলেদুলে মাঠের উপর দিয়ে চললেন, বাতাস এসে তাঁর বিরাট কালো দাড়ি দুলিয়ে দিয়ে গেল। তিনি হর্নবির সঙ্গে উচ্চগ্রামে কথা বলছিলেন এবং হাসছিলেন। তারপর তিনি তাঁর ঠিক পিছনকার এক দীর্ঘ সুছাঁদ চেহারার খেলোয়াড়ের দিকে বলটি ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচালেন,—'ওহে বান্নী, লোফো দিকি!' গ্রেস ও হর্নবিকে অনুসরণ ক'রে আসছিলেন লুকাস, সি টি স্টাড, জে এম রীড, দি অনারেবল্ এ লীটলটন্, উলীয়েট, বার্লো, ডবলিউ বার্নস, এ জিষ্টীল, এবং পীট। দর্শকেরা শান্ত হয়ে প্রথম দুই ব্যাটসম্যানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল, এবং আমি আবার

পাদরীর গলা শুনতে পেলাম,—'……ইংলণ্ডের রানসংখ্যা দুঃখজনকভাবে অল্প। ইংলণ্ড একাদশের পক্ষ থেকে এমন নিম্নশ্রেণীর ব্যাটিং দেখেছি কিনা সন্দেহ। মশায়, ব্যাপার হল কি জানেন, কিছুদিন থেকে ইংলিশ ক্রিকেট নেমে যাচ্ছে। আমাদের ব্যাটস্‌ম্যানেরা আগের মত জোরে পিটিয়ে খেলে না, এবং আমাদের বোলিং পর্যন্ত……', আর একটি উল্লাসধ্বনি তাঁর ভাষণকে ডুবিয়ে দিল। 'ব্যানারম্যান ও ম্যাসী', আমার সঙ্গী বললেন,—'মনে হয় ব্যানারম্যান মাঠের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়।' পাদরী অবিলম্বে সংশোধন ক'রে বললেন—'না, আমার ধারণা, এস পি জোনস্, যিনি এই মাসের গোড়ায় একুশে পা দিয়েছেন, তিনি দু'দলের মধ্যে কনিষ্ঠতম। ব্যানারম্যান অন্তত ২৩ বছরের এবং গিফিন, ব্যানারম্যানে চেয়ে ৬ দিনের ছোট।' আমার সঙ্গী এই কথায় চুপ ক'রে গেলেন, আমি প্রশ্ন করবার চেষ্টা করলুম,—'স্পফোর্থের বয়স কত?' পাদরী কাছ থেকে দ্রুত উত্তর এল,—'আগামী মাসের ৯ তারিখে সাতাশ বছর।'

ব্যানারম্যানের বিরুদ্ধে বার্লো ইংলণ্ড-পক্ষে বোলিং শুরু করতে দর্শকেরা, পাদরীসুদ্ধ, বাচ্চা ইঁদুরটির মত চুপ ক'রে গেল। উইকেটের পিছনে লীটল্‌টন হুমড়ি খেয়ে রইলেন। ঠিক সওয়া বারটা। পরবর্তী আধ ঘণ্টাকে এই দিনের প্রচণ্ড প্রস্তাবনা বলা চলে। ব্যানারম্যান মূর্তিমান সতর্কতা, অন্যদিকে ম্যাসী টেস্ট ক্রিকেটের মহান ইনিংস খেলে যাচ্ছেন। সামান্য আলগা বলেও তিনি ব্যাট চালাচ্ছেন প্রচণ্ডভাবে, এবং তাঁর মার বাউণ্ডারীতে গিয়ে সশব্দে আঘাত করছে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি ঔদ্ধত্য ও আঘাতের জীবন্ত মূর্তি, মাঠের চারদিকে তাঁর জ্বলন্ত আহ্বান ছোটাছুটি করতে লাগল। বার্লোর বলে ম্যাসী একটি প্রচণ্ড ড্রাইভ করার পরে আমার সঙ্গী বিড়বিড় ক'রে বললেন, 'ওভালে এর থেকে বড় মার আমি দেখিনি।' পাদরী তাঁর কথা শুনে ফেললেন। '১৮৭৮-তে যখন অস্ট্রেলিয়ানরা এখানে এসেছিল', পাদরী বললেন, 'সারের খেলোয়াড় ডবলিই এইচ গেম, স্পফোর্থের একটি বলকে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিলেন।' তবু তিনিও স্বীকার করলেন এই ম্যাসী লোকটা বেশ কড়াভাবেই বল পেটায়। আধ ঘণ্টার মধ্যে ইংলণ্ডের ৩৮ রানের ব্যবধান দূর হয়ে গেল। হর্নবি বোলারের পর বোলারকে ডাক দিলেন, বার্লোর বদলে স্টাড, স্টাডের বদলে বার্নস। ৫৬ রানের মাথায় স্টীল যখন চেষ্টাচরিত্র করতে এলেন, তখন ৪৫ মিনিটের কম সময়ের মধ্যে ৬ জন বোলার বলে হাত লাগিয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার যখন ৪৭ রান, ম্যাসী

লও অনের দিকে উঁচু ক'রে একটি বল পাঠালেন। 'লুকাস ওখানে আছে', পাদরী বললেন, 'সে নিশ্চয় বলটা ঠি—ক—হে—ভগবান—!' লুকাস বলটি ফেলে দিয়েছেন। জনতা বুক ফেটে আর্তনাদ করল, টকটকে লাল হয়ে উঠলেন লুকাস।

'বিনা উইকেটে ৬৬', আমার পাশের লোকটি বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, 'সব কটি উইকেট হাতে নিয়ে ওরা ২৮ রান এগিয়ে আছে। যদি ম্যাসী টিকে থাকে তাহলে—আঃ বাহবা! বাহবা! চমৎকার বল! বাঃ বাঃ! স্টীলের একটি বল ম্যাসীকে প্রলুব্ধ করেছিল, মারবার জন্য লাফ দিয়ে এগোতেই তা বাঁক নিয়ে উইকেট ভেঙে দিয়েছে। ম্যাসী প্রশংসমান অথচ স্বস্তিযুক্ত জনতার কোলাহলের মধ্যে প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরে চললেন। তাঁর ইনিংস অস্ট্রেলিয়াকে ৫৫ রানের সম্পদ দিয়েছে; এক ঘণ্টারও কম সময়ে তিনি ৬৬ রানের মধ্যে ৫৫ করেছেন।

বনর এলেন তারপর। দূরবর্তী ইংরেজ ফিল্ডাররা আরো দূরে ছড়িয়ে পড়ল নানা অনুমানমূলক আশঙ্কায়। ম্যাসীর দৃষ্টান্ত কি এই দাড়িওয়ালা দৈত্যটিকে ক্ষ্যাপা ঘোড়সওয়ার ক'রে তুলবে না? কিন্তু হর্নবির একটা প্রেরণা এসে গেল। তিনি স্টীলের বদলে উলীয়েটকে ডাক দিলেন। উলীয়েট ঢেউয়ের উপর ঝাঁপ দেবার ভঙ্গিতে উইকেটের দিকে দৌড়ে এসে তাঁর ইয়র্কশায়ারীয় শক্তির শেষ তলানিটুকু পর্যন্ত বলের বক্ষে যোগ ক'রে দিয়ে যেটিকে ছাড়লেন, তার ধাক্কায় বনরের মাঝকাটি শূন্যে উড়ে গেল। এই মহাকার্যের অনুমোদনে জনতা যে বিশাল নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল, তাকে আবার বুকে টেনে নিচ্ছে, এমন সময় ব্যানারম্যান একস্ট্রা মিড-অফে ধরা পড়লেন স্টাডের হাতে। ১৩ রানের জন্য ৭০ মিনিট ব্যাট করেছেন ব্যানারম্যান। 'ওর পক্ষে খুব দ্রুত কাজ',—বললেন পাদরী মহাশয়। ব্যানারম্যানের চওড়া ব্যাট সরে যাবার পর থেকে ইংরেজ বোলাররা আলো দেখতে শুরু করলেন। পীটের বাঁ হাতের ধীর বলগুলো বাঁধা সুতোর মাপে চমৎকার স্পিন নিতে লাগল। মার্ডককে বাদ দিলে, বাকি অস্ট্রেলিয়ানরা খাবি খেতে লাগল। ৭৫-তে পড়ল চতুর্থ উইকেট, ৭৯-তে পঞ্চম। ১২২ রানে সব শেষ। 'মাত্র ৮৫ রান দরকার, জয়ের জন্য',—পাদরী বললেন,—'এখন খেলাটি আমাদের হাতে, যদিও লুকাস তাকে ছুঁড়ে দিতে যথেষ্ট করেছে।'

যথার্থ এক শারদীয় অপরাহ্ণ, ধূসর আলোয় মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে ক্রমে,

—ডবলিউ জি এবং হর্নবি চললেন উইকেটের দিকে—স্পফোর্থ ও গ্যারাটের বিরুদ্ধে। দর্শকে পূর্ণ মাঠ, কিন্তু এত নিস্তব্ধ যে, যখন গ্রেস গার্ড নিচ্ছেন, তখন ভক্সহল রোডের উপর দিয়ে ক্রমে-নিকটে-আসা হ্যানসম গাড়ীর টিক্ টিক্ শব্দ পর্যন্ত সকলে শুনতে পেল। স্পফোর্থের প্রথম ওভার বেশ দ্রুত,—চকিতে লাফ দিয়ে, ছাড়বার মুখে হাত ঝুলিয়ে তিনি বল ছুঁড়তে লাগলেন। গ্রেসের ব্যাটিং-এর সময় ব্ল্যাকহ্যাম পেছিয়ে দাঁড়ালেন, কিন্তু হর্নবির ব্যাটিংয়ের সময়ে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলেন হর্নবির পিছনে। 'চমৎকার উইকেট-রক্ষা', আমার সঙ্গী বিড়বিড় করলেন। 'পিণ্ডার কম নিপুণ নয়', পাদরী বললেন। তিনি আরো যোগ ক'রে দিলেন, 'স্পফোর্থকে কিছুদিন থেকে আমি আজকের মত জোরে বল করতে দেখিনি। ইদানীং সে নানারকম মিডিয়াম-পেস বোলিংই অভ্যাস করছে।' হর্নবি ও গ্রেস দুজনেই বেশ প্রত্যয়ের সঙ্গে শুরু করলেন। আবহাওয়া লঘু হয়ে গেল অল্পক্ষণেই। হর্নবি স্পফোর্থের বলে চমৎকার কাট করলেন ও মনোরম এক লেগের মারে দু'রান নিলেন।

ইংলণ্ডের ১৫ রানের মাথায় স্পফোর্থ উপড়ে দিলেন হর্নবির স্টাম্প। ঠিক পরের বলে সোজা বোল্ড ক'রে দিলেন বার্লোকে। জনতা শঙ্কায় শিউরে উঠলেও কড়া চেহারার জর্জ উলীয়েটের আবির্ভাবে আবার তারা আশ্বাস বোধ করল। বিশেষত যখন গ্রেস নবাগতকে অভ্যর্থনা জানাতে গ্যারাটের বলে চমৎকার এক লেগের মারে তিন রান এবং স্পফোর্থের বলে অন-ড্রাইভের বাউণ্ডারীতে চার রান নিলেন। '৩০ উঠে গেছে', আমার সঙ্গী বললেন, 'আর মাত্র ৫৫ করতে হবে।' ইংলণ্ড দু' উইকেটে ৩০,—স্পফোর্থ দিক পরিবর্তন ক'রে প্যাভিলিয়ন-প্রান্তে গেলেন। এখন তাঁর হাতের পিছন দিকে বসে তাঁর অপূর্ব ব্রেক-ব্যাক-এর রূপ দেখতে পেলাম। এই সময় তিনি প্রধানত মিডিয়াম পেস বল করছিলেন। প্রতিটি অফ-ব্রেক দেবার সময়, আমি দেখলাম, তাঁর ডান হাত ঘুরে বাঁ দিকে নামবার মুখে বলের তলায় শেষ 'টান' দিয়ে দিচ্ছে। কখনো তাঁর হাত সোজা উঠে সোজা নামছে নামার ঝোঁক সঙ্গে নিয়ে,—তখন ব্যাটস্‌ম্যানকে ভয়ঙ্কর টপ্‌স্পিন সামলাতে হচ্ছে। তাঁর হাবভাবে এখন বিদ্বেষের ছায়া। চেহারাটা যেন আরো দীর্ঘ, আধ ঘণ্টা আগেও যা ছিল না, ডান হাত আরো বাঁকানো। উত্তেজনার লক্ষণ নেই তাঁর মধ্যে, পাদরী বললেন,—'শীতল রক্ত।' তা সত্ত্বেও উলীয়েট বীরের মত তাঁর প্রতিরোধ করলেন, অন্যদিকে অপর প্রান্তের গ্রেস বারে বারে ক্রীজ থেকে

ভারি বাঁ-পা বাড়িয়ে বল ঠেলে দিয়ে প্রয়োজনসাধন করতে লাগলেন। 'পঞ্চাশ উঠে গেছে', আমার সঙ্গী বললেন,—'দুই উইকেটের বিনিময়ে; আর কিছু অন্যথা হবে না, আমাদের জিতবার জন্য মাত্র ৩৪ রান দরকার।' ৫১ রানের মাথায় স্পফোর্থ উলীয়েটকে একটা অত্যন্ত দ্রুত বল দিলেন। উলীয়েট 'স্নিক' করেছেন কি করেন নি, তাতেই কাজ হয়ে গেল, ব্ল্যাকহ্যাম তাতেই ক্যাচ ধরে চড়া গলায় চড়ে উঠে হাঁক পাড়লেন,—'হাউজাট্'! লুকাস এলেন। আরও দু' রানের পরে ডবলিউ জি মিড-অফে কট। 'কী মার!'—পাদরী বললেন, 'সে গ্রেস কোথায়!' ৫৩ রানে চার। এখন লীটল্‌টন ও লুকাস। লীটল্‌টন অনেক ভরসায় হাঁকড়াতে লাগলেন, কিন্তু টান ক'রে বাঁধা জালের মত ফিল্ডিং। আমরা সকলে সহসা বুঝলুম, পাল্লার দু'দিক সমান-সমান। 'নিশ্চয় উইকেট খারাপ', কে একজন বলল।

পাথর গাঁথতে লাগলেন লুকাস। স্পফোর্থ মেডেন পেলেন। মেডেন হল বয়লির বলেও। স্পফোর্থের বলে আবার মেডেন। আবহাওয়া ঘনীভূত। 'দোহাই রান কর কিংবা ভেগে পড়',—একজনের গলা শোনা গেল। ফিল্ডাররা উইকেটের দিকে ক্রমেই গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। অস্বস্তিকর একটা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মত স্পফোর্থ ও বয়লি,—বোলিং বোলিং বোলিং—বোলিং চলছেই।··· পর পর ৬টি মেডেন। 'এ অসহ্য, একেবারে অসহ্য!' বললেন পাদরী। একটা ভদ্ররকম বাউণ্ডারীর জন্য সকলের প্রাণ আঁকুপাঁকু করছে।··· বোলিং-মনুষ্য-যন্ত্র-দু'টি আরো ৫টি মেডেন পর পর ছাড়ল। ভাবুন একবার, পর পর বারটি মেডেন, খেলার ঐ অবস্থায়, দর্শক যখন প্রেতলোকে। 'গ্রেস যখন ১৮ বছরের ছোকরা, তখন এই মাঠেই তাকে পঞ্চাশ করতে দেখেছি,—সে তখন প্রত্যেকটি বল খেলেছিল',—সেই পাদরীই আবার বললেন, কিন্তু তাঁর গলা কিছু ক্লিষ্ট, বেশ অসুখী তিনি। ক্রমান্বয়ে ১২টি মেডেনের পর একটি মার ধরায় ইচ্ছে ক'রে ভুল করা হল, যাতে স্পফোর্থ লীটল্‌টনকে একবার নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। ব্যাটস্‌ম্যানেরা ধরা পড়ল সেই ফাঁদে। আরো চারটি মেডেন। তারপর লীটল্‌টনের উইকেট গেল এক বাঁকা বলে। 'যা হোক একটা কিছু হল—ব্যাপারটার শেষ!' কৃতজ্ঞ দর্শক নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। এই মরণযন্ত্রণা দেখার চেয়ে মরা দেখাও ভাল। ইংলণ্ড ৫-৬৬, ১৯ রান দরকার। স্টীল এলেন, লুকাস একটি বাউণ্ডারী মারলেন। 'বাহবা!' জনতা ফেটে পড়ল, তারপরেই দমবন্ধ,— স্টীল বিনা রানে স্পফোর্থের হাতে কট এণ্ড বোল্ড,—পরের বলে মরিস রীড সোজা বোল্ড। ইংলণ্ড ৭-৭০।

'অবিশ্বাস্য!' ২০,০০০ দর্শকের গলায় একস্বরে নিরানন্দ কাতরোক্তি। বার্নস, পরবর্তী ব্যক্তি, দু'রান করলেন। ১৩ রান হলেই জয়। ঈশ্বর সহায়! উইকেটকীপার ব্ল্যাকহ্যামের বিভ্রান্তি! তাঁর হাত ফস্কে তিনটি বাই রান। বার্নস—ছোটো ছোটো! লুকাস দৌড়ও! দর্শকে কোলাহল করছে, স্পফোর্থ অবিচলিত, দুর্জ্ঞেয়। তাঁর পরবর্তী বল এত দ্রুত যে, বাউণ্ডারীর ধার থেকে চোখে দেখাই গেল না। লুকাস সেই বলেই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় এগিয়ে গেলেন—এবং হায়! বলটি টুক ক'রে উইকেট থেকে বেলটিকে সরিয়ে দিয়ে চলে গেল! হতভাগ্য লুকাস, মাথা নামিয়ে চলে গেলেন ধীরে, একটা মহা অমঙ্গল ছড়িয়ে পড়ল দর্শকদের মধ্যে, বেড়ে উঠল ক্রমান্বয়ে, বাইরের কেনিংটন রোডের ক্রম-ঘনীভূত অন্ধকারের সঙ্গে। ইংলণ্ডের আকাশে অশুভ তারকা—আমাদের ক্রিকেটাররা নিজের মাঠে এই প্রথম বিজয়ী অস্ট্রেলিয়ানদের দেখতে পাবে বোধ হয়। দশ রানের লড়াইয়ের মুখে ব্যাকহ্যাম বার্নসকে গ্লাভ্‌সে পাকড়ালেন। শেষ ব্যক্তি এসে গেছে, হতভাগ্য পীট! সে ইংলণ্ডের সেরা ধীর বোলার, কিন্তু তার বেশী একচুল ক্রিকেট জানে না, তার রহস্যময় স্পিন কোন্ কাজ দেবে এখন? তবে স্টাড এখনো টিকে আছে; আর মাত্র দশ রান, তাহলেই খেলাটি আমাদের। বোধহয় সে—পীট পিটিয়ে করেছে ২ রান! ঔদ্ধত্য বটে, তবে মনে হয়, নিরাপদে মারবার মতই ছিল বলটা! খারাপ বল হল খারাপ বল—যে কোনো সময়েই। পীটের তেজ আছে (মরিয়া হয়ে নিজেদের বোঝাতে চাইলাম), সে ঠিক খেলবে, ঠিক খেলবার লোক সে, ভাল বলে খাড়া থেকে সে স্টাডকে বাকি কাজ করতে দেবে……। কিন্তু নগ্ন বাস্তব এই,—পীট আবার বয়লির একটি ধীর বলে পাগলের মত ব্যাট চালালো, ফসকালো, এবং—বোল্ড! উইকেট বেঁকে যেতে একটা শুকনো হাসি উঠল, কিন্তু কোথা থেকে, সেটা এ পৃথিবীর কিংবা নরকের, তা আমি বলতে পারব না। স্টাড একটা বলও খেলতে পেলেন না। 'বাহবা, চমৎকার! ঠেঙাতে গেলে কি বলে? বলটাকে শুধু আটকালে না কেন?'—পীটের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সকলে জিজ্ঞাসা করল। 'তা হাঁ,—আমি মিষ্টার স্টাডের উপর বিশ্বাস করতে পারিনি' পীটের উত্তর। [স্টাড একজন সেরা ব্যাটস্‌ম্যান এবং মহান বোলার পীট ব্যাট ধরতেও জানেন কিনা সন্দেহ।]

পীটের উইকেট ভেঙে যেতে দশ হাজার লোক বেড়া টপকে সবুজ মাঠ ছেয়ে ফেলল। স্পফোর্থকে কাঁধে চড়িয়ে প্যাভিলিয়নে আনা হল, সেখানে জনতা জয়ধ্বনি দিল খ্যাতিশীর্ষ ব্যক্তিটির।…'

পুরানো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ টেস্ট ম্যাচটির বর্ণনা উদ্ধৃত করলাম। ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে এ বর্ণনা লিখেছেন নেভিল কার্ডাস। লিখেছেন অনেকদিন পরে। তখন বর্তমান হয়ে গেছে ইতিহাসের সামগ্রী। তখন তথ্যের সঙ্গে মিশে গেছে স্বপ্ন। স্বপ্নের শেষে বিষাদের গোধূলি আলোয় ছেয়ে গেল তাঁর মন, মৃদু কুয়াশায় আচ্ছন্ন চেতনা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারণ করল,—সেই মহান খেলা, মহান দিন, মানুষ, সব গেছে, অনেক দূরে চলে গেছে—গৌরবের দিনান্ত—হায়, আর ফিরবে না।

আমিও আমার রোমান্সের মনকে ছেড়ে দেব ১৮৮২ সালের ঐ টেস্ট ম্যাচটিকে ভালোবাসতে। ক্রিকেটের আদি পৃথিবীতে সেই আমার স্বপ্নপ্রয়াণ। কিন্তু আমার আরো একটি মন আছে, আমার একালের জীবনবোধ, যে মগ্ন থাকবে ১৯৬০ সালের ব্রিসবেন টেস্ট নিয়ে। ১৮৮২ সালে ছিল এক পক্ষের জয়, অন্য পক্ষের পরাজয়। ছিল এক পক্ষে পরাজিতের গ্লানি ও সেই প্রতিক্রিয়ায় প্রতিপক্ষের প্রশংসা। ঐ টেস্ট ম্যাচ থেকেই ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে 'ছাইভস্ম' প্রতিযোগিতার উদ্ভব।* দু'দেশের মধ্যে অতি তিক্ত

---

*১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ঐ টেস্টে পরাজয়ের পরে Sporting Times-এ নিম্নলিখিত সংবাদটি ছাপা হয়েছিল—

In Affectionate Remembrance

of

ENGLISH CRICKET

which died at The Oval

On

29th August 1882.

Deeply lamented by a large circle of Sorrowing Friends and Acquaintances

R. I. P.

N. B. The body will be cremated and the Ashes taken to Australia

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা। ১৯৬০ সালের ব্রিসবেন টেস্ট কাউকে হারায়নি। টেস্ট ম্যাচে যা কখনো হয়নি তাই হয়েছে,—দু'পক্ষ নিঃশেষ হবার পরে দেখা গেল, দু'জনেই সমান সমান। 'ড্র' নয়,—'টাই'। ১৮৮২ টেস্ট থেকে এসেছে 'এসেজ' প্রতিযোগিতা, ১৯৬০-এর টেস্টও আর এক প্রতিযোগিতার জনক,—যার উদ্দেশ্য জয়-পরাজয় নয়,—খেলা। এই খেলার প্রতিযোগিতায় জিতলে পাওয়া যাবে 'ওরেল কাপ,'—খেলার এক সেরা বীণাবাদকের নামে নির্মিত। কেবল তাই নয়, ওরেল-কাপ আরো বড় সংবাদ এনেছে। ঐ কাপের পালিশের উপর যে হাসি মুখটি ফুটে আছে, তার রঙ কালো। রঙটি কালো হলেও হাসটি সাদা। কালো রঙ ও সাদা হাসির মূল্য স্বীকার করেছে অস্ট্রেলিয়া—অস্ট্রেলিয়াই ওরেল-কাপের প্রস্তাবক।

খেলারূপে ব্রিসবেন টেস্ট 'সর্বশ্রেষ্ঠ' কিনা তা পাঠক ধরতে পারবেন ব্রিসবেন টেস্টের বর্ণনা পড়বার সময়ে। এখনকার মত স্মরণ রাখুন--গৌরবে ও আনন্দে স্মরণ রাখুন যে, ঐ টেস্ট ম্যাচ ক্রিকেটে নতুন জীবন-দর্শনের সূচনা করেছে।

কেবল ব্রিসবেন টেস্টে নয়, ১৯৬০-৬১ সালের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া মরশুম (যাকে বলা হয়েছে 'ওরেল-বেনোড বসন্ত') স্বীকৃত হয়েছে ক্রিকেটের সর্বশ্রেষ্ঠ ঋতু বলে। এই ঋতুতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোকিল হার মেনেছিল অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারুর কাছে। কিন্তু কোকিলের চির জয়, কারণ তার আছে সুর, যা নীরব হলেও তার রেশে শিউরে তোলে মনের গভীরকে। ব্রিসবেনে প্রথম টেস্ট 'টাই' হবার পরে মেলবোর্ন দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতল ৭ উইকেটে; সিডনিতে তৃতীয় টেস্টে সে জয় ফিরিয়ে নিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, জিতল ২২৩ রানে, এডিলেডে চতুর্থ টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পরাজয় এড়াল ম্যাকে ক্লাইন ও আম্পায়ারের চেষ্টায়, এবং মেলবোর্নে পঞ্চম টেস্টে শেষ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়া জিতল দু' উইকেটে, যার জন্য অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুর্ভাগ্য উভয়ই দায়ী—অস্ট্রেলিয়ান দর্শকেরা পরাজিত ওয়েস্ট-ইণ্ডিজের জয়ধ্বনিতে সেই কথাই ঘোষণা করল।

পরাজিতের এতবড় সম্মান আর কোথায় হয়েছে পৃথিবীতে, কোন্ পরাজিত পক্ষ এমন অপরাজেয় মহিমা পেয়েছে এ পর্যন্ত? পৃথিবীর এই অভিনব যুদ্ধপর্বে মানুষ বিজয়ের চেয়ে অনেক বড় আসন দিল বীরত্বকে। ক্লাসিকস্ হয়ে আছে পুরুর প্রতি আলেকজাণ্ডারের মহানুভবতা। ওরেলের প্রতি বেনোডের সেই একই উদারতা। এটাকে উদারতার অতিসম্মানই বা দিই কেন, এই হল ক্রিকেটের স্বরূপ, এখানে রেকর্ডবুকের পাতায় অক্ষরের চেয়ে স্বাক্ষরের মর্যাদা বেশী। ১৯৬০-৬১ সালের রেকর্ড বুকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ স্বাক্ষর করেছে মুঠিধরা কলমে ও ঘনতম কালিতে, কালের সঙ্গে স্পর্ধা ক'রে বাঁচবার অধিকার যার আছে।

এই সিরিজ সম্বন্ধে সবিস্ময়ে লিখলেন নেভিল কার্ডাস—

কয়েক মাস আগেও টেস্ট ম্যাচের নাম শুনলে গায়ে এমন কাঁপুনি আসত যে, বুঝি দাঁতকপাটি লেগে যায়।

কে এটাকে সম্ভবপর বলে বিশ্বাস করবে,—একই রবারের মধ্যে একটি টেস্ট 'টাই', অন্য একটি টেস্ট ড্র হল শেষ উইকেট পার্টনারশিপের ১০৯ মিনিটের খেলায়? রোমান্টিক উপন্যাসের লেখককে তাঁর এবং আমাদের কল্পনাকে কতখানি না টেনে টেনে বাড়াতে হবে যদি তিনি কোনো একটি টেস্ট ম্যাচের বিবরণ লিখতে গিয়ে লেখেন যে, ঐ খেলাতে একজন হীরো দুই ইনিংসেই চমকপ্রদ সেঞ্চুরী করেছিল এবং তাঁর সহযোগী করেছিল হ্যাটট্রিক?

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ অস্ট্রেলিয়াকে আক্রমণ করেছে বলে ও ব্যাটে—উভয়ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটস্‌ম্যানেরা তাদের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত প্রথম বলটিকে দেখা থেকেই যুদ্ধপথ নিয়েছিল। তারা যেমন সাহসী তেমনি আক্রমণমুখী। স্কোর বোর্ডের দৌড় বটে—ঘণ্টায় ৭০ রান উঠেছে সেখানে।

হার্ভে বলেছিলেন মনে আছে,—এরা কী না করতে পারে, কোন্ বিস্ময় এদের অসাধ্য?

কিথ মিলার বললেন,—চেয়ে দেখ, পৃথিবীর ক্রিকেট-চাম্পিয়ানেরা খেলছে!

সেইদল কিন্তু ব্রিসবনের প্রথম টেস্ট 'টাই' হবার পরে শোচনীয় ভাবে হারল মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টে।

অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করেছিল ৩৪৮। হল ৫১ রানে ৪ উইকেট্। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে নেমে গেল মাত্র ১৮১ রানে, তার মধ্যে আবার নর্সের ৭০ এবং কানহাইয়ের ৮৪ রানের মত দুই বড় স্কোর আছে। ডেভিডসন (৬-৫৩) শেষ করেছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

ফলো অন ক'রে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংসেও বেশী কিছু করতে পারল না, মাত্র ২৩৩ রান, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য, হাণ্টের চমৎকার ১১০ এবং আলেকজাণ্ডারের নিষ্ঠাযুক্ত ৭২! মার্টিন এক সময়ে ফিরিয়ে দিলেন তিনজন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানকে মাত্র ৪ বলে,—৯৭ রানের মাথায় কানহাই, ৯৯ রানে সোবার্স, ওরেল। অস্ট্রেলিয়া তিন উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তুলে দিল।

অস্ট্রেলিয়া জিতল ৭ উইকেটে!

মেলবোর্নের দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরাট হার যেমন ছন্দোপতন করল, তেমনি করল তার ফাস্ট বোলারদের বাউন্সার। বাউন্সার-বর্ষণে বাড়াবাড়ি ক'রে ফেললেন হল ও ওয়াটসন। হাটনের নেতৃত্বে যে 'টাইফুন'-টাইসন উড়িয়ে দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়াকে, হার্ভের ধারণায়, হল সেই টাইসনের মতই দ্রুত। অনেকে বললেন, লারউডের চেয়েও। হল বাউন্সারদানে অকৃপণ। ওয়াটসন যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। বরং বলা চলে, বাউন্সারের সংখ্যার ব্যাপারে ওয়াটসনই গুরুতর। অস্ট্রেলিয়ানরা সর্বাঙ্গে যতই বলের পিঠে-চাপড়ানি খেতে লাগলেন, ততই ভিতরে ভিতরে উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন। বটে, এতটা বলপ্রয়োগ!

এই মনোভাবই ছিল ১৯৫১-৫২ সালের অস্ট্রেলিয়া-সফরকারী ওরেল-উইকস্-ওয়ালকটের। মিলার ও লিণ্ডওয়ালের স-বল প্রেমে

তাঁরা সেবার ব্যতিব্যস্ত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে যে দল চূড়ান্তভাবে হারিয়ে এসেছিল ইংলণ্ডকে, সেই দলই ১৯৫১-৫২ সালে বিধ্বস্ত হয়ে হারল অস্ট্রেলিয়ায়—অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন আয়ান জনসন যেকথা বলেছিলেন,—আমরা খারাপ দল কিন্তু আমরা জিতব, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভালো দল কিন্তু তারা হারবে।

১৯৬০-৬১ সিরিজ বিষাক্ত হবার মুখে,—হাসিমুখে ওরেল তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, ঠিক কথা, আমরা বাউন্সারের বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছি—বিশেষত ওয়াটসনের অহেতুক বলগুলো।

দ্বিতীয় টেস্টের পরে সাংবাদিক সম্মেলনে 'সাংবাদিক' বেনোড হাঁ-না-এর দিকে যাননি।—'খেলার শেষের দিকে হল-ওয়াটসনের বাম্পারের বাড়াবাড়ি? আমি তখন চিঠি লিখেছিলুম, চোখে দেখিনি সে বস্তু,'—বেনোড নিস্পৃহচিত্তে জানালেন।

ওরেল কিন্তু মাঠে ছিলেন, মাঠে থেকেই দেখেছিলেন সে বস্তু, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলেন সে বস্তুর অযৌক্তিকতা,—স্বীকার করবার সময়ে ভুলে গেলেন দশ বছর আগে তাঁর বিরুদ্ধে আছড়ানো বিরক্তিকর বাম্পারগুলোর কথা!

ওরেল হলকে সামলে নিলেন এবং বসিয়ে দিলেন ওয়াটসনকে পরবর্তী টেস্টম্যাচগুলো থেকে।

স্পোর্টস্‌ম্যান? হাঁ স্পোর্টস্‌ম্যান। ওরেলের মহানুভবতা উচ্চারিত হল লক্ষ কণ্ঠে।

সিডনির তৃতীয় টেস্টে দেড়লক্ষ অস্ট্রেলিয়ান অস্ট্রেলিয়াকে শোচনীয়ভাবে হারতে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল খুসীতে। সিরিজটা মরেনি একেবারে। এখন দু'দলই সমান সমান। তাছাড়া অনেক কিছু দেখবার জিনিস দিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ—তারা দেয়ই, যখন তারা প্রেরণায় থাকে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলা শুরু ক'রে প্রথম দিনে করল ৩ উইকেটে

৩০৩ রান। কম আলোর জন্য শেষ দিকে এক ঘণ্টা সময় খেলা হয়নি।

এই হল ক্রিকেট। যখন ঝড় এসে গেছে থামিও না। ওরেলও সেই কথা বলেছিলেন নিজের দলের খেলোয়াড়দের। যদি পার রান ক'রে এস, না পার আউট হও, অপরের পথ আটকিয়ো না।

ওরেলের আদর্শের সুসন্তানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পূর্ণ। ব্রিসবেনের সাফল্যের পরে মেলবোর্নে সোবার্স ব্যর্থতার বিশ্রাম নিচ্ছিলেন (৯,০), সিডনিতে ফিরে এলেন নিদ্রাশেষে। প্রথম দিনে ১৫২ রান নট আউট, তার মধ্যে ৯৮ রান বাউণ্ডারী থেকে। ক্রিকেটের এক অমর স্ট্রোক করলেন ঐ ইনিংসে,—মেকিফের নতুন বলকে পিছন পায়ের উপর দাঁড়িয়ে লঙ অনের উপর দিয়ে শূন্যে উড়িয়ে দিলেন যখন, তখন সমালোচকেরা সবিস্ময়ে চোখ রগড়ে বললেন,—প্রতিভা—একমাত্র প্রতিভার সৃষ্টি। মেকিফ যথেষ্ট জোরে বল করেন, তবু ঐ বিশেষ মারটি যে মারবেন তা সোবার্স স্থির করেছিলেন বল মধ্য মাঠে পৌঁছানোর পরে—এ কথা সোবার্স নিজেই বলেছেন সাংবাদিককে। শুধু কব্জির কাজ—এবং প্রতিভার দান। সোবার্স সেদিন অকাল সন্ধ্যায় তাঁর শেষ পঞ্চাশ করেছিলেন পঞ্চাশ মিনিটে।

পরদিন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা আবার নিজস্ব প্রতিভা দেখালেন। দ্রুত ওঠার মত দ্রুত পড়বার ক্ষমতা। ছিল ৩—৩০৯, আরো ৩০ রান,—ইনিংস শেষ। শেষ পর্যন্ত, ডেভিডসন—৫-৮০, বেনোড —৪-৮৬।

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হল 'সামান্য' ২০২ রানে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও'নীলের ৭১, ভদ্রসংখ্যার জন্য, এবং হার্ভের ৯, ধারাবাহিক ব্যর্থতার জন্য। হার্ভে তাঁর শেষ পাঁচ ইনিংসে করেছেন ৪১। হলের পেস এবং গিবস-ভ্যালেণ্টাইনের স্পিন অস্ট্রেলিয়াকে সুস্থির হতে দিল না। গিবস—৩-৪৬, ভ্যালেণ্টাইন—৪-৬৭।

সোবার্সের 'অমর' স্ট্রোকের মত একটি 'অমর ক্যাচ' দেখালেন কানহাই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে। এই ক্যাচটি নাকি অনেকের

কাছে তাঁদের জীবনের শ্রেষ্ঠ ক্যাচ। সুতরাং বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা ভালো।—

কানহাই এই ম্যাচে যে ক্যাচ ধরেছিলেন, সেট আমার দেখা সেরা ক্যাচ। সিম্পসন হলের বলে নিখুঁত লেগ-গ্লানস্ করলেন, বলটি ভয়াবহ গতিতে নীচু হয়ে নেমে গেল। কানহাই ফাইন লেগ-স্লিপে ছিলেন, লম্বা হয়ে মাঠের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে চার গজ দূরের বলটি বাঁ হাতে ধরে ফেলে মাঠের উপর গড়াতে লাগলেন।...অবশেষে যখন গড়াগড়ি থামল দেখা গেল বল-ধরা হাতটি সিগন্যালের মত উপরে উঠে আছে। পরদিন আমার ট্যাক্সি-ড্রাইভার ক্যাচটির বর্ণনা করল,—আচ্ছা কাণ্ড, কানহাই বোধ হয় ক্যাচটি ধরবার জন্য পাতালে চলে গিয়েছিল।

বর্ণনা করেছেন জ্যাক ফিঙ্গলটন। তিনি অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-ক্রিকেটার, ক্রীড়াজীবনে অনেক খেলা খেলেছেন ও দেখেছেন। বৃত্তিজীবনেও খেলা দেখা বন্ধ হয়নি, কারণ তিনি বৃত্তিতে ক্রিকেট-সাংবাদিক।

বোঝা গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রীতিমত তৈরী হয়ে উঠেছে বোলিং ও ফিল্ডিংয়ে। ব্যাটিংয়ে যে তা বলাই বাহুল্য। দ্বিতীয় ইনিংসে আবার তা প্রমাণিত হল। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল ৩২৬। ওরেল করলেন ৮২, ক'রে দেখালেন তিনি এখনো বড় ব্যাটস্‌ম্যান, এবং আলেকজাণ্ডার করলেন ১০৮,—অস্ট্রেলিয়া মেনে নিল, তিনি ইংলণ্ডের লেসলি এমসের সমতুল উইকেটকীপার-ব্যাটস্‌ম্যান। সিরিজের শেষে মানবে,—এমসের চেয়েও বড়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঐ দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান স্বভাবের আর এক প্রকাশ দেখাল, তারা প্রথমে হুহু ক'রে আউট হয়ে গেল, শেষকালে আবার প্রচুর রান তুলে দিল। প্রথম তিন উইকেটে রান হয়েছিল ২২, শেষ তিন উইকেটে ১৬০।

দ্রুত রান-নীতি ওরেল নিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন আমার জীবনই আমার বাণী। ১৩৭ রানে এগিয়ে থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল। কিন্তু অবিলম্বে জানিয়ে দিল ওটা সামান্য অগ্রগতি। জানাতে তাদের বাধ্য করলেন শ্রেষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান —ডেভিডসন। ২২ রানের মধ্যে ফিরে গেলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাণ্ট কানহাই, সোবার্স। একটা সময় গেছে যখন ডেভিডসন ১৪টি বল দিয়েছেন, রান দিয়েছেন ৬, উইকেট নিয়েছেন ৩।

এই সময়ে এলেন ওরেল। অধিনায়ক, দলের কর্তা, দেশের ত্রাতা। এলেন যথারীতি তাঁর অলস চরণে, মন্দ গমনে। দাঁড়ালেন ডেভিডসনের মুখে। প্রথম বল পড়ল—ব্যাট চলল—বল ফিরে এল বাউণ্ডারীর বেড়ায় ধাক্কা খেয়ে। ওরেল এমনিভাবেই চালিয়ে গেলেন, ক্যামি স্মিথের সঙ্গে করলেন ৬৭ মিনিটে ১০০, তার মধ্যে শেষ পঞ্চাশ ২৩ মিনেটে।

৫৪০ মিনিটে জয়ের জন্য ৪৬৪ রানের প্রয়োজন নিয়ে অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে একটি চমৎকার অস্ট্রেলিয়ান অপরাহ্ন উপহার দিল দর্শককে। সে দিনের খেলা শেষ হল ১-১৮২ রান ক'রে। শেষদিনে বাকি আট উইকেটে ৩৬০ মিনিটে ২৮২ রান করলেই অস্ট্রেলিয়া জিতে যাবে। সেটা আর কঠিন কি যখন হার্ভে ও ও'নীল নট আউট, হার্ভে ফিরে পেয়েছেন এবং ও'নীল বজায় রেখেছেন তাঁদের ফর্ম ; সেই বিকেলে তাঁরা ৯৯ রান করেছিলেন ৮৭ মিনিটে, কিন্তু—

যদি গিবসের 'কিন্তুটা' না থাকত এবং ভ্যালেণ্টাইনের।

হার্ভে করেছিলেন চমৎকার ৮৫, ও'নীল প্রয়োজনীয় ৭০, তবু অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হয়েছিল ২৪১ রানে।

একটি মনোরম শোভাযাত্রা সমাপ্ত হবার পরে নর্মান ও'নীল ল্যান্স গিবসের মাথাটি হাত দিয়ে বেশ ভাল ক'রে নেড়েচেড়ে দেখেছিলেন, তার ফটোগ্রাফটি আমি দেখেছি। তলায় মন্তব্য লেখা ছিল,— ও'নীল বোধহয় গিবসের ঐ কুঞ্চিতকেশ মস্তকটিতে কি আছে নাড়া দিয়ে দেখতে চাইছেন।

ল্যান্স গিবস রীতিনিষ্ঠ অফস্পিনার এবং ভ্যালেণ্টাইন অনুরূপ

স্যাটা স্পিনার। তাঁদের বক্রগতি বিচলিত ও উৎপাটিত করল অস্ট্রেলিয়াকে। গিবস পেলেন ৬৬ রানে পাঁচ, ভ্যালেণ্টাইন ৮৬ রানে চার। গিবস এক সময় ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন ৪টি বলে। গিবসের হাতে উইকেট পতনের কিছু হিসাব,—১৯১ রানে হার্ভে, ১৯৭ রানে ফ্যাভেল ও ম্যাকে, ২০২ রানে ও'নীল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতল ২২২ রানে।

এডিলেড ব্রিসবেনের মতই নিঃশ্বাস কেড়ে নিল দর্শকদের। আবহাওয়ার খবরে আছে, টেস্টম্যাচের সময়ে উষ্ণ বায়ুতরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল এডিলেডের উপর দিয়ে। আরো একটি তরঙ্গ বয়ে গিয়েছিল এডিলেডে, চতুর্থ টেস্টের পঞ্চম অর্থাৎ সমাপ্তি দিনে—রক্তের তরঙ্গ—যখন শেষ উইকেটে ম্যাকে ও ক্লাইন খেলছিলেন। পুরো ১০৯ মিনিট তাঁরা ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রণধারাকে আটকে রেখে অস্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করেছিলেন। সে খেলা ড্র হয়েছিল।

তবু ভাগ্য, ভাগ্য অস্ট্রেলিয়ার, দুর্ভাগ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের। ম্যাকে ও ক্লাইন যে অদ্ভুত মনোবলের খেলা দেখিয়েছিলেন তা দেখাতে পারতেন না, যদি না আম্পায়ার ঈগার অজ্ঞাতে তাঁদের সহায়ক হতেন।

ম্যাকে যে আউট হয়ে গিয়েছিলেন আগেই, সে বিষয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের মনে কোনো সন্দেহ ছিল না। খেলতে নেমে ম্যাকে প্রথম বলেই লেগ স্লিপে ক্যাচ তুলেছিলেন। গিবস্ সেটি মিস্ করেন। তারপরে, চারটে বেজে কুড়ি,—ওরেল বল করছেন,—সিলি পয়েণ্টে সোবার্স শেষ উইকেট জুটির অন্যতম ঐ ম্যাকেকে লুফে নিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা লাফিয়ে উঠল আনন্দে। সকলে ছুটে এল উইকেটের দিকে প্রবল উত্তেজনায়—তাদের জয়—তারা ২—১-এ এগিয়ে গেছে সিরিজে।

তাদের আবার ফিরে যেতে হল যথাস্থানে। তারা ফিরে গেল দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে।' ক্যাচ তোলার পরে আম্পায়ার কি

বলেন দেখবার জন্য ম্যাকে উইকেটের সামনে অচল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আম্পায়ার ঈগার বললেন, বৎস, তোমাকে যেতে হবে না, তুমি নট আউট, তোমার ধাপানো বলকেই সোবার্স লুফেছে।

এডিলেডের এহেন চতুর্থ টেস্টের পরেও বাসযাত্রী ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের হাসির ধমকে বুক কেঁপে উঠতে লাগল পথচারীদের। জীবনের নতুন বর্ণ-পরিচয় আমরা পড়তে পেলাম।

ম্যাকের ক্যাচ ওঠার পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের মনোভাব ও আচরণের সুন্দর বর্ণনা করেছেন ফিঙ্গলটন,—

তারা যে ম্যাকেকে আউট বলেই মনে করেছিল তা দিবাসত্য। নচেৎ তাদের আচরণকে পর্বত-প্রমাণ ধাপ্পা বলতে হয়। এই লোকগুলি, যারা ক্রিকেটকে খেলারূপে খেলবার সামর্থ্য দেখিয়েছে, অজটিল সহজ এই লোকগুলি, যারা বল মেরেছে, বল দিয়েছে, বল ধরেছে,—সবই করেছে তা করবারই আনন্দে,—তারা ঠাণ্ডা মাথায়, সেই মুহূর্তে, সম্মিলিতভাবে অতবড় একটা ধাপ্পা রচনা করেছিল, একথা বিশ্বাস করতে হলে সব কিছুই বিশ্বাস করতে হয়।

ম্যাকে ও ক্লাইন ১০৩ মিনিটের লড়াইশেষে পাঁচ দিনের ক্ষুধার্ত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের মুখের অন্ন টেনে নিলেন। প্রায় ঠিক এই জিনিস করেছিলেন রিং ও জনস্টন ১৯৫১-৫২ সালে। সেও ছিল চতুর্থ টেস্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টেস্ট ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে,—প্রথম ও দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে, তৃতীয় টেস্টে জিতেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, চতুর্থ টেস্টে আবার যদি ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিততে না পারে তাহলে রাবার-আশার সমাধি, জিতলে ফলাফল ২—২। শেষ টেস্টের উপর তাই সেবার সব কিছু নির্ভর করছিল।

সেবার চতুর্থ টেস্টে শেষ দিনে শেষের দিকে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল— অস্ট্রেলিয়ার হাতে একটি উইকেট, ৩৮ রান দরকার জয়ের জন্য, সময় বাকি ৬০ মিনিট। সুতরাং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের জয় নিশ্চিত। শেষ উইকেটে রিং ও জনস্টনের পক্ষে ৩৮ রান করা বা ৬০ মিনিট টিকে থাকা অসম্ভব, বড় বড় ব্যাটসম্যান যেখানে ঘায়েল হয়ে গেছে।

শেষের ৬০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ানদের মুখের ভূগোলে আবহাওয়ার মৌসুমী-পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন ক্লাইড ওয়ালকট। তিনি লিখেছেন—

এই ম্যাচের শেষ পর্যায়ে আমি বসেছিলুম অস্ট্রেলিয়ান ড্রেসিংরুমের সামনে। আমি প্রায়ই ফিরে ফিরে দেখছিলুম আমার পিছনকার মুখগুলি। একেবারে প্রথমে, রিং-জনস্টন যখন তাঁদের প্রায়-অসম্ভব ৩৮ রানের যাত্রা শুরু করলেন, তখন পিছনকার মুখগুলো থম্‌থমে গম্ভীর—শ্মশানযাত্রার মুখ যেন। ক্রমে, সেই 'অসম্ভব' ফিকে হতে হতে যখন সেখানে 'সম্ভব' ফুটে উঠতে লাগল, তখন সে সব মুখে—আহা—বর-যাত্রীর হাসি!

শ্মশান থেকে বিয়েবাড়ী। পরাজয় থেকে জয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের পড়ি-মরি উত্তেজনার ভ্রান্তি, লেগ বিফোর দেওয়া সম্বন্ধে আম্পায়ারের সবিশেষ কঠোরতা, এবং রিং-জনস্টনের দেওয়ালে পিঠ রেখে লড়বার ক্ষমতা অস্ট্রেলিয়াকে প্রয়োজনীয় ৩৮ রান দিয়ে দিয়েছিল—মাঠের সমবেত সকলকে দিয়েছিল দুর্লভ উন্মাদনার আস্বাদ।

১৯৫১-৫২ সালে মেলবোর্নে তোলপাড়-করা বুকের রেখায় যাতনার যে দৃশ্যকাব্য রচিত হয়েছিল, ১৯৬০-৬১ সালে রচিত হোল সেই কাব্যেরই সংশোধিত দ্বিতীয় খণ্ড।

এডিলেডের এই চতুর্থ টেস্ট অনেকগুলি কারণে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। চমৎকার ব্যাটিং করেছিলেন ওরেল (৭১, ৫৩), আলেকজাণ্ডার (নট আউট ৬৩, নট আউট ৮৭) এবং হাণ্ট (৭৯—দ্বিতীয় ইনিংস) ওয়েস্ট ইণ্ডিজ পক্ষে। অস্ট্রেলিয়ার ম্যাকডোনাল্ড (৭১—প্রথম ইনিংস), সিম্পসন (৮৫—প্রথম ইনিংস), বেনোড (৭৭—প্রথম ইনিংস), বার্জ (৪৫, ৪৯) ও ম্যাকে (২৯, ৬২ নট আউট)। চমৎকার বল দিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বেনোড (৫-৯৫, প্রথম ইনিংস), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স (৩-৬৪ প্রথম ইনিংস) ও ওরেল (৩-২৭)। কিন্তু সব কিছুকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল অসামান্য দু'টি জিনিস,—কানহাইয়ের ব্যাটিং এবং গিবসের বোলিং।

গিবস্ সিডনিতে চার বলে তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন। সেটা আন্দাজে নয় তা প্রমাণ করলেন আর একবার অস্ট্রেলিয়ার স্পিন-বিরোধী জমিতে। অস্ট্রেলিয়ান প্রথম ইনিংসে ২৮১ রানের মাথায় গিবসের অফস্পিন প্যাভিলিয়নে পাঠিয়ে দিল ম্যাকে (এল. বি), গ্রাউট (কট) এবং মিশনকে (বোল্ড)। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এই শতাব্দীতে গিবসের হাতেই প্রথম টেস্টে হ্যাটট্রিক হল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে কোনো ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ইতিপূর্বে হ্যাটট্রিক করে নি।

কানহাই দু'ইনিংসে সেঞ্চুরী করলেন। এ জিনিস নতুন নয় ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানের কাছে।* তবু নতুন, কারণ যে কোনো সৃষ্টিই তার পুরোনো চেহারার মধ্যেও অভিনব, বিশেষত যদি কানহাইয়ের মত শিল্পীর হাত থেকে আসে। কানহাইয়ের এই দু'টি সেঞ্চুরীর পরেই কথা উঠল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সেরা ব্যাটসম্যান কে, সোবার্স না কানহাই? সে প্রশ্ন অমীমাংসিত থাকবে, কিন্তু কানহাই সম্মানিত হবেন জর্জ হেডলির সঙ্গে তাঁর নামোচ্চারণে। কানহাই জর্জ হেডলির মত এখনো নন, সকলেই বলবেন (দ্রুত সিদ্ধান্ত করতে বুদ্ধিমান চায় না), কিন্তু যাঁর সামনে দীর্ঘ ক্রিকেট-জীবন পড়ে রয়েছে, তিনি যে এরই মধ্যে হেডলির সঙ্গে একত্রে বন্ধনীবদ্ধ হলেন, সেইটেই মহাসম্মান। প্রথম টেস্টের আগেই কানহাই একটি অসাধারণ ২৫২ দিয়েছিলেন ভিক্টোরিয়াকে এবং ক্রিকেট-জগৎকে, সেই সময়ে তাঁকে দেখে সমালোচকের মনে হয়েছিল,—"একটি রান-বুভুক্ষু ছোকরা। সে জানে কেমন ক'রে বড় স্কোর গড়ে তুলতে হয়। সে যেন বোলারদের ঘৃণা করেছিল, ঘৃণা করেছিল বলকে,—তার সমস্ত সত্তা যেন বিস্ফোরিত হচ্ছিল যখন সে তার বৈদ্যুতিক যন্ত্র থেকে মারগুলি বার করছিল। লেগের দিকে সে এতই জোরে মারছিল যে, অনেক

---

* জর্জ হেডলি—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দু'বার (১৯২৯-৩০ ও ১৯৩৯ সিরিজ)। ক্লাইভ ওয়ালকট—অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক সিরিজে দু'বার (১৯৫৪-৫৫)। এভার্টন উইকস—ভারতের বিরুদ্ধে একবার (১৯৪৮-৪৯)। গারফিল্ড সোবার্স পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একবার (১৯৫৭-৫৮)।

সময় মারের মধ্যে পড়ে যাচ্ছিল মাটিতে।......তার কালো চোখের মতই ঝলসে উঠছিল তার ব্যাট।"

সেই কানহাই প্রথম তিন টেস্টে কয়েকটি ভালো ও মন্দ ইনিংস খেলার পরে (১৫—৫৪ ব্রিসবেন ; ৮৪—২৫ মেলবোর্ন ; ২১—৩ সিডনি) পূর্ণ প্রতিভায় জ্বলে উঠলেন এডিলেডে। সব সময় অস্থির, যে কোনো রসিকতায় উচ্ছ্বসিত, যে কোনো প্রয়াসে উদ্দীপিত কানহাই নিজের যোগ্য ইনিংস খেললেন এাডলেডে,—প্রথম ইনিংসে ১১৭ রান (১৪৯ মিনিটে) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৫ (২২২ মিনিটে) যা দেখে মনে হল পৃথিবীর সেরা,—যদিও অধিকাংশ সময় ক্রীজের মধ্যে থেকে খেলার জন্য তাঁর সমালোচনাও করা হল।

খেলোয়াড় কানহাই ঐখানেই শেষ হলেন না,—তাঁর ফিল্ডিং উচ্চতম প্রশংসা পেল,—তাঁর দৌড় এবং তাঁর নিক্ষেপ। উইকেটের মধ্যে দৌড়ের সময়ে তিনি ব্রাডম্যানের চেয়ে যদি দ্রুততর না হোন সমতুল নিশ্চয়,—বলা হল প্রশংসাধ্বনিত কণ্ঠে। কানহাইয়ের গুণ অবশ্য কানহাইয়ের দোষের কারণ হল অনেক সময়। অস্থির কানহাই নিজের এবং অপরের উইকেট নষ্ট করলেন। অপরকে মারলেন রান-আউটে। এডিলেডে তাঁর হাতে মারা পড়লেন হাণ্ট। হাণ্ট মেলবোর্নে সেঞ্চুরী করেছিলেন। এডিলেডে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি সেঞ্চুরীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সুনিশ্চিত-ভাবে। সেঞ্চুরীর একুশ রান বাকি। কানহাইও ঐ টেস্টে দ্বিতীয় সেঞ্চুরীর মুখে। তাঁর বাকি মাত্র এক রান। বেনোড ফিল্ডার দিয়ে ঘিরিয়ে দিয়েছেন ব্যাটসম্যানকে। অধৈর্য কানহাই রানের ডাক দিলেন। কোনো রান ছিল না। কিন্তু কানহাইকে বাঁচাতে হবে। তার সেঞ্চুরীর মাত্র এক রান বাকি। সে রান হলেই অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ছ' ইনিংসে সেঞ্চুরী করবে। সুতরাং হাণ্ট নিজেকে বলি দিলেন। আত্মগ্লানিতে বুকের উপর মুখ ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কানহাই, আত্মত্যাগী হাণ্ট প্যাভিলিয়নের ফিরতি পথে বার বার মুখ ফিরিয়ে কানহাইকে আশ্বস্ত করতে লাগলেন, এবং—

সাংবাদিক নাটকীয়ভাবে বলেছেন,—"হাণ্ট শেষকালে কাঁধ ঝাঁকালেন, হাসলেন, এবং বেঠিক গেট দিয়ে প্যাভিলিয়নে প্রবেশ করলেন।"

কানহাইয়ের শিল্পীরূপ আমরাও দেখছি ইডেন গার্ডেনে ১৯৫৮ সালের তৃতীয় টেস্টে। সেদিন সে রূপ দেখে যা লিখেছিলুম, তা উদ্ধৃত করতে পারি—

১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বর্ষশেষে সন্ধ্যা সাড়ে চারটার সময় যখন ইডেন গার্ডেন ভেঙে দর্শক ছড়িয়ে পড়ল চারিদিকে ফোয়ারার মত, তখন সেই তরঙ্গে তরঙ্গে প্রবাহিত দর্শকধারার মনে বিমিশ্র অনুভূতি। একদিকে আছে পূর্ণতার তৃপ্তি,—আজ সারাদিনে এমন একটি ইনিংস দেখা গিয়েছে, যা সঙ্গীতে পূর্ণ, সৃষ্টিতে সুন্দর। অন্যদিকে ক্ষোভের নিঃশ্বাস, —ভারতীয় ক্রিকেট মৃত্যুদশায়। কানহাইয়ের অতবড় একটা ইনিংসকে ম্লান ক'রে দিয়েছে বিপক্ষের প্রথমাবধি পরাজয়ের ক্লান্তি।

মাঠ থেকে কিছু দূরে গিয়েই, যখন নিজেদের ব্যর্থতার বেদনা কিছু তীব্রতা হারিয়েছে শীতের কনকনে উত্তরে বাতাসে—হঠাৎ ফিরে মন পড়ল কানহাইয়ের খেলা। কানহাইয়ের বাঁশী। হাইকোর্টের প্রাচীন চূড়ার তলায় দাঁড়িয়ে আচ্ছন্ন অন্ধকারে পুরাতন স্মৃতি মর্মরিত হয়ে উঠল কম্পমান দেবদারুর পত্রধ্বনির সঙ্গে। কানহাইয়ের আজকের মত খেলা অল্পই দেখা যায়। এই খেলা তোলা রইল ইতিহাসের জন্য।

ইতিহাসের জন্য! ইতিহাস কবে এই খেলা দেখেছে? ইডেন গার্ডেনের কালপ্রাচীন প্যাভিলিয়ন কি বলে? কি বলে এখনো অবশিষ্ট বৃদ্ধ বৃক্ষগুলি? অমরনাথ কি এই খেলা দেখাতে পেরেছেন?—না। অমরনাথ আরো ডায়ন্যামিক। মার্চেন্ট? মার্চেন্ট অধিকতর নিখুঁত ও নিপুণ, মার্চেন্ট ক্লাসিক। উইকস্? উইকসের খেলায় নৃশংসতা বড় বেশী ছিল। মুস্তাক আলী ছিলেন আতিশয্যপূর্ণ এবং নৃত্যশীল নটরাজ ছিলেন নীল হার্ভে।

কানহাইয়ের দিকে একবার তাকালাম মনে মনে। ভারতবর্ষের অপরাহ্ণ মনে পড়ল। মনে পড়ল সূর্যাস্ত, গোধূলি, আর একটি পুরবীয়া সুরের ললিত বিস্তার। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান কানহাইকে চিনতে পারলুম ইণ্ডিয়ান কানাই বলে।

ব্যাটিংয়ে কানহাই যা দেখালেন ভারতবর্ষে সে জিনিস দেখাবার একমাত্র অধিকারী কানহাইয়ের অপর নাম—গোপীনাথ।

আক্রমণের নিষ্ঠুরতাহীন এত দ্রুত ও এত বড় ইনিংস আমার কল্পনারও অতীত ছিল। একদিনে ২০৩ রান, তাও সম্পূর্ণ দিন খেলে নয়। আমরা কিন্তু যখন মাঠ ছেড়ে গিয়েছি, হৃদয় ছিল অক্ষত। এ জিনিস পীড়িত করে না, আহত করে না, দিনের পর দিন দেখে যাওয়া যায়। একজন উইকস যখন খেলেন, বোলার ও ফিল্ডারের মতই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায় দর্শক। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে, বুক তোলপাড় করে, বিপর্যস্ত বিস্ময়ের সঙ্গে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকি শুধু। উইকসের একটা ইনিংস এক দিনের জন্য নয়, এক বছর, কি কয়েক বছরের জন্য মনের তন্দ্রাহরণের পক্ষে যথেষ্ট। ৩১শে ডিসেম্বর দিনশেষে আম্পায়ার যখন বেল তুলে নিলেন, কানহাই ব্যাট তুলে নিয়ে ফিরতে শুরু করলেন প্যাভিলিয়নের দিকে, তখন, তখনো আমার কাছে দশ বছর পূর্বেকার উইকস আরো জীবন্ত।

শরতের সোনালি আলোর মতই কানহাইয়ের ব্যাটিং, মনে থাকবে মৃদুস্পর্শ উত্তাপে ও সৌরভে।

কানহাইকে যাঁরা দেখলেন, তাঁরা কি দেখেছেন সেই শ্যামলা ছেলেটির মধ্যে সুভদ্র রমণীয়তার রূপটি! ড্রাইভ জিনিসটাই বলপূর্ণ, তার বেশী ব্যবহারে নিজের ক্ষুধিত রূপ উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ে। কানহাই কত কম অফ ড্রাইভ করেছেন; অফের দিকে যা মেরেছেন তা হল সুষমাময় স্কোয়ার কাট কিংবা সর্পচুম্বনের মতই বিষমাদক—লেট কাট। কানহাইয়ের বেশী মার অন-এ। খাড়া শরীরে করতে হয় অফ-ড্রাইভ; আর শরীর স্বচ্ছন্দে ঘুরে যায় অন-এর দিকে নিজের বেগে। সহজের ছন্দকে কানহাই ব্যাটিংয়ে পেয়েছেন বলে তিনি অন-এর মারের উপরই বেশী নির্ভর করেছেন। ক্রীজ ছেড়ে এগিয়ে গিয়ে মারের মধ্যে আছে দুঃসাহস,—কানহাই আচ্ছন্ন নিপুণতার শিল্পী,—তাই ক্রীজের মধ্যে থেকেই মধুর ভঙ্গিমায় কোমর হেলিয়ে কানহাই মেরেছেন অন ড্রাইভ। হুক করছেন,—তার মধ্যেও হুকের কর্কশতার পরিবর্তে পুলের কোমলতা, এবং গ্লান্স— ভারতবর্ষের আকাশ থেকে বিদেহী রনজির আশীর্বাদ ঝরে পড়েছিল বার বার ভারতবর্ষের এই প্রবাসী পৌত্রের শিরে।

বলের শাসনে নয়, বলের শোধনে কানহাইয়ের ইনিংসটি ইডেন গার্ডেনে অদ্বিতীয়। বলকে তিনি তাড়না করেন নি, চালনা করেছেন। তিনি নিজেকে 'বিক্ষিপ্তির' শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে পরিচিত করেছেন। মৃদু তরঙ্গের উপর লুটোপুটি-করা একটি বালকের মত তাঁকে দেখেছি।

দেখেছি ইডেন গার্ডেনের সবুজ তরঙ্গে রঙ্গভরে লুটোপুটি করা একটি নন্দন ইনিংস।

এডিলেডের চতুর্থ টেস্টের পরে দর্শকেরা পূর্ণ চিত্তে তাই মাঠ থেকে ফিরে গিয়েছিল। একই খেলোয়াড়ের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী, টেস্ট হ্যাটট্রিক, শেষ উইকেটে ১০৯ মিনিটের সাফল্যময় সংগ্রাম এবং একটি ফিল্ড প্লেসিং-এর ছবি, যা শেষ দিনের শেষ ওভারের আগের ওভারে ওরেল করেছিলেন। ব্যাটসম্যান কী করে দেখবার জন্য তেরটি লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তার মধ্যে নিজ দলের অপর ব্যাটসম্যান এবং সামনের দিকের আম্পায়ারকে বাদ দিলে বাকি ১১টি শত্রুদলের। এগারজন খেলোয়াড়ের এ রকম হুমড়ি খেয়ে পড়া টেস্টে অভিনব। ছবিটা কল্পনা করুন পাঠক: বলের জন্য প্রস্তুত ব্যাটসম্যান; বোলার ধেয়ে আসছে; পিছনে লোলুপ উইকেট-কীপার; উইকেট-কীপারের বাঁ হাতের পাশে (ন্যাটা ব্যাটসম্যান) তিনটি স্লিপ; স্লিপের প্রান্তটি আরো দু'টি ফিল্ডসম্যানের দ্বারা বেঁকে ব্যাটসম্যানের ব্যাটের এক গজের মধ্যে পৌঁছে গেছে; লেগের দিকেও অনুরূপ চার জনের বেষ্টনী। পাড়ার খোকা ব্যাটসম্যান, যেখানে ব্যাটসম্যানের চেয়ে ব্যাট বড়, সেখানেও ধাড়ীরা তাদের সঙ্গে খেলবার সময়ে এ জিনিস করে না।

মোট কথা হল—এডিলেডের চতুর্থ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে করেছিল ৩৯৩। ২৬৬ রান ক'রে অস্ট্রেলিয়া অপেক্ষাকৃত দুর্বল উত্তর দিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাট পুনরায় ৬ উইকেটে ৪৩২ রানের প্রচণ্ড চীৎকার তুলল দ্বিতীয় ইনিংসে। অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ৯ উইকেটের লড়াইয়ে উপায়ান্তরহীন ড্র-এ সংবৃত রাখল ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে।

মহাপ্রাণ ওরেলের অনুরোধমত আম্পায়ার ঈগার ও আম্পায়ার হোয় পূর্ববৎ পঞ্চম টেস্ট পরিচালনার জন্য মেলবোর্ন মাঠে এসে উপস্থিত হলেন। প্রথম দিনেই ৯০ হাজার দর্শক আর একটি আশ্চর্যজনক খেলা দেখবার জন্য আগ্রহে সমবেত হল।

একটি বিপুল সম্ভাবনার সম্মুখীন ঐ প্রায় এক লক্ষ দর্শক! ক্রিকেটের রেনেসাঁসের শেষে ফসল তুলবার শেষ পাঁচ দিন। ক্রিকেট যে এত বড় হতে পারে কেউ কল্পনাও করতে পারিনি কখনো। ব্রিসবেনের টেস্ট 'টাই' হয়েছিল। এই সিরিজের তো নিশ্চয়, সমস্ত ক্রিকেট-ইতিহাসেরও সেটা ক্লাইম্যাক্স। ব্রিসবেন টেস্ট ছিল এই সিরিজে প্রথম খেলা। প্রথম অঙ্কে চূড়ান্ত অনুভূতি ঘটে গেলে নাটক এগোয় না আর। সেকথা সত্য, কিন্তু তা সত্য অল্প প্রতিভার পক্ষে। মেলবোর্নে দ্বিতীয় টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এবং সিডনিতে তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার হারের পর ফলাফল সমান হয়ে গেল। এডিলেডে চতুর্থ টেস্ট হল ড্র,—ক্রিকেট-ইতিহাসের মহত্তম ড্র-এর একটি। ঐ ড্র-এর সময় পাল্লা ঝুঁকে ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পক্ষে। জিতবার কথা ছিল তাদের, অস্ট্রেলিয়া জিততে দিল না আপ্রাণ চেষ্টায়। মেলবোর্নে পঞ্চম ও শেষ টেস্ট। এই খেলায় কি হবে,—জয়—পরাজয়—ড্র—না—'টাই'?

অতিবিশাল প্রত্যাশা নিয়ে দর্শকেরা মেলবোর্নে উপস্থিত। মহাসাগরতুল্য জনতা অপেক্ষা ক'রে রইল ক্রিকেটের ব্যাটল্ অব ট্রাফালগার দেখবার জন্য।

লক্ষ জনের সমাবেশে আম্পায়ার ঈগার আবার অনিচ্ছার নায়ক হলেন। আম্পায়াররা নিরপেক্ষ বিধাতা হলেও কখনো কখনো গ্রীক নাটকের দেবতার মত হয়ে পড়েন—তখন তাঁদের বাসনামুখে অহেতুক ট্রাজেডী ঘটে যায়।

পঞ্চম টেস্টের শেষ দিন। অস্ট্রেলিয়ার হাতে তিনটি উইকেট, চার রান দরকার। গ্রাউট একটা বল খেলতে চাইলেন। বল বেরিয়ে গেল পিছন দিকে, গ্রাউট দৌড় দিতে শুরু করলেন। উইকেটকীপার আলেকজাণ্ডার শান্তভাবে আঙুল দিয়ে দেখালেন আম্পায়ার ঈগারকে—দেখ, বেল পড়ে গেছে মাটিতে। গ্রাউট ইতিমধ্যে ২ রান ক'রে ফেলেছেন দৌড় দিয়ে।

বেল পড়ল কিভাবে? বাতাসে? ব্যাট লেগে? বল লেগে?

আম্পায়ার ঈগার বুঝতে পারেননি। তিনি বড় বেশী ঝুঁকে লক্ষ্য করছিলেন। বুঝবার পক্ষে অসুবিধাজনক অবস্থায় ছিলেন তিনি। পরামর্শের জন্য আম্পায়ার ঈগার এগিয়ে গেলেন আম্পায়ার হোয়-এর কাছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা প্রতীক্ষা ক'রে আছে—তাদের মনে, বিশেষত স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা অধিনায়ক ওরেলের মনে, আউট সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি স্পষ্টই উইকেটে বল লাগার খিচ্ শব্দ শুনেছেন, ও বেল পড়ে যেতে দেখেছেন।

আম্পায়ার ঈগার গভীরভাবে চিন্তা করলেন। বাতাসে বেল পড়তে পারে না, কারণ বাতাস তখন কোথায়? আম্পায়ার হোয় বলেছেন, গ্রাউটের ব্যাট উইকেটে লাগেনি, উইকেটকীপার আলেকজাণ্ডারও দূরে ছিলেন, তাঁর পক্ষে বেল হাত দিয়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়।

তাহলে? একমাত্র সম্ভব—সম্ভবপর একমাত্র—গ্রাউটের ব্যাট-ছোঁয়ানো বল লেগে বেল পড়েছে। কিন্তু আম্পায়ার ঈগার ভাবলেন—আমি তো তা হতে দেখিনি! তা ছাড়া—তিনি 'হয়তো' আরো ভাবলেন,—'এহেন' সময়ে বল লেগে বেল পড়ে গেল অথচ উইকেটকীপার আলেকজাণ্ডার দু'হাত তুলে প্রেমনৃত্য করল না, কিছু না হতেই খেলোয়াড়রা যেখানে সমস্বরে পিলে-চমকানো হুঙ্কার দেয়!

আম্পায়ার ঈগার গ্রাউটকে সন্দেহের অজুহাতে মুক্তি দিলেন। মাটিতে আছড়ে পড়লেন রাগে হতাশায় সলোমন ও ল্যাসলি। ওরেল কাছে গিয়ে বললেন, অনেক হয়েছে, উঠে পড়।

ওরেল কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাসলেন পরম বৈরাগ্যে—ক্রিকেটে এরকম হয়েই থাকে।

আলেকজাণ্ডারকে জিজ্ঞাসা করা হল,—তুমি নাচ-গান করলে না কেন? আলেকজাণ্ডার বললেন, বারে—! তা করবার দরকার কি—বেল তো মাটিতে পড়ে!

গ্রাউট বুঝলেন, তিনি আউট হয়েছিলেন, তাই মাথার উপর ক্যাচ তুলে উইকেট ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন।

আউট সত্যই হয়েছিলেন,—আম্পায়ার ঈগার ছাড়া বাকি সকলেই তা বুঝেছিলেন; সব চেয়ে বেশী বুঝেছিল টেলিভিশন ক্যামেরাটা। তাতে পরিষ্কার আউটের ছবি।

পরে উইকেট ছুঁড়ে দিলেও গ্রাউট কিছু না জেনে আগেই দৌড়ে ২ রান নিয়েছিলেন। ফলে ২ উইকেটে ২ রান করলেই অস্ট্রেলিয়া জেতে। মার্টিন ক্যাচ তুললেন হলের দিকে। হলের মাংসপেশীতে টান ধরেছে, তা ছাড়া, বোধহয় হল মনের দিক থেকে হেরে গেছেন। ক্যাচটা ধরবার চেষ্টা করলেন না। বিশেষ দুর্ভাগ্য এই, হলের ফিল্ডিং-এর নতুন জায়গাটা ছিল কানহাইয়ের পুরোনো জায়গা, হলের পায়ে টান ধরতে জায়গা বদলেছিলেন তাঁরা পরস্পর। সুনিশ্চিত-ভাবে,—ক্রিকেট যতখানি সুনিশ্চিত হতে পারে,—কানহাই ক্যাচটি ধরতেন।

অস্ট্রেলিয়া জিতল দু' উইকেটে।

গ্রাউটের ঘটনা না ঘটলে হয়ত জিততে পারত না অস্ট্রেলিয়া, ব্রিসবেনের কাহিনী স্মরণ করলেই তা বুঝতে পারি। সেই ব্রিসবেন-কথা—পরে সে কথা। এখন গ্রাউটের আউট।

তুমুল হৈ-চৈ হল আউট না-দেওয়া নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার আম্পায়ারিং ইদানীং গোলমেলে ব্যাপার হয়ে উঠেছে। গ্রাউটের ঘটনা নিয়ে কিথ মিলার বললেন,—'সত্যি কথা বলতে কি, এই সিরিজে বড় বেশী আম্পায়ারিং-এর গণ্ডগোল হচ্ছে। তাতে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়ী মনের শান্তি নষ্ট। একজোড়া ব্যক্তিকে পাঁচটি টেস্টে আম্পায়ার নিয়োগ না করাই উচিত।'

এই সব ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়ী মনকে কতখানি স্পর্শ করেছিল, সে মন কিভাবে ভালবাসায়, উদারতায় ও সহানুভূতিতে বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল—তার দৃষ্টান্তে পূর্ণ ছিল দর্শক-আসন।—'এসব সত্ত্বেও ওরা অভিযোগ করেনি'—অস্ট্রেলিয়ান দর্শক একবাক্যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের। মেলবোর্নের প্রথম টেস্টে সলোমনের টুপি উইকেটে পড়ে বেল পড়ে যাওয়ায় তার

বিরুদ্ধে বেনোড যখন আবেদন করলেন, ও তা যখন গৃহীত হল, তখন নিজের দলের অধিনায়কের প্রতি দর্শকদের সে কী ধিক্কারধ্বনি।

এবার প্রশ্ন উঠল, গ্রাউট যখন বুঝলেন তিনি আউট হয়েছেন, (তিনি বুঝেছিলেন বলেই অনেকে মনে করেন), তখনি তিনি কেন উইকেট ছেড়ে দিয়ে চলে যাননি, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখে? গ্রাউট অতঃপর উদারতাবশে নিজের উইকেট ছুঁড়ে ফেলে দিলেও ঐ 'সুমহৎ' প্রশ্ন অনেকেরই মনে না উঠে পারেনি। যেমন ফিঙ্গলটনের। তিনি অনুরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে হবসের ব্যবহারের গৌরব দেখাতে চেয়েছেন। কেনিংটন ওভালে হবস্ খেলছিলেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। গ্রেগরীর একটি বল সামান্যতম স্পর্শে বেলটি ফেলে দিয়ে উঠে পড়ল উইকেটকীপার ওল্ডফিল্ডের হাতে। স্পর্শ এতই সামান্য ছিল যে, বলের গতির কোনো পরিবর্তন হল না। অস্ট্রেলিয়া ডাক পাড়ল, ইংরেজ আম্পায়ার বলল—নট আউট।

অস্ট্রেলিয়ান ক্যাপ্টেন এইচ. এল. কলিন্স সবটা দেখতে পাবার মত জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হবস্ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হার্বি, ঠিক কি হয়েছে বল তো? কলিন্স বললেন, 'জ্যাক, বল তোমার বেলটিকে মাত্র সরিয়ে দিয়ে চলে গেছে।' 'সে ক্ষেত্রে',—হবস্ বললেন,—'আমার যাওয়াই ভাল'। সেই ভাল কাজটি হবস্ তখনি করলেন।

সনিঃশ্বাসে ফিঙ্গলটন বলেছেন,—যদি গ্রাউট ঐভাবে মাঠ ছেড়ে চলে যেত তাহলে এই সিরিজের পক্ষে উপযুক্ত কী মহনীয় ব্যাপার না হত।

বেনোড বলেছিলেন,—ঠিক, তবু—'যার কর্ম তারে সাজে'। আম্পায়ারের কাজে হস্তক্ষেপ কেন করবে ব্যাটসম্যান? বেনোড একথা বলেছিলেন ১৯৬০-৬১ সিরিজের আম্পায়ার-দুর্ঘটনা ঘটবার আগেই। এই সিরিজ শুরু হবার আগেই রিচি বেনোড Way of cricket নাম দিয়ে একটা বই লিখেছিলেন। তাতে তিনি নিজের জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ ক'রে পূর্বোক্ত ধরনের ব্যাপার সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। বেনোডের প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট-জীবনের

গোড়ার দিকের কথা, তিনি তখন নির্বাচনের দ্বারে দাঁড়িয়ে আছেন। বেনোডের নিজের কথাই শোনা যাক।—

"নিউ সাউথ ওয়েলস্ প্রথম টেস্ট গেম খেলবার জন্ম কুইনস্‌ল্যাণ্ডে গেল, আমি তাতে নির্বাচিত হলুম না। তাই পরবর্তী গ্রেড গেমে আমার বেশ কিছু রান করা দরকার। সৌভাগ্যবশত সে খেলায় ১৬০ নট আউট যোগাড় করতে পারলুম।······তা পারলুম, কোনো রান করবার আগেই 'সামান্ত' স্পর্শ করা একটা বল উইকেট-কীপারের হাতে ধরা পড়া সত্ত্বেও যখন আমাকে নট আউট দেওয়া হল, তখনি! যাঁরা 'ইংরেজী-ধারণার' সমর্থক, তাঁরা বলবেন, আমার চলে যাওয়াই উচিত ছিল। ইংলণ্ডের সাধারণ মনোভাব হল, ব্যাটসম্যান যদি মনে করে সে কট হয়েছে, তাহলে তখনি তার চলে যাওয়া উচিত, আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না রেখেই। জিনিসটা থিয়োরীতে চমৎকার, কিন্তু বাস্তবে অকেজো।······

অস্ট্রেলিয়ান মত হল, খেলোয়াড় অপেক্ষা করবে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের জন্ম। আম্পায়াররা খেলার ভার নিয়ে আছেন, আর সে ভার তাঁদের উপর থাকলেই মঙ্গল। এমন ঘটনাও তো ঘটে যে, খেলোয়াড় আউট হয়নি অথচ আউট দেওয়া হয়েছে, যেমন ধরা যাক, তার প্যাডে-লাগা বলে সে কট হয়েছে, কিংবা ব্যাটে খেলা সত্ত্বেও হয়েছে এল, বি। আম্পায়াররা মানুষ, যন্ত্র-মানুষ নন,—তাঁদের প্রতি সর্ববিধ সৌজন্ম ও সর্বপ্রকারে তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতার নীতিতে আমি যেমন বিশ্বাস করি, তেমনি আমার ধারণা, ব্যাটসম্যানেরা সাদা কোট পরা ব্যক্তিদের কাজ কেড়ে নিলে সঙ্গত কাজ করবেন না।······ আমার ভয় হয়, ব্যাটসম্যানের যথেচ্ছ 'চলে-যাওয়া' মনোভাব অসঙ্গতির সৃষ্টি করবে। আম্পায়াররা খেলার উপর তাঁদের অধিকার বজায় রাখুন, সকল সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তাঁরাই নিন,—ব্যক্তিগতভাবে আমি তাই চাই।"

খেলার কথায় ফিরে আসা যাক। কিংবা আরো কিছু কথা সেরে নিই। মেলবোর্নে শেষ টেস্টের আগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নায়ক ওরেল কিছু বিতর্কের নায়ক হয়ে উঠেছিলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা

রেখে ঢেকে কিছু বলায় বা করায় বিশ্বাস করে না। তাদের রক এণ্ড রোল নাচ, তাদের ক্যালিপসো গান, তাদের শ্বেতবর্ণ হাসি তারা অস্ট্রেলিয়ায় ছড়িয়েছে অফুরন্ত ধারায়। সূর্যালোকের দেশের তারা মানুষ, তাদের মুখের নীলপদ্ম ফুটে আছে মুখে মুখে।

এমন দলের যথার্থ প্রতীক ওরেল। যথার্থ নায়ক। তিনি নতুন জীবনদর্শন আনছেন। তাই তাঁকে কিছু কথা বলতেই হয় স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, উচ্ছল সাহসের সঙ্গে। তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি কি ঘটল, তার পরোয়া করবেন না।

যেমন, অনেকে অনুমান করেন, তিনি বেনোডের মাত্রাতিরিক্ত বোলিং-এর বিরুদ্ধে এবং সিম্পসনের বোলিং-সামর্থ্যের পক্ষে কথা বলে নিজ দলের, বিশেষত প্রধান ব্যাটসম্যান সোবার্সের, ক্ষতিই করেছিলেন পরোক্ষে। শেষ মেলবোর্ন টেস্টের আগে ওরেল অস্ট্রেলিয়ার সংবাদপত্রে একটি বিশেষ তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখলেন অনেকে অবাক হল সে প্রবন্ধ পড়ে, সফরকারী দলের অধিনায়ক সফর শেষ হবার আগে এ ধরনের কিছু কখনো লেখে না। অনেকে উপকৃত হল 'সম্ভবত'। যেমন বেনোড। ওরেল বেনোডের অধিনায়কত্বের কড়া সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন, রিচি নিজে বড় বেশী বল করছে। তার নিজের প্রতি কুড়ি ওভার বলের ক্ষেত্রে সিম্পসনকে দিয়ে অন্তত ৬ কি ৮ ওভার বল করানো উচিত।

শেষ টেস্টে যখন সোবার্সের কাছ থেকে একটা ভালো স্কোর অত্যন্ত দরকার, তখন দু' ইনিংসে ৩৬ ওভার বলকারী সিম্পসন (যেখানে বেনোড করেছিলেন দু' ইনিংসে ৫০.৭ ওভার) দুবারই নিয়েছিলেন সোবার্সের উইকেট।

এটা এমন কিছু নয়, এই বেনোড-শিক্ষা প্রবন্ধটি। মৌচাকে ঢিল পড়ল ওরেলের অন্য বক্তব্যে। ইংলণ্ড সে সব কথা শুনে ভাবল, হাততালিতে লোকটার মাথা গরম হয়ে গেছে। অনেকেই আশা করেছিল, রাণীর জন্মদিনে 'স্যার' ওরেল জন্মাবেন। হয়তো জন্মাবেন, কিন্তু আরো বেশ কিছু ঋতুর পরে।

আমি জানি না, বিলেতি ক্রিকেটের চরিত্র সম্বন্ধে ওরেলের কটাক্ষ তাঁকে নাইট রূপে বেছে নিতে সেবার রাণীকে বাধা দিয়েছিল কিনা।

এডিলেডে চতুর্থ টেস্টের পরে ফিঙ্গলটন ওরেলের সঙ্গে দেখা ক'রে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মত জানতে চাইলেন। ওরেলের মত জানার পরে তিনি 'লণ্ডন সানডে টাইমসে' সে কথাগুলি লিখে পাঠালেন। ওরেল এম. সি. সি. দলকে সমালোচনা ক'রে বলেছিলেন, তারা ক্রিকেট মাঠকে যুদ্ধক্ষেত্র বলে মনে করে। ইংরেজদের জাতীয় চরিত্র বদলে গেছে, খেলা থেকে তারা আনন্দ খুঁজে পায় না। খেলাকে তারা যৎপরোনাস্তি গুরুগম্ভীরভাবে নেয় এবং তারা পরাজিত হতে চায় না কোনোমতে।

মেলবোর্নে পুনশ্চ ওরেল একজন ইংরেজ সাংবাদিককে একই ধরনের কথা বললেন। তাঁর মতে—

ইংরেজ খেলোয়াড়রা কোনোমতে হারতে চায় না, সেটা বড় অবাঞ্ছিত। না হারবার জন্য তারা সব কিছু করবে। ঐ মনোভাব নিয়েই তারা মাঠে নামে। ভালো খেলব, মেরে খেলব,—এসবের মধ্যে তারা নেই।

তাদের মনোভাব নেতিমূলক। এটা যেন তাদের জাতীয় স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্বের চেয়ে এ জিনিসটা এখন অনেক বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা যায়। তোমাদের (ইংরেজ) ক্রিকেটাররা স্বচ্ছন্দ হয় না কখনো। লীগ ক্রিকেট পর্যন্ত যেন গলা-কাটা কাণ্ড।

ইংরেজ ক্রিকেটাররা পূর্ব নির্ধারিত 'ধীরে চল' নীতির অনুসরণে সময় নষ্ট করে। ওভার-পিছু বড় বেশী সময় নেয়। মাঠের মাঝখানে পরামর্শের অন্ত থাকে না।

ইংরেজ ক্রিকেটাররা অসামাজিক। প্রথম দিনের সকালে সেই যে একবার ইংরেজ ক্যাপ্টেন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ক্যাপ্টেনের সঙ্গে মাঠের মধ্যে টস করতে গেলেন,—তারপর থেকে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা কদাচিৎ তাঁর সাক্ষাৎ পায়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজে আমরা কত বেশী বাড়ীতে ডেকে এনে আপ্যায়ন করি, অপর পক্ষে আমাদের কদাচিৎ ইংলণ্ডে বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

সর্বনাশ! এসব কি কথা! লোকটা নিজের হঠাৎ-জনপ্রিয়তার সুযোগ নিচ্ছে তো বটে! খেলোয়াড় হিসাবে নামী, খেলোয়াড়ী মনোভাবের সুনাম আরো বেশী, তাছাড়া ইংলণ্ডে লেখাপড়া শিখেছে, সেখানে বাস করেছে অনেকদিন,—সুতরাং কালো লোকটার কথার জবাব দিতে হয়। তাছাড়া লোকটার কথার মধ্যে বিশেষ একটা কথা প্রচ্ছন্ন আছে,—ইংলণ্ডে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের বাড়ীতে নেমন্তন্ন করা হয় না, অথচ সেই 'রিজার্ভড্' ইংরেজই অস্ট্রেলিয়ান বা সাউথ আফ্রিকান ক্রিকেটারকে দিব্যি বাড়ীতে আপ্যায়ন করে।

প্রতিবাদ জানালেন এম. সি. সি. নির্বাচকদলের সভাপতি বিখ্যাত জি. ও. অ্যালেন। তিনি বললেন, দোষারোপে মঙ্গল আসে না। বিশেষত যদি নিন্দাবচনে তথ্যঘটিত ভ্রান্তি থাকে। ওরেলের দেওয়া তথ্যে ভুল আছে।

'গাবি' অ্যালেন জানালেন, প্রত্যক্ষজ্ঞানের অভাবে তিনি সাম্প্রতিককালে বিদেশগত ইংরেজ খেলোয়াড়দের আচরণ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারেন না, কিন্তু—তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন,—স্বদেশে তারা খুবই মিশুক।

প্রাক্তন অধিনায়ক আর ডবলিউ ভি রবিন্স ক্রিকেটাররূপে ও ক্রিকেটদলের যোগ্য নেতারূপে ওরেলের প্রশংসা করার পরে স্বীকার করলেন, খেলার মাঠে আচরণ ও মনোভাবগত ত্রুটি সত্যই ঘটছে। যেমন নেতিমূলক খেলা, সময়ের অপব্যবহার, মাঠে কনফারেন্সের পর কনফারেন্স এবং দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদক অন্যান্য আচরণ। এই সব জিনিস ক্রিকেটকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে।

কিন্তু, শ্রীযুক্ত রবিন্স প্রশ্ন করলেন, দোষ কি এক পক্ষের? একই প্রশ্ন করলেন নিরপেক্ষ এবং ইংরেজপক্ষ অনেক লেখক। লেন হাটন, গড়িমসি নীতির যিনি চূড়ান্ত প্রয়োগকর্তা, রেনোড তাঁকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ১৯৫৮-৫৯ সালের সিডনিতে শেষ টেস্টে। গত সিরিজে (১৯৬০) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরাই কি কম গিয়েছিল?

ডেইলী হ্যারল্ড পত্রিকায় ওরেলকে তীব্র ব্যক্তিগত আক্রমণ ক'রে চার্লস ব্রে লিখলেন—

> ওরেলের স্মৃতিশক্তি প্রয়োজনে কমে।......গত শীতে বার্বাডোজের প্রথম টেস্টে ওরেলের বিখ্যাত খেলার স্পষ্ট স্মৃতি আমার মনে আছে। একদিনে তিনি করলেন ১৭৭। পরদিন ১৬ রান তুলতে তাঁর লাগল ৯০ মিনিট এবং লাঞ্চ-বিরতির পরে, যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান ৫০০-এর উপরে, তখন তাঁর দান—মোট চার!
>
> ওয়েস্ট ইণ্ডিজে ওরেল ও তাঁর সহযোগীরা ইংলণ্ডের নাক বালিতে রগড়ে দেবার দু'টি সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু পকেটস্থ ম্যাচ জিতবার কোনো চেষ্টাই তাঁদের মধ্যে দেখা গেল না।...নিরাপদ হওয়ার আগে জিতবার কোনো চিন্তাই তাঁদের ছিল না।

সমালোচকেরা আরও জানালেন, ১৯৬০-৬১ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রানগতি আধুনিক কোনো টেস্ট সিরিজ থেকে নিশ্চয় দ্রুততর,—তারা প্রতি ১০০ বলে ৪৫.৫ রান করেছে, যেখানে অস্ট্রেলিয়া করেছে ৩৯.৯৮; কিন্তু এও তো ঠিক যে, গত শীতে যখন এম. সি. সি. ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফর করেছে, তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের রানগতি সফরকারীদের চেয়ে অধিকতর দ্রুত ছিল না।

বলা বাহুল্য ওরেল হেরে গেলেন তথ্যে। কিন্তু তাঁর পক্ষেও কিছু বলবার আছে। তাঁর তিক্ত সমালোচনার কারণ কিছু ছিল। তাঁর সমালোচনা তাঁর মনকে প্রকাশ করেছে, এও ঠিক। সে প্রসঙ্গে আমরা আসব পরে। এমন মেলবোর্নে শেষে টেস্টের কথায় ফিরে যাওয়া যাক।

টসে জিতেও বেনোড ব্যাটিং নিলেন না, প্রথম প্রভাতে হলের কলরব তিনি হয়ত সহ্য করতে চাইছিলেন না। কিংবা দুঃসাহসের সেই খেলা আবার দেখাতে চাইছিলেন, যে খেলায় তিনি খেলিয়েছিলেন ইংলণ্ডকে অব্যবহিত পূর্বের সিরিজে। টসে জিতেও যেসব ক্যাপ্টেন ব্যাট নেন নি, তাঁদের অধিকাংশকেই দুর্বিপাকের অপমান সহ্য করতে হয়েছে, বেনোডকে কিন্তু হয়নি,—হাটন তাই সে বার চেঁচিয়ে কেঁদে বলেছিলেন,, প্রভু গো, আর সবো কত অপমান?

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল ২৯২। সোবার্সের ৬৪, সলোমনের ৪৫, ল্যাসলির ৪১ সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য। মিশন পেলেন সর্বাধিক উইকেট—১৪—৩—৫৮—৪। অস্ট্রেলিয়া উত্তর দিল ভালভাবে প্রথম ইনিংসে, ৩৫৬; সিম্পসন—৭৫, ম্যাকডোনাল্ড—৯১, বার্জ—৬৮। বেশী উইকেট আদায় করলেন সোবার্স, ৪৪—৭—১২০—৫, এবং গিবস ৩৮·৪—১৮—৭৪—৪। হলের ৮টি নো বল পড়ল।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল—৩২১; হাণ্ট—৫২, আলেকজাণ্ডার—৭৩। বলে ডেভিডসনের সাফল্যই সবচেয়ে বেশী হল,—২৪·৭—৭—৮৪—৫।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটিং দায়িত্বহীনতা ও দৌরাত্ম্যে পূর্ণ ছিল। কয়েকটি উইকেট যেন ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজনের সময়ে সোবার্স (২১) প্রয়োজনীয় রান দিতে পারলেন না এবং কানহাই (৩১) মিশনের লঙ হপকে মিড উইকেটে বেনোডের হাতে তুলে দিয়ে যেন স্বেচ্ছায় বিদায় নিলেন। এই রকম ছেলেমানুষির আউট হয়েছিলেন স্মিথ প্রথম ইনিংসে, মিশনের ডাহা ফুলটসকে উৎসর্গ করেছিলেন ও'নীলের হাতে।

২৫৮ রান করলে জিততে পারবে এই অবস্থায় ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ওভারেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে আধখানা নিকেশ ক'রে দিল। কথাটা আলঙ্কারিক ভাবে নয়, বোধ হয় আক্ষরিক ভাবেই সত্য। হলের প্রথম ওভারে সিম্পসন ১৮ রান করলেন। হল অস্ট্রেলিয়াকে অনেক আঘাত করেছেন ইতিমধ্যে, বজ্র-বাম্পারে থেঁতলে দিয়েছেন দেহ, বিদ্যুৎগতিতে উড়িয়ে দিয়েছেন উইকেট। অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটারদের কাছে হল একটা যাচ্ছেতাই কিছু, শেষ পর্যন্ত টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-পক্ষে তাঁরই সর্বাধিক ২১টি উইকেট; এবং অ্যাভারেজে তিনি দ্বিতীয়।—

	ও	মে	রা	উ	গড়
হল—	১৪৫·৬	১৫	৬১৬	২১	২৯·৩

ব্রিসবেন টেস্টের 'টাই' ফলত এবং বলত হলেরই সৃষ্টি। অস্ট্রেলিয়ানরা ঠিক করল, শেষ মেলবোর্ন টেস্টকে হলাঘাতে নষ্ট হতে দেওয়া হবে না কিছুতে। হলকে মারো, নয় হলের হাতে মর—স্থির হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ান নীতি। হলই মরলেন—সিম্পসনের হাতে, একেবারে প্রথম ওভারেই। হলের প্রথম ওভারে ১৮ রান। অদম্য হলের মন গেল দমে, মাংসপেশীতে ধরল টান, বল পড়ল না ঠিক মত, ফিল্ডিং করবার সময়ে বেড়ার ধার থেকে ওভার-থ্রো করলেন প্রচুর, এবং মার্টিনের মহামূল্য ক্যাচটি ধরতে পারলেন না, ঠিকভাবে বলতে গেলে, ধরবার চেষ্টাই করলেন না।

ব্রিসবেনের প্রথম টেস্ট ও মেলবোর্নের শেষ টেস্টে হলের বোলিং-হিসেব পাশাপাশি তুলে দিচ্ছি—

ব্রিসবেন	২৯·৩—১—১৪০—৪
	১৭·৭—৩—৬৩—৫
মেলবোর্ন	১৫—১—৫৬—১
	৫—০—৪০—০

[দ্বিতীয় ইনিংসে হল তিনটি নো বল দিয়েছিলেন।]

মেলবোর্নে ওপেনিং ব্যাটসম্যান সিম্পসন দ্বিতীয় ইনিংসে ৯২ করলেন। তিনি যখন আউট হলেন তখন অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ১৫৪, খেলাটি অস্ট্রেলিয়ার হাতে। ও'নীলের চতুর্থ উইকেট গেল ১৭৬ রানের মাথায়, খেলায় অস্ট্রেলিয়ার আধিপত্য তখনো আছে; ২০০ রানে যখন হার্ভের পঞ্চম উইকেট গেল তখন কিন্তু অবস্থা অনিশ্চিত; ডেভিডসন এলেন, অস্ট্রেলিয়ার ৫ রান বাড়াবার পর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যেন সহসা গর্জে উঠল—ডেভিডসন ক্যাচ তুলেছেন সোবার্সের মাথায়—সোবার্স ভুল করেন না—ডেভিডসন গেলে পাল্লা সমান সমান হয়ে যায়—সোবার্স ক্যাচ মিস করলেন।

সে উইকেট পড়ল ২৩৬ রানে, যখন আর মাত্র ২২ রান হলেই অস্ট্রেলিয়ার জয়।

কিন্তু ২২ রানও একটা মস্ত রান, এমন কি ৪ রান পর্যন্ত,

যদি মনে থাকে এই পরমাশ্চর্য সিরিজের অলৌকিক সব ব্যাপারগুলি।

গ্রাউট আউট হয়ে গেলেন সোবার্সের বলে প্লেড অন হয়ে, তখন অস্ট্রেলিয়ার হাতে দু'টো উইকেট, চার রান বাকি জিতবার জন্য। এখনো ফলাফল কি হয় বলা যায় না। কিন্তু আম্পায়ার ঈগার আউট দিলেন না গ্রাউটকে। গ্রাউট অধিকন্তু আউটের মারে দলের দু' রান বাড়িয়ে নিলেন।

সেই অবস্থাতেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ লড়াই করেছে—শোকে ভূলুণ্ঠিত সলোমন ও ল্যাসলিকে ধমকে দাঁড় করিয়েছেন ওরেল—ভ্যালেণ্টাইন ও গিবসের সহযোগিতায় প্রথম শ্রেণীর বোলিং ক'রে গেছেন তিনি—ভ্যালেণ্টাইনের বলে আর কোনো রান যোগ না করেই গ্রাউট কট হয়েছেন—এবং তারপরে মার্টিনের ক্যাচ উঠেছে—

সে ক্যাচ ধরবার চেষ্টা করেন নি হল।

অস্ট্রেলিয়া জিতেছে দু' উইকেটে।

সিরিজ শেষ। ক্রিকেট-ইতিহাসের মহানতম সিরিজ। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে—লক্ষ কণ্ঠের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস পূর্ণ—হাজার হাজার মানুষ পাগলের মত ছুটছে সে দিকে—

থাক। ইতিহাস যেখানে শিখরাসীন আমি সেইখানে ফিরে যাই। এই সিরিজ জন্ম নিয়েছে এভারেস্টের শিরে। ব্রিসবেনের সেই প্রথম টেস্ট। "দি গ্রেটেস্ট টেস্ট অল"।

॥ পুরু ও আলেকজাণ্ডার ॥

দু'জন অধিনায়ককে মুখোমুখি দাঁড় করালে কেমন হয়—ওরেল এবং বেনোড।

ওরেল বললেন, আমি খেলা ছেড়ে দেব, আমার ভাল লাগছে না। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার মোহ আমার ঘুচেছে। আজ যদি

কোনো ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল এখানে হাজির হয়, তাহলে বিমানবন্দরে উপস্থিত হবার উৎসাহ পর্যন্ত আমার নেই।

কথাগুলো বলেছিলেন ওরেল ম্যাঞ্চেস্টারে, অর্থনীতি অধ্যয়নের সময়ে। ১৯৫৯-৬০ ভারত-পাকিস্তান সফরে তিনি অধিনায়ক হতে গররাজি হলেন।

টেস্ট ক্রিকেটের মনকষাকষি আর ঝামেলা আমার পোষাবে না,—ওরেল উদাসীন হয়ে বলেন।

৩৬ বছর বয়সে সেই ওরেলই কিন্তু অস্ট্রেলিয়া গেলেন অধিনায়ক হয়ে। তার এক বছর আগে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তন করেছেন। কোলি স্মিথের অকাল মৃত্যুতে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ব্যাটিং দুর্বল হয়ে পড়েছিল, দেশপ্রেমিক ওরেল এসেছিলেন দলের শক্তি সংরক্ষণের জন্য।

দীর্ঘদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেছেন ফ্রাঙ্কি। ইংলণ্ডে লীগ ক্রিকেট খেলে অন্নের সংস্থান করেছেন এই বিবাহিত ব্যক্তিটি। ক্রিকেট অনেক দেখেছেন আর ঘৃণাবোধ করেছেন ক্রিকেটের নামে যা চলেছে তার সম্বন্ধে। দুটো দল পরস্পরকে 'শত্রু' মনে করে। খেলার সময়ে পরস্পর মেশে না—'শত্রুর-সঙ্গে-মিশো-না' নীতি অনুযায়ী।

ওরেল যখন অস্ট্রেলিয়ায় দল নিয়ে চললেন, সে সব কথা তাঁর মনে ছিল। ভবিষ্যতে আমার জন্য আর ক্রিকেট নয়,—৩৬ বছর বয়সের ক্রিকেটার ঠিক ক'রে ফেলেছেন। এটা কি ক্রিকেট? ঘৃণাভরে ভেবেছেন নেগেটিভ ক্রিকেটের চেহারা দেখে। খেলায় আমোদ কর, হারো জেতো কিন্তু খেলে যাও; খেলাটা এবং জীবনটা বড় মজার,—জীবনদর্শন ঠিক হয়ে গেছে ওরেলের।

এমন মনের অধিনায়কই ১৯৬০-৬১ সিরিজ সম্ভব করতে পারেন, যাঁর কিছু চাইবার নেই কিন্তু দেবার আছে। যে পেয়েছে সব চেয়ে, যে দিয়েছে তাহার অধিক।

বেঁনোড বললেন, কিন্তু আমি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের নিন্দে করতে

পারি না। তারা ১৯৫৫ সিরিজে স্বদেশে ইনিংসে ৪০০ ক'রে রান করতে লাগল, কিন্তু তবু তারা হেরে গেল। কারণ ঐ রান তারা ক'রে ফেলত বড় দ্রুততালে—একদিনে ৩৫০-এর মত। এত তাড়াতাড়ি রান করা ৬ দিনের টেস্টের পক্ষে ক্ষতিকর, বিপক্ষদল ধীরে সুস্থে বেশী রান তুলতে পারে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ যখন ৪০০ করল আমরা করলাম ৬০০।

তবু, বেনোড বললেন, তার জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সমালোচনা করবার কথা ভাবতেই পারি না। খেলার প্রতি তাদের কী তীব্র আকর্ষণ। তাদের খেলা দেখে মনে হতে পারে, তারা যেন ছ'দিনের খেলায় তিন দিনের ক্রিকেট খেলছে, কিন্তু কী গৌরবময় খেলা! তাদের নীতি খুবই ঠিক, কেবল অসময়ে প্রযুক্ত।

খেলা সম্বন্ধে বেনোডের এই ধারণা। এই লেখক-ক্রিকেটারটি ক্রিকেট সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ কমে যাবার সম্ভাবনায় খুবই চিন্তিত। ক্রিকেট যদি আকর্ষণীয় না হয় মারের হররায়, তাহলে দর্শক অন্য আকর্ষণে ধরা দেবেই। কিন্তু দিনে পঞ্চাশ ওভারের ক্রিকেটে তা সম্ভব নয়, যাতে খুব বেশী হলে হয়ত ১৮০ রান উঠতে পারে। আগে দিনপিছু অনেক বেশী ওভার খেলা হত, রানও উঠত বেশী। আজ যদি দিনপিছু রানের সংখ্যা কমে গিয়ে থাকে তার অন্যতম কারণ, দিনপিছু বলের সংখ্যাও কমেছে। টেস্ট সিরিজে ওভারে গড়ে ৪ রান কখনো নিয়মিতভাবে করা যায়নি—ব্রাডম্যানের স্ফূর্তির দিনেও নয়।

বেনোড বেশ নাটকীয়ভাবে বলেছেন, দিনে ৮ বলের ১০০ ওভার বল এবং খেলতে ভালবাসে এমন ছোকরার দল দাও আমাদের,—পিটার মে, কলিন কাউড্রে বা আমাকে,—তারপরে দেখে নিও, তোমাদের স্বপ্ন-স্বর্ণযুগের মত খেলতে পারি কিনা আমরা।

১৯৬০-৬১ সিরিজের অল্প পূর্বে লিখিত, 'Way of cricket' বইতে রিচি বেনোড এই সব কথা আলোচনা করেছেন।

এমন এক রিচি বেনোড অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক হয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অমন এক অধিনায়ক ফ্রাঙ্কি ওরেলের যখন মুখোমুখি

দাঁড়ালেন ফ্রাঙ্ক তখন ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন—রিচির ডান হাতে আঘাত ছিল—তিনি বাঁ হাতে করমর্দন করলেন ; কিন্তু তাই বলে বাম হাতে উত্তাপ কম ছিল না,—বাঁ দিকেই থাকে হৃদয়।

'Way of cricket' বইয়ের শেষে পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত কয়েক পৃষ্ঠায় রিচি বেনোড লিখেছেন—

> এই বইয়ের প্রুফ যখন আমার কাছে ছিল তখন আমার জীবনের সুন্দরতম ক্রিকেট খেলবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল—ব্রিসবেনের 'টাই' হওয়া টেস্ট ম্যাচ।
>
> যে সমস্ত উপাদানের জন্য ক্রিকেট এখনো জগতের শ্রেষ্ঠতম খেলা, তার সব ক'টি পূর্ণভাবে বর্তমান ছিল ঐ খেলাটিতে।
>
> এই বইয়ে আমি ক্রিকেট সম্বন্ধে যে সব কথা বলতে চেয়েছি, তার শ্রেষ্ঠতর উপসংহার ঐ খেলাটি ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।

॥ প্রথম দিনের সূর্য ॥

১৯৬০ সালের ৯ই ডিসেম্বর। ব্রিসবেন মাঠ। হাজার দশেক দর্শক হাজির মাঠে। বাইশ জন খেলোয়াড়েরা দু'টি দল ক্রিকেট খেলবে। সিরিজের প্রথম টেস্টম্যাচ—অস্ট্রেলিয়া ও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ এর আগের বারে এসেছিল বছর দশেক আগে। সেই ১৯৫১-৫২ সালে তারা এসেছিল বিশাল প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তার ঠিক পূর্ব বৎসরে তারা ইংলণ্ডকে চূড়ান্তভাবে হারিয়েছিল। ১৯৫০ সালের ক্রিকেট-দুনিয়া ওরেল-উইকস-ওয়ালকট-রামাধীন-ভ্যালেণ্টাইনের নাম-সংকীর্তন করেছে ক্রিকেটের নব মহোৎসবে। বিশ্ববিজয়ী নির্ধারণের 'বেসরকারী প্রতিযোগিতায়' তারা ১৯৫১-৫২ সালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে পরাভূত হয়ে ফিরেছিল, যদিও ব্যক্তিগত সামর্থ্যে তাদের খেলোয়াড়রা শ্রেষ্ঠতর ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দশ বছর পরে ১৯৬০-৬১ সফরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ একই কথার উচ্চারণের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় পদার্পণ করেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে

চরম হারিয়ে 'বেসরকারী' বিশ্বপ্রতিযোগিতার ফাইন্যালে উঠে আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আছে ইংলণ্ডের সমপর্যায়ে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে অধিকন্তু দেখা দিয়েছে আবার কয়েকটি নতুন আগুন। অস্ট্রেলিয়ার অন্তরকে তারা জ্বালিয়ে তুলবে বলেই তো মনে হয়।

প্রথম টেস্টের আগে, দপ্‌ ক'রে জ্বলে ওঠা এবং হঠাৎ নিভে যাওয়ার খেলা দেখাতে লাগল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। সেইটেই তাদের সাধারণ রীতি। ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তারা হেরে গেল, অস্ট্রেলিয়ান একাদশের সঙ্গে ড্র করল, এডিলেডে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার কাছে না হেরে বাঁচল বৃষ্টির জন্য, মেলবোর্নে ভিক্টোরিয়াকে হারালো ইনিংসে, সিডনিতে নিউ সাউথ ওয়েলসের কাছে হারলো ইনিংসে, তারপর কুইন্সল্যাণ্ডের সঙ্গে ড্র করল এক মধ্যম স্তরের খেলায়।

ব্রিসবেনে ৯ই ডিসেম্বর যারা খেলতে নামল, তাদের মধ্যে আছেন ওরেল,—বহুযুদ্ধের সংগ্রামসিংহ, ছত্রিশ বছর বয়সেও ব্যাট ধরে রান করতে পারেন, বল দিলে পেয়ে যান উইকেট, প্রসন্ন ও প্রফুল্ল ব্যক্তিত্বে মাঠে থাকলেই যিনি মাঠের রাজকুমার। হাটনের সর্বোচ্চ টেস্ট স্কোর ভঙ্গকারী সোবার্সকে দেখা গেল,—যাঁর প্রথম দিকের ব্যর্থ খেলাগুলি তাঁর বিষয়ে অস্ট্রেলিয়ান সমালোচকদের সংশয়কুটিল ক'রে রেখেছিল। ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ২৫২ রানের (এবং অন্যত্র এই জাতীয় আরো কিছু ইনিংসের) কানহাই নেমেছেন, যিনি অস্ট্রেলিয়ানদের প্রশংসা পেলেও এখনো প্রত্যয় পাননি সম্পূর্ণ, কারণ এ ধরনের হঠাৎ ঝলক টেস্টের আগে আরো অনেকের মধ্যে পূর্বে দেখা গেছে, যথা ভারতীয় অমরনাথ। বাকি ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে সি হাণ্ট,—ওপেনিং ব্যাটসম্যানের পক্ষে বিস্ময়করভাবে স্বাধীন স্ট্রোক প্লেয়ার; আলেকজাণ্ডার,—উইকেটকীপার হলেও গণ্য ব্যাটসম্যান; রামাধীন,—আগে আশ্চর্যজনক বল দিতেন, এখনো ভালো বল দেন মাঝে মাঝে; ভ্যালেণ্টাইন,—রীতিমাফিক স্পিনে অস্ট্রেলিয়ানদের যিনি দাবিয়ে রেখেছিলেন ১৯৫১-৫২ সিরিজে, এবারও এই প্রত্যাশায় তাঁকে আনা হয়েছে; এবং হল—

হল একটা বৃহৎ ব্যাপার। যেমন চেহারা, তেমনি বলের জোর। তেমনি মেজাজ। বুনো বোলিংয়ে ভয়ঙ্কর, সরল প্রাকৃতিক হাসিতে স্বচ্ছ-হৃদয়। মেয়েদের কাছে জ্যান্ত আফ্রিকান লোকশিল্প। 'মেয়েরা তার বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনবে না।' হল বল দিক ভয়াবহ গতিতে, প্রতি ওভারে বাম্পার ছাড়ুক, তাতে নাড়া খাক আম্পায়ারের আইন বই এবং ব্যাটসম্যানের 'গতর', তবু সে মেয়েদের কাছে 'লাওলি'। সে না থাকলে মাঠে মাতিয়ে রাখবে কে? সাঁ ক'রে উইকেট উড়িয়ে দেওয়ার মত বীরকর্ম ছাড়াও কে ভঙ্গি ক'রে হাসাবে মাঠে,—ব্যাট ধরতে না জেনেও প্রচণ্ড ব্যাটিং ক'রে মাতাবে সকলকে? সুতরাং হল,—মেয়েরা যারা ক্রিকেটের জন্য মাঠে যায়, আরো যায় ক্রিকেটের চেয়ে বড় কিছুর জন্য,—তাদের কাছে হল—মিষ্টিটা, দুষ্টুটা!

সেই হল আছেন মাঠে। হল,—কানহাই বলেছেন, নেটে যার বিরুদ্ধে খেলবার সময়ে অনিচ্ছাতেও পায়ে শিহরণ জাগে,—যে হল হয়ত কিছু এলোমেলো, কিন্তু যুদ্ধকালে এলোমেলো-নির্বিচার বোমাবর্ষণে ধূলিসাৎ ক'রে নিতে পারে জনপদ—সেই হল।

অস্ট্রেলিয়ান শিবিরের কেন্দ্রে সেনাপতি বেনোড,—মর্যাদায় ধীর, বুদ্ধিতে কুশাগ্র, বলে বিষম এবং অধিনায়কতায় উদ্দীপক। বেনোডই ইদানীং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লেগব্রেক বোলার; তাঁর অধিনায়ককালে অস্ট্রেলিয়া কোনো সিরিজ হারায় নি; এক কথায় অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের নতুন যুদ্ধপরিষদে তিনি যোগ্য প্রধান সেনাপতি। বেনোডের পরেই আসছেন বোনোডের বন্ধু ডেভিডসন। বেনোড বলেন, আমার আগেই সে আছে।—'পৃথিবীতে এখন শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার কে, সে সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অনেকে আমি ও ডেভিডসন এই দু'জনের নাম ক'রে থাকে, কিন্তু কথাটা মূল্যহীন, কারণ অ্যালানই যে শ্রেষ্ঠ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, থাকতে পারে না,'—বেনোড লিখেছেন।

আমাদের ধারণায় কথাটা সত্য। নিশ্চয় সত্য নয় ডেভিডসনের ধারণায়; তিনি বই লিখলে বেনোডকেই প্রথমে বসাতেন।

ডেভিডসনের বল এবং ব্যাট, গ্রাউটের উইকেটকীপিং, নতুন তারকা সিম্পসনের অনর্গল রানের সম্ভাবনা, ম্যাকডোন্যাল্ডের ধীর আত্মরক্ষা, ম্যাকে ও ফ্যাভেলের সময়মত এগিয়ে আসা এবং হার্ভে ও ও'নীলের প্রতিভা।

ব্রাডম্যান তাঁর তিনটি বামন পদের অন্তত দু'টি দান ক'রে গিয়েছিলেন নীল হার্ভেকে। ক্ষুদ্রাকার লঘুপদ বামহস্ত নীল হার্ভে ব্রাডম্যানের পরে শ্রেষ্ঠ অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান। ব্রাডম্যানের রেকর্ডের পিছনে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। হার্ভে যদি আর একটু হিসেবী এবং রেকর্ডলোভী হতেন, তাহলে কোথায় উঠতেন কেউ বলতে পারবে না—রিচি বেনোডের সুস্পষ্ট মত তাই।

নর্ম্যান ও'নীল দোসরা ব্রাডম্যান হোন বা না হোন পয়লা ব্যাটসম্যান তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পৃথিবীর প্রথম সারিতে দাঁড়াবার মত সব কিছু তাঁর আছে, অভিজ্ঞতাটুকু ছাড়া। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের যেমন সোবার্স এবং কানহাই, অস্ট্রেলিয়ার তেমনি হার্ভে এবং ও'নীল।

টসে জিতে ওরেল ব্যাট তুলে দিলেন হাণ্ট ও স্মিথের হাতে। দিনের শেষে ব্যাট হাতে ক'রে ফিরে এলেন আলেকজাণ্ডার এবং রামাধীন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করেছে ৭ উইকেটে ৩৫৯। ক্রিকেট এর থেকে আর কোন্ উঁচুতে উঠবে!

সাড়ে তিনশোর উপর রান একদিনে, যেখানে তিনটে উইকেট পড়ে গিয়েছিল ৬৫ রানের মধ্যে। হাণ্ট এবং স্মিথ সূচনায় নেমে ব্যাটের নতুন প্রয়োগবিধি দেখিয়েছিলেন,—ডেভিডসনের তৃতীয় বল বাউণ্ডারীতে গিয়েছিল হাণ্টের প্রচণ্ড তাড়নায়, তার পরের বলটিও, সহযোগী ক্যামি স্মিথও বাউণ্ডারীর সন্ধানে পেছিয়ে ছিলেন না, আর পেছিয়ে ছিলেন না ডেভিডসন, মার খেয়ে তিনিও ফিরে মার দিলেন,—হাণ্ট, স্মিথ এবং কানহাই তিনজনই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে বিদায় নিলেন ডেভিডসনের ধাক্কায়।

দু'টো উইকেট পড়বার পরে 'সোবার্স' নেমেছিলেন। তাঁর

মরণারতি দেখা গেল ডেভিডসনের অফ স্টাম্পের বাইরের বলে ব্যাট চালাবার বাসনা থেকে। বড় ব্যাটসম্যানে লক্ষণ সোবার্স এখনো দেখাননি; বেনোড তাঁর কাছে যেন খুবই দুর্জ্ঞেয়, বিপদের মুখে যথেষ্ট বিবেচক নন তিনি, অতএব—

৬৫ রানে তৃতীয় উইকেট পড়বার পরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চতুর্থ উইকেট পড়েছিল ২৩৯ রানে। সে উইকেট সোবার্সের।

সোবার্স—১৩২।

সোবার্স ছাড়া ভাল রান করেছিলেন প্রথম দিনে ওরেল—৬৫,—গাম্ভীর্যে উন্নত যে ইনিংসটির উপরে সোবার্সের পরমাশ্চর্য ১৩২ নির্মিত হয়েছিল;—সলোমন—৬৫,—প্রয়োজনীয় একটি রানসংখ্যা,—নয়ন-মোহন না হলেও রীতিসিদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত; এবং আলেকজাণ্ডারের নট আউট ২১,—১০৫ মিনিটের ধৈর্যের সৃষ্টি।

প্রথম দিনের মূল কথা, সোবার্স। তাঁর কীর্তিতে মোহিত সমালোচকেরা ইতিহাসের রসচর্বণা করেছেন। ডেভিডসন-বেনোডের প্রখর বুদ্ধির ও নৈপুণ্যের বিরুদ্ধে ঝলসিত ও বিলসিত হয়েছে নানা লীলায় বিজয়ী বীরের তরবারি। যে ডেভিডসন এক ঘণ্টার মধ্যে মুঠোখানেক রানের বিনিময়ে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন স্মিথ, হাণ্ট এবং কানহাইকে, সেই ডেভিডসনের পরবর্তী উৎকৃষ্ট বলগুলি সোবার্সকে পরীক্ষা করবার ও পরীক্ষান্তে মূল্যবান ক'রে তুলবার কষ্টিপাথর। বেনোডেরও সেই ভূমিকা। ডেভিডসন তবু সবসুদ্ধ (প্রভাতের আহারসুদ্ধ) মোট চারটে উইকেট পেয়েছিলেন,—বেনোডের অবস্থা—হায়রে? কাঁদো বাছা কাঁদো,—১৯ ওভার বল, মেডেন নেই—৭৩ রান—শূন্য উইকেট। সমালোচকেরা স্বীকার করেন, বলের নিয়ন্ত্রণ, পরিবর্তন এবং বক্রতার বাহাদুরিতে বেনোড এই দিন প্রথম শ্রেণীর বোলিং করেছিলেন।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সোবার্স একভাবে খেলেছেন। একই মার্জিত মহিমায় এবং আত্মস্থ অহঙ্কারে। আজ আমার দিন, আমি রাজাধিরাজ, আমার কাছে বোলারেরা করদ রাজার তুল্য; তারা বলের

কর দিয়ে যাবে উপঢৌকনরূপে, আমি যথেচ্ছ তাকে নেব, ছড়াব, ছুঁড়ে ফেলে দেব ঐশ্বর্যশালীর গরিমায়, বোলারদের সম্বন্ধে সোবার্সের মনোভাব ছিল এই ধরনের। বেনোডকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখছিলেন সোবার্স। এই লোকটা—এই লোকটাই আমাকে সিডনিতে বোল্ড ক'রে দিয়েছে ; লোকটাকে আজ হাতের ব্যাট দিয়ে একবার মেপে দেখব ; ওকে শেষ করবই ; ব্যস্ততার দরকার কি, নির্বিকার সংহার যাকে বলে ; দেখিনা লোকটার জারিজুরি কতখানি,—সোবার্স ভেবে চলেন। বেনোডের দ্বিতীয় ওভার লক্ষ্য করার পরে তৃতীয় ওভারের চার বলের তিনটি বল পাগলা বেগে ছুটে গেল বাউণ্ডারীতে। তৃতীয় বাউণ্ডারীর সঙ্গে সঙ্গে সোবার্স পৌঁছে গেলেন ৫০ রানে,—সময় ৫৭ মিনিট, তার মধ্যে ৮টি চার। সোবার্স-ওরেল জুটির ৫০ হল ৪১ মিনিটে,—সোবার্স করেছেন ৪১, ওরেল ৯। লাঞ্চের সময়ে ১২০ মিনিটে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৩—১৩০।

লাঞ্চের পরে সোবার্স ৩১টি টেস্টে ৩০০০ রানে পৌঁছলেন ৭৯ রান ক'রে। বেনোডকে সোজা বাউণ্ডারীতে পাঠালে জুটির ১০০ রান হল ৯০ মিনিটে তার মধ্যে ওরেলের ৩৮, সোবার্সের ৬২।

সোবার্সকে দমানো অসম্ভব হয়ে উঠল। ঔদ্ধত্যের সৌন্দর্যে তিনি বেনোড—ডিভিডসন—ম্যাকে—মেকিফ সকলকে নিয়ে খেলতে লাগলেন। বেনোডকে এমন পেটালেন যে, হাতের পাশ দিয়ে ছুটে যাওয়া বলে হাত দিতে ভয় পেলেন বেনোড।

একমাত্র সম্ভব বস্তুরূপে সোবার্স সেঞ্চুরী করলেন। ১২৫ মিনিট সময়, ১৫টি বাউণ্ডারী। তাঁর দশম টেস্ট সেঞ্চুরী। বেনোড সাদরে সাগ্রহে করমর্দন করলেন। দূর থেকে করমর্দনের হাত বাড়িয়ে নাড়াতে লাগল দর্শকেরা।

ছুটো পঁচিশ মিনিটের 'অবিশ্বাস সময়ে'* ২০০ রান হওয়ায় নতুন

* 'অবিশ্বাস্য' শব্দটি ফিঙ্গলটন দৃষ্টান্তে ব্যাখ্যা করেছেন। এই মাঠের ঠিক পূর্বের টেস্টে বেইলী সাড়ে সাত ঘণ্টা ব্যাট ক'রে ৬৮ রান করেছিলেন। প্রতিদিনের সমষ্টিগত রানসংখ্যা ছিল ১৪২, ১৪৮, ১২২ ও ১০৬।

বল এল। নতুন বল নতুন প্রেরণা দিল, বোলারদের নয়, ব্যাটস-ম্যানদের। সোবার্সের মারের চোটে জখম হাত বগলে পুরে ম্যাকডোনাল্ড নাচতে লাগলেন; সোবার্সও অন্যদের নতুন নাচের সুযোগ দিতে লাগলেন মুহুর্মুহু।

সোবার্স বিদায় নিলেন যাকে বলা হয়েছে, 'দিনের সবচেয়ে বাজে বলে'। সোবার্সের রান যখন ১৩২ (বাউণ্ডারীতে ৮৪), খেলেছেন ১৭৪ মিনিট, বোলারেরা যখন আকাশের দিকে হাত সুইং ক'রে গডকে ডাকছে বলে-বলে, ঠিক তখনি লেগস্টাম্প থেকে অনেক দূরের একটি ওয়াইড ফুলটসকে ব্যাটের পিছন দিকে লাগিয়ে মিড অনে ক্লাইনের হাতে শ্রীযুক্ত সোবার্স তুলে নিলেন। মহতের অধম মৃত্যু। সোবার্স ক্লাসিক্যাল ইনিংস খেলেছিলেন,—'হোমারীয় খেলা',—সেই ইনিংসের সমাপ্তি হল ভারতীয় ক্লাসিকসের রীতিতে, যেখানে পরম মানবদের মরতে হয় তুচ্ছভাবে। আউট হবার পরে সোবার্স চুপ ক'রে দাঁড়ালেন, নিঃশ্বাস পড়ল ক্ষোভের, মাথা নাড়ালেন আক্ষেপে, তারপরে বিপুল অভিনন্দনের করবাদ্যধ্বনির তরঙ্গের উপর পা ফেলে এগিয়ে গেলেন প্যাভিলিয়নের দিকে।

অমেয়—অমর—অপূর্ব—।

স্থির মস্তিষ্কে দর্শক, লেখক, খেলোয়াড়,—সকলে সোবার্সের ইনিংসের গুণোৎকর্ষ বিচার করতে লাগল। আধুনিকরা অনেকেই বলল,—অনন্য। প্রাচীনেরা বলল, পুরাতনের কাছাকাছি। মধ্যবয়সীরা বলল,—সর্বোত্তমের স্তরে। ওরেল বলেছিলেন, সোবার্সকে এত ভাল খেলতে আমি কখনো দেখিনি, বিশেষত বিপদ মাথায় ক'রে যখন তাকে খেলতে হয়েছে। বেনোড বলেছিলেন, আমার দেখা সেরা ইনিংস।—আহা, কিভাবে সে গুড লেংথ বলগুলোকে বাউণ্ডারীতে পাঠাচ্ছিল—কিভাবেই না সে ফিল্ডারের মধ্যে ফাঁক খুঁজে বল চালাচ্ছিল তার ভিতর দিয়ে। ফিঙ্গলটনের মত ক্রিকেটার-লেখক সোবার্সের ইনিংসকে তুলনা করলেন তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ কয়েকটি ইনিংসের সঙ্গে।—

ম্যাককেবের কথা সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে এল। ১৯৩২ সালে সিডনিতে লারউড-ভোসের হিংস্র বডিলাইন আক্রমণের বিরুদ্ধে তাঁর চিরস্মরণীয় ১৮৭ নট আউট। ১৯৩৫ সালে জোহানেসবার্গের 'লাফানো পিচে' ও 'নিভানো' আলোয় তাঁর ১৮৯ নট আউট। ১৯৩৮ সালে নটিংহ্যামে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে তাঁর অত্যুৎকৃষ্ট ২৩২ রানও আছে। আমি এই তিনটি ইনিংসই দেখেছি,—তিনটি খেলাতেই অংশ নিয়েছিলাম। আমাদের বিরুদ্ধে হ্যামণ্ডের ১৯৩৮ সালে লর্ডসে করা অমূল্য দ্বিশতাধিক রানের কথাও মনে পড়ল। ডাডলে নর্স ১৯৩৫ সালে জোহানেসবার্গের পূর্বোক্ত খেলাতেই একটি অবিস্মরণীয় ডবল সেঞ্চুরী করেছিলেন। সিডনিতে যুদ্ধোত্তর কালে লেন হাটন ছোট আকারের চূড়ান্ত খেলা খেলেছিলেন; ১৯৫৯ সালে মেলবোর্নে কলিন কাউড্রের কাছ থেকে অনুরূপ একটি ইনিংসের মাণিক্য আমরা পেয়েছি।

উত্তর-তিরিশ ক্রিকেটারদের মধ্যে ম্যাককেব দুর্লভ সৃষ্টিতে অদ্বিতীয়। এ গৌরব ব্রাডম্যান-হ্যামণ্ডের যুগের খেলোয়াড় হয়েও তাঁর থেকে গেছে। তিনি সবচেয়ে বড়ো ক্রিকেটার নন, অথচ তিনি সবচেয়ে বড়ো ইনিংসে খেলেছেন। একবার নয়, একাধিকবার। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ ইনিংসের বিচার করতে হলে ম্যাককেবের রচনাকে মানদণ্ড রূপে হাজির করা হয় সর্বসময়। এই প্রসঙ্গে ব্রাডম্যানের ১৯৩০ সালের লীডসের ইনিংসের উল্লেখ করেছেন ফিঙ্গলটন, যে খেলায় ব্রাডম্যান লাঞ্চের আগে সেঞ্চুরী, চা-এর আগে ডবল সেঞ্চুরী এবং সমাপ্তির আগে ট্রিপল সেঞ্চুরী করেছিলেন। ফিঙ্গলটন খেলাটি নিজে দেখেন নি, এবং ব্রাডম্যান স্বয়ং লীডসের ঐ ইনিংসটি সম্বন্ধে বিশেষ উচ্ছ্বসিত নন। তাঁর ধারণা ঐ ইনিংসে তাঁর মার কখনো কখনো ত্রুটিযুক্ত হয়েছে। তার তুলনায় ব্রাডম্যান তাঁর ১৯৩০-এর লর্ডসের ২৫৪-কেই উচ্চতর মনে করেন। সে খেলাটি তাঁর মতে তাঁর অগণ্য ইনিংস-তারকার মধ্যে আঙ্গিকনৈপুণ্যে চন্দ্রমাসদৃশ।

ম্যাককেবের ১৯৩২ সালের ১৮৭ সম্বন্ধে ব্রাডম্যান লিখেছেন—

আমি খেলতে না পারলেও খেলাটি দেখেছিলাম। আমি এখনো তরুণ স্ট্যান ম্যাককেবের দুঃসাহসিক দীপ্তি চোখের সামনে দেখতে পাই, যিনি ১৮৭

নট আউট-এর দ্বারা তাঁর প্রথম টেস্ট সেঞ্চুরী লাভ করলেন। ইনিংসের শেষের দিকে তিনি বোলিংকে যেন চাবকে শায়েস্তা ক'রে দিলেন, এবং টিম ওয়ালের সহযোগিতায় আধঘণ্টার কম সময়ে দশম উইকেটে ৫৫ রান করলেন,—যার মধ্যে টিমের দান ৪ রান। পরবর্তীকালে ট্রেণ্ট ব্রিজের ইনিংসকে বাদ দিলে ম্যাককেবকে এমন আধিপত্য বিস্তার করতে আর কখনো দেখা যায়নি, এবং ঐ ধরনের সুপরিকল্পিত, স্থিরসংকল্প ও অগ্নিভীষণ আক্রমণকে অন্য কোনো খেলোয়াড় ঐ ভাবে ধ্বংস করতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ হয়।

ম্যাককেবের ১৯৩৮ সালের নটিংহাম টেস্টের খেলা সম্বন্ধে ব্রাডম্যানের বক্তব্য এবার উদ্ধৃত করা যাক। ম্যাককেবের অন্য ইনিংসের উল্লেখও তিনি করেছেন এই প্রসঙ্গে—

গ্রন্থের এই অংশে (শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানদের তালিকায়) ম্যাককেবকে আমি অন্তর্ভুক্ত করেছি; তার যদি অন্য কোনো কারণ নাও থাকে একটি কারণ আছে—১৯৩৮ সালে নটিংহামের প্রথম টেস্টে তাঁর ২৩২ রানের ইনিংসের উল্লেখ আমাকে করতেই হবে।

সেইটেই হল সবচেয়ে বড় ইনিংস, যা আমি দেখেছি বা দেখবার আশা করতে পারি। ব্যাপারটা আপনাদের বলা যাক।

ইংলণ্ড প্রথম ব্যাট ক'রে ৮ উইকেটে ৬৫৮ রানে ইনিংস ছেড়ে দিল। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে জয়ের প্রশ্নই ওঠে না। আমরা কি খেলাটিকে ড্র করতেও পারব?

মনে হল সেটাও অসম্ভব যখন দেখা গেল ১৯৪ রানে আমাদের ৬টি উইকেট পড়ে গেছে। ম্যাককেবকে বাদ দিয়েই আমরা হিসেব করেছিলাম।

বার্নেট, ওরিলি, ম্যাককর্মিক এবং ফ্লিটউডস্মিথের উপর অপর প্রান্ত রক্ষা করবার ব্যাপারে আমরা নির্ভর করেছিলাম (যাদের মধ্যে একমাত্র বার্নেটেরই ছিটেফোঁটা 'ব্যাটসম্যানী' জানা আছে), সে সবদিকে খেয়াল না ক'রে স্ট্যান বোলিং নিয়ে তাঁর কাজ শুরু ক'রে দিলেন, কাজটা সেরে ফেলতে হবে এই ভঙ্গিতে।

৩০০ রানের মধ্যে ম্যাককেব করলেন ২৩২। শেষের দিকে খেলাটি দেখবার সামর্থ্যও আমার হারিয়ে গিয়েছিল। তাঁর মারের মহিমা পান করতে করতে আমার দু'চোখ জলে ভরে গেল।

রাইটের তিন ওভারে ৪৪ রান হল। শেষের দিকে, ফিল্ডসম্যানের দ্বারা ঘেরাও করা বাউণ্ডারী-সীমানার বাইরে বল পাঠিয়ে ম্যাককেব ২৮ মিনিটে ৭৫ রান করলেন,—ফ্লিটউডস্মিথের সঙ্গে শেষ উইকেটের জুটিতে যে সময়ে মোট রান হয়েছিল ৭৭।

এ রকম ক্রিকেট আমি আর কখনো দেখব না। এই পরম-চমৎকার প্রদর্শনী বর্ণনা করবার যোগ্য আমি নিজেকে কখনো মনে করি না।

তাই 'দি ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় এই খেলা সম্বন্ধে নেভিল কার্ডাস যা লিখেছেন, তা উদ্ধৃত করছি।—

'আজ ম্যাককেব প্রথম টেস্টকে বিরাট ও মহান ইনিংস দিয়ে গৌরবান্বিত করেছেন। ম্যাককেব অতি সংকটক্ষণকে অতি সহজে পরিবর্তিত করেছেন ওস্তাদের চাবিকাটি দিয়ে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তিনি বোলিংকে বিচূর্ণ ক'রে মাঠের উপর আধিপত্য বিস্তার ক'রে ফেললেন, যে মাঠকে তাঁর পূর্বে সুদীর্ঘ সময় ধরে ঘন জালে ঘেরা ফাঁদের মত মনে হচ্ছিল।

তাঁর সুমোহন বীরত্ব আমাদের হৃদয় জয় ক'রে নিয়েছিল।

যথার্থ অভিজাতের ভব্যতা, রুচি ও সংযমের সঙ্গে ম্যাককেব ইংরেজ-পক্ষের আক্রমণকে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছিলেন।······জড়োয়ার অলঙ্কারের মত ছিল তাঁর বাউণ্ডারীগুলো, যাদের তিনি হাতে ক'রে নাচাচ্ছিলেন।

লাঞ্চের পরে আধ ঘণ্টায় তিনি প্রায় ৫০ রান করলেন—অব্যস্ত কিন্তু তীক্ষ্ণভাবে। উন্নত অথচ নমনীয় ম্যাককেব কাট, গ্লান্স এবং ড্রাইভ মেরে চললেন,—তাঁর স্পর্শের অভ্রান্ততা আমাদের সৌন্দর্য-সত্তাকে আলোড়িত ক'রে তুলল। আনন্দরম্য এই ক্রিকেট, যাতে বল আছে কিন্তু বর্বরতা নেই, শক্তি আছে কিন্তু লালসা নেই, আঘাত আছে, নেই অপঘাত, যা সুযোগসন্ধানে অদ্বিতীয় অথচ নীচতায় আক্রান্ত নয়, যা উজ্জ্বল, উচ্ছ্বসিত ও ছন্দোময়,—রসিকের কাছে যা সাহস-সুন্দর সহাস্য সৃষ্টি,—সে সকলই কিন্তু করা হয়েছিল পরাজয়ের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে।

রাইটের এক ওভারে বাউণ্ডারীর ছটায় তিনি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর ইনিংস জ্বলতে লাগল অত্যুজ্জ্বল বিভায়, অভ্রান্ত বিচারের সঙ্গে তিনি বোলিংকে আয়ত্তে রাখলেন এবং তাঁর

সহযোগী স্মিটউডফিথ অপরপ্রান্তে অপেক্ষা ক'রে রইলেন আমাদেরই মত দর্শকের ভূমিকায়।

এই জৌলুসে ভরা ইনিংসের একটি স্থির কেন্দ্রবিন্দু ছিল; তা হল ম্যাককেবের মন, ঘূর্ণি ঝড়টিকে যা নিয়ন্ত্রিত করছিল; ম্যাককেবের হস্তোৎক্ষিপ্ত তারকাগুলি তীব্র দীপ্তিতে নিরাপদে ছুটে চলছিল নির্দিষ্ট লক্ষ্যে—কোনো এক মাধ্যাকর্ষণের মহানিয়মে।

ক্রিকেটের ইতিহাসের একটি শ্রেষ্ঠ ইনিংস—সর্বযুগের, সর্বকালের। হৃদয়কে উদ্বেল ক'রে তোলে এমন স্পন্দমান ক্রিকেট। ট্রাম্পারের পথে তাঁর আবির্ভাব,—ট্রাম্পারের তরবারি ও বর্মের একমাত্র উত্তরাধিকারী,—ম্যাককেব।'

এই এপিক সৃষ্টির পরে স্ট্যান যখন ড্রেসিংরুমে ফিরে এলেন তখন তাঁর ইনিংসের অপূর্ব ঐশ্বর্যমহিমায় আমি এমনই অভিভূত যে, কথা বলবার ক্ষমতা আমার তখন হারিয়ে গেছে।

যা হোক আমি তাঁর ঘর্মাক্ত হাত চেপে ধরলুম। সুশিক্ষিত রেসের ঘোড়ার মতই ম্যাককেব থরথর করছিলেন। অভিনন্দন জানাবার পরে আমি যে-কথাগুলি তাঁকে বলেছিলুম তা এখনো আমার স্মরণে আছে,—'স্ট্যান, ঐ রকম একটা ইনিংস খেলবার জন্য আমি অনেক কিছু দিতে রাজী আছি।' অপরের নৈপুণ্যের বন্দনায় এর চেয়ে বেশী আন্তরিক অন্য কোনো অধিনায়ক আর কখনো বোধহয় হয়নি।

ম্যাককেব ইংলণ্ডের বিপক্ষে আরো একটি অসাধারণ ইনিংস একবার খেলেছিলেন।

সেটা হল ১৯৩২ সালে সিডনিতে জার্ডিনের দলের বিরুদ্ধে—প্রথম টেস্টে তাঁর ১৩৭ নট আউট।

যে সব অস্ট্রেলিয়ান খেলাটি দেখেছেন সেটিকে তাঁরা মাস্টারপিস বলেই গণ্য করেন। তা ঠিকই, কিন্তু তবু নটিংহাম-ইনিংসের তুলনায় সিডনি-ইনিংসটি হীরকের কাছে নীলা।

সামর্থ্য ও শিল্পের এমন উচ্চমাত্রার সমন্বয় ঘটাতে খুব কম খেলোয়াড়কেই দেখা গিয়েছে।

১৯৩৫ সালে সাউথ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে তাঁর ১৮৯ নট আউটের উল্লেখ না করলে ম্যাককেবের সম্বন্ধে প্রধান কথাগুলি বলে ওঠা হবে না।

আমি সে ইনিংস দেখিনি। যাঁরা দেখেছেন তাঁরা তার দ্যুতিচ্ছুরিত মারের সৌন্দর্যে মোহিত।

সে ইনিংসের একটি স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হল—ইনিংসের শেষের দিকে আলোর অবস্থা এমনই শোচনীয় ছিল যে, ফিল্ডিং-ক্যাপ্টেন ওয়েড কম আলোর বিরুদ্ধে আবেদন জানিয়েছিলেন। টেস্ট-ইতিহাসে এর দ্বিতীয় কোনো নজির আছে? মনে তো হয় না।"

গারফিল্ড সোবার্সের ব্রিসবেন-ইনিংসকে ম্যাককেবের ঐ সব ইনিংসের সমপর্যায়ের বলে গণ্য করা হয়েছে।

তার থেকে বড় গৌরব আর কি হতে পারে!

॥ মধ্যম দিন ॥

দ্বিতীয় দিনে আরও প্রায় একশো রান যোগ ক'রে ৪৫৩ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংস শেষ হল। ৪৪৫ মিনিটে ৪৫৩ রান, ক্রিকেটের পরিভাষায়, ঘড়ির থেকে দ্রুত গতি। প্রথম ইনিংস আরম্ভ ক'রে অস্ট্রেলিয়া তদুত্তরে দিনশেষে করল তিন উইকেটে ১৯৬।

দ্বিতীয় দিনে মোট রান উঠেছিল ২৯০। আধুনিক টেস্ট ক্রিকেটের পক্ষে রীতিমত দ্রুত রান, কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়ার এই সিরিজের পক্ষে যথেষ্ট দ্রুত নয়। অস্ট্রেলিয়ার রান-গতি অপেক্ষাকৃত শ্লথ ছিল, তার জন্য দায়ী করা হয়েছে ওরেলকে, যিনি 'টাইট' আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তা করেছিলেন বুদ্ধিমানের মতো। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে বেনোডের সমালোচনার কথা। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সুমহান ক্রিকেট খেলে, দিনে সাড়ে তিনশো রান করে, কিন্তু তা করে একটু বেশী রকম দ্রুতগতিতে। ওটা তিন দিনের ক্রিকেট, পাঁচ বা ছ'দিনের নয়।

ওরেল 'তিন দিনের ক্রিকেট'কে ছ'দিনের দিকে বিলম্বিত করতে চেয়েছিলেন আঁটো বোলিং ও ফিল্ডিং-এর দ্বারা, যদিও বারো দিনের

ক্রিকেট খেলবার (ইংলণ্ড-ভারত-পাকিস্তান যা খেলে) দুরভিসন্ধি তাঁর মনে ছিল না।

শনিবারের দ্বিতীয় দিনে দর্শকসংখ্যা ছিল সর্বাধিক, ষোল হাজার। তারা কিন্তু সবচেয়ে বড় খেলা দেখতে পায়নি, যদিও সকালে উচ্ছল আনন্দের কিছু আস্বাদ তারা পেয়েছিল। আলেকজাণ্ডার প্রথম দিনে ধীর গতিতে খেলে ১০৫ মিনিটে ২১ রান করলেও দ্বিতীয় দিনে অপেক্ষাকৃত দ্রুত রান তুলেছিলেন,—৮৫ মিনিটে ৩৯ রান,—তাঁর ভূমিকা ছিল দলের পক্ষে অতি গুরুত্বপূর্ণ,—এসেছিলেন দলের ২৮৩ রানের সময়, গিয়েছিলেন ৪৫৩ রানের মাথায়—মোট রান করেছিলেন ৬০।

অলেকজাণ্ডারের মূল্যবান ইনিংসে ছিল সঞ্চয়ের সম্পদ, অপরদিকে দু'হাতে ঝড়ের 'ফল' কুড়িয়েছিলেন ওয়েসলি হল। রামাধীন আউট হবার পরে হল খেলতে নেমে দেখিয়ে দিলেন নিজের 'শেক্সপীরীয়' প্রতিভা, মধুসূদন দত্ত যেমন দেখিয়েছিলেন। নিউটনের থেকে শেক্সপীয়ার বড় একথা প্রমাণ করতে অগ্রসর অঙ্কবিতৃষ্ণ মধুসূদন শক্ত আঁক কষে এসেছিলেন অবহেলাভরে। বোলার হল ব্যাটিং সম্বন্ধে তাই দেখালেন। হল মাঠে ব্যাট নিয়ে কৌতুক করেন, 'লাগে তুক না লাগে তাক' বলে ভীমের গদা চালান, কিন্তু ছোকরা বড় সিরিয়াস, বল ফসকে গেলে আর একবার বাড়তি ব্যাট চালিয়ে মাঠেই অনুশীলনকর্মটা সেরে নেন,—দর্শকেরা তাদের হাসির কর্মটা সেরে নেয় সেই অবসরে। সে হেন হলকে সকালে নেট প্রাকটিশের সময়ে ওরেল নাকি ব্যাটধরা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আজ খেলতে নেমেও হল একসময়ে ছ'বার পর পর ডেভিডসনকে ফসকেছিলেন। সেই হলই যখন ৬৯ মিনিটে নিজস্ব ৫০ রান করলেন, তখন ঐ রানসংখ্যার মধ্যে এমন কতকগুলি মার দিল, যা সমালোচকের মতে, তাঁর গুরু ওরেল নিজের ব্যাটে তুলে নিতে পারেন সানন্দে। নতুন বলে মেকিফকে তাঁর প্রথম ওভারে হল-আলেকজাণ্ডার ১৯ রানের মনোরম একটি ঠেঙানি দিলেন, (মেকিফের তিন ওভারে ৩৯ রান)। তা দেখে বিমুগ্ধ বেনোড

লিখলেন,—এও ক্রিকেট, সেও ক্রিকেট। এখানে নতুন বলের দ্বিতীয় ওভারে ১৯ রান। আর এই ১৯ রানই গতবারে ইংলণ্ড অস্ট্রেলিয়ার টেস্টে লাঞ্চের আগের দু'ঘণ্টায় একবার হয়েছিল। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পুচ্ছনৃত্য দেখে রসিক অস্ট্রেলিয়ান দর্শক চেঁচাল,—ওহে রিচি! এদের মধ্যে কোন্‌টির নাম সোবার্স?

হল-আলেকজাণ্ডারের শেষ ৫০ হল ৩৫ মিনিটে।

হল এগিয়ে ওড়াতে গিয়ে স্টাম্পড হলেন।

ফিরে গিয়ে ওরেলকে একগাল হেসে বললেন,—হুঁঃ। ছুঁড়ে দিয়ে এলুম ইনিংস। সেঞ্চুরীই করতুম, বোলিং-টেলিং সব ধাতস্থ,—তা সেঞ্চুরী করব কেন? নিজেকে বোঝালুম, ওহে ওয়েস্, তুমি বোলার হিসেবে দলে এসেছে, তোমাকে ফাস্ট বোলিং করতে হবে, পঞ্চাশ রানেই তুমি খুসী থাক। তাইতো আউট হলুম—নচেৎ—হুঁ।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান-রণোৎসবের পরে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং-এর মধ্যে দর্শকেরা কিছু দিলখুশ ভোজন পায়নি। তারা বিরক্ত হয়েছে নিজ দলের নেতিতে, কারণ তারা অনুরক্ত হয়ে পড়েছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নীতিতে। ঐ তো ক্রিকেট—যা দর্শকদের পয়সার দামকে বহুগুণ ক'রে ফেরত দেয়।

কয়েকজন অস্ট্রেলিয়ানের ইনিংসের সময়ের হিসেব উপস্থিত করলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে,—

ম্যাকডোনাল্ড	৫৫ রান	১১১ মিনিটে
হার্ভে	১৫ "	৬৩ "
সিম্পসন	৯২ "	২৬০ "
ও'নীল	২৮ "	৮৯ "

অধিকন্তু বলা যায় অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটিং শেষ পর্যন্ত রানসংখ্যায় নিন্দনীয় না হলেও (৩-১৯৬) ছেয়ে ছিল অবিশ্বাসে ও অস্বস্তিতে। ম্যাকডোনাল্ডের মোটামুটি ইনিংসটিকে বাদ দিলে হার্ভে, সিম্পসন বা ও'নীলের ইনিংসের মধ্যে প্রশংসাযোগ্য বস্তু প্রায় ছিল না। হার্ভের মধ্যে ৬৩ মিনিট ধরে হার্ভের কোনো এক প্রেত খেলা করছিল, যখন

কেঁদে কেঁদে তিনি ১৫টি রান যোগাড় করেছিলেন, এবং তাঁর আউট, বলতেই হবে, তাঁর মাঠলৌকিক মুক্তি।

৯২ রানের মাথায় বিদায়ী সিম্পসন সেঞ্চুরী না করতে পারায় টেস্ট সেঞ্চুরীর মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। ৫০ পেরোবার পরে ভালো খেললেও হলকে যেভাবে তিনি ভয় পেয়েছেন, যেভাবে বাম্পার থেকে বাঁচবার জন্য স্টাম্প খোলা রেখে গা হেলিয়ে গা বাঁচিয়েছেন, সেই ভঙ্গিগত ক্রুটি সমলোচকদের বিশেষ অখুশী করেছিল। প্রথম বাউণ্ডারী করবার আগে তাঁকে ১৪০ মিনিট সময় ক্রীজে কাটাতে হয়েছে। অনসাইডে তিনি যে সহজ ক্যাচ তুলেছেন, তা তিনজন ফিল্ডসম্যানের মাঝখানে মাটিতে খসে পড়েছে, তাঁর ৭৬ রানের মাথায় কট-বিহাইণ্ডের জোরালো আবেদন অগ্রাহ্য হয়েছে, ৮৮ রানের মাথায় সর্ট লেগে ওরেলের বলে স্মিথের হাতে তাঁর ধরা পডা উচিত ছিল, এবং বেশ কয়েকবার নানা জনের বলে নেহাতই বেঁচেছে তাঁর স্টাম্প।

ও'নীলের অবস্থাও তথৈবচ। ও'নীলের যৌবনমধ্যাহ্ণে হলের কৃষ্ণছায়াপাত। হল বাম্পারে বাপ্ বলিয়ে ছেড়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ানদের। বেল্টের নীচে এবং বেল্টের উপরে হলের হলাহল যখন আঘাত করতে লাগল তখন অস্থির ও'নীল কটিবেদনায় সুনীল হয়ে গিয়েছিলেন। ৮৯ মিনিটে এমনিতে মারিয়ে ও'নীলের আটাশ রান তাঁর টিকে-থাকার চেষ্টাকে দেখিয়ে দিয়েছে মাত্র। হলা-'হল' পান ক'রে টিকে থাকলে সত্যই মৃত্যুঞ্জয় হবার সম্ভাবনা। তার প্রমাণ—

পাঁজরায় ধাক্কা খেয়ে সাহসী ম্যাকডোনাল্ড কাতরাতে কাতরাতে হলের সঙ্গে রসিকতা করবার চেষ্টা করলেন।—বাপু, দেহের যে কোনো জায়গায় মারো আপত্তি নেই, কেবল এইটিকে বাদ দিয়ে,—বলে ম্যাকডোনাল্ড নিজের ললাট দেখালেন। অবিচলিত হল বললেন, ওহে, যখন ওয়েস্ হল বল করে, তখন তোমার কপাল ভাঙবে কি না-ভাঙবে, সে তোমার কপালের ব্যাপার!

অস্ট্রেলিয়ানদের অস্বচ্ছন্দ ও শ্লথগতি খেলায় দায়িত্ব ওরেলের কৌশলপূর্ণ অধিনায়কত্বের উপর চাপানো যায়, সে কথা আগেই

বলেছি। ওয়েল রানের সহজ গতিতে বাধা দিয়েছিলেন অন-সাইডে ফিল্ডিং সাজিয়ে, দ্রুত ও মধ্যদ্রুত বোলিংয়ের উপর নির্ভর করে। হলের ছিল ফাস্ট বোলিং, সোবার্স এবং ওয়েলের বাঁ-হাতের মিডিয়াম ফাস্ট। তুলনায় শ্লো স্পিনাররা বল পেয়েছে অনেক কম ওভার।

যথা, বোলিং-এর হিসেব :—

সুইং	হল	১৬	০	৫১	০
	ওয়েল	১৫	০	৫১	০
	সোবার্স	১৪	০	৪৪	১
স্পিন	ভ্যালেন্টাইন	৮	১	২৭	১
	রামাধীন	৬	০	১০	১

মোট ৫৯ ওভার বলের মধ্যে ৪৫ ওভার দিয়েছে সুইং বোলাররা স্পিনাররা মাত্র ১৪ ওভার।

॥ তৃতীয় পাণ্ডব ॥

তৃতীয় দিনের খেলা চিহ্নিত হোক দুই বীরের নামে—ও'নীল ও হল। ও'নীল অস্ট্রেলিয়ার রণতরীর পালে রানের বাতাস ভরে দিয়েছিলেন, ঝড়ের গতিতে সে তরী যখন ছুটছিল, হলের হাতের গোলা দু'একটা পাল ফুটো ক'রে সে গতি ধর্তব্যের মধ্যে এনে দিল।

ও'নীল ১৮১ রান করেছিলেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৪৫৩ রানের স্থূল ইনিংসকে অস্ট্রেলিয়া স্থূলতায় ছাড়িয়ে গেল ও'নীলের রান-মেদের কল্যাণে।

যে কথা বলেছিলেন বেনোড—ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্রুত ৪০০ রান করে তো আমরা যথেষ্ট সময় নিয়ে ধীরেসুস্থে ৬০০ রান ক'রে ফেলি,—সে কথা ওরেলের সাবধানতা সত্ত্বেও আবার সত্য হয়ে উঠল ব্রিসবেন টেস্টে যখন অস্ট্রেলিয়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে প্রথম ইনিংসে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেল রানসংখ্যায়।

অবশ্য অস্ট্রেলিয়া এবার যে, সে জিনিস করতে পেরেছিল তার জন্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের নীতিভ্রান্তি অপেক্ষা ভাগ্যহীনতাই বেশী দায়ী।

সে কথা পরে।

ও'নীলের সঙ্গে রানসংগ্রহে সহায়তা করেছিলেন ফ্যাভেল ও ডেভিডসন। ব্যাটিং-সৌকর্যে এঁরা কেউই এই ইনিংসে পেছিয়ে ছিলেন না ও'নীলের থেকে। ফ্যাভেল এক রান ক'রে নৈশ প্রহরী ছিলেন, বিশ্রাম-দিনের পরে উক্তপ্রহরী প্রহারকার্যের নমুনা দিলেন। হলকে তিনি একেবারেই শ্রদ্ধা করলেন না। অস্ট্রেলিয়ার সেই দিনের প্রথম ৫০ রান হল ৫৮ মিনিটে, ফ্যাভেল করলেন তার মধ্যে ২৮। এখানেও না থেমে রানলোলুপ ফ্যাভেল ভ্যালেণ্টাইনের দু'টি বলকে পর পর মিড অফের উপর দিয়ে শূন্যমার্গে বেড়ার বাইরে বিদায় ক'রে দিলেন। টেস্ট ক্রিকেটে পর পর দু'টি ওভার বাউণ্ডারী! দর্শনীয় ব্যাপার বটে!

অর্ধশতের যখন পাঁচ রান কম, তখন ফ্যাভেল রান আউট হয়ে বিদায় নিলেন অসন্তুষ্ট চিত্তে। তাঁর ধারণা তিনি রান আউট হননি। আম্পায়ারের ধারণা অন্যপ্রকার। চলচ্চিত্র আম্পায়ারের দলে ছিল।

ডেভিডসনের ৪৭ রান নিখুঁত ব্যাটিংয়ের সৃষ্টি। পৃথিবীর এক নম্বর অলরাউণ্ডার দেখিয়ে দিলেন অলরাউণ্ডার মানে ব্যাটিং বা বোলিং যে-কোনো একটি গুণে দলে স্থান পাবার যোগ্যতা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ও'নীলই রান-ভাণ্ডারে প্রধান সঞ্চয় দিয়ে গেছেন। তাঁর ৪০১ মিনিটব্যাপী জীবনের সংগ্রহ (১৮১ রান) তিনি অস্ট্রেলিয়ার কোষাগারে জমা দিলেও, সে বদান্যতা সত্ত্বেও, সকলেই বলতে বাধ্য হয়েছে,—ঐ জীবনের প্রথম অংশ সন্দেহমুক্ত ও নির্মল ছিল না। অনির্দিষ্ট ভিত্তির উপরে নির্মিত এক অসাধারণ ইনিংস খেলেছিলেন ও'নীল। প্রথম যৌবনে পদস্খলিতের পরবর্তী বিস্ময়কর চারিত্র-গৌরবের মতই ছিল তাঁর ইনিংস। ও'নীল সোবার্সের তুল্য জন্মসিদ্ধ ইনিংস খেলতে পারেননি,—তাঁর ছিল বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব!

ও'নীলকে দোষ দেওয়া শক্ত। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিভা

ঈর্ষার ও আক্রমণের বস্তু।* ১৯৫৯-৬০ সালে ও'নীল ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে নতুন ঈশ্বররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর

---

* বড় গাছে ঝড় লাগবেই। তার অর্থ, প্রকৃতি বড় গাছে ঝড় লাগাবেই। ক্রিকেটে বিপক্ষের ক্রীড়া-প্রকৃতি তার কিছু ব্যতিক্রম নয়। ব্রাডম্যান যদি বনস্পতি হয়, তার বিরুদ্ধে লারউড-ঝড়, যদি হাটন হয় উর্ধশাখ, তার বিরুদ্ধে মিলার বা লিণ্ডওয়াল। ও'নীলের ক্ষেত্রে কখনো হল, কখনো ট্রুম্যান। ১৯৬১ সালের ইংলণ্ড-সফরে ও'নীলের উপর শোধ তুলতে চেয়েছে ইংলণ্ড, কারণ ১৯৫৮-৫৯ সিরিজে ইংলণ্ডের পরাজয়ের প্রধান হুপতি ছিলেন ও'নীল।

অধুনাখ্যাত ১৯৬১ সালের ওল্ড ট্রাফোর্ডের চতুর্থ টেস্টে ও'নীলের অবস্থা, —"আজ সকালের খেলা সিম্পসন-হার্ভের দ্রুত বিদায় কিংবা ল্যরীর অব্যাহত রান-ধারার জন্য যতখানি না উল্লেখযোগ্য, তারো বেশী—ও'নীল যে অস্বাভাবিক প্রহার খেয়েছেন তার জন্য। অস্ট্রেলিয়ার সর্বাধিক খ্যাত ব্যাটসম্যান তাঁর সুযোগ্য ক্রীড়াজীবনের সর্বাধিক যন্ত্রণার সময় আজ কাটিয়েছেন ক্রীজে; এবং এমন এক সময় গেছে যখন তিনি বীভৎসতম মারের মুখে হতভাগ্য প্রস্তুত বক্সারের মত এধার ওধার ছটফট ক'রে ছুটে বেড়িয়েছেন। .. ...একটি নাটকীয় ওভারের মধ্যে তিনবার ও'নীল ইংলণ্ডের নতুন ফাস্ট বোলার উরস্টারশায়ারের জ্যাক ফ্ল্যাভেলের বলে উরুতে ধাক্কা খেয়েছেন, তিনবারই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন, আবার পড়েছেন চতুর্থবার, এবার স্ট্যাথামের বলে।

"অস্ট্রেলিয়ার দ্বাদশ খেলোয়াড় মিশন বক্সারের সাহায্যকারীর ভূমিকায় ও'নীলের 'মেরামতে' সাহায্য করেছেন। ও'নীল তাঁর উরুর প্যাড বদলেছেন, ভিতরকার 'বর্ম' বদলেছেন, অবশেষে পিচের উপর অসুস্থ হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। করুণাপরবশ স্ট্যাথাম ঠিক লেংথের ঠাণ্ডা বল দিয়েছেন সেই দেখে। ও'নীলের সমাপ্তিই কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর। ট্রুম্যান তাঁকে একটি বাম্পার দিলেন,—ও'নীল হুক করতে চাইলেন। বলটি ও'নীলের কব্জিতে গিয়ে আঘাত করল, ও'নীল ঘুরে নিজের উইকেটের উপর পড়ে গেলেন। বেদনার ও হতাশার একটি মূর্তি তারপর সেখান থেকে যখন উঠে দাঁড়াল—তখন স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার জন ল্যাংরিজ আউট দিয়ে দিয়েছেন।"

[পরের পাতায়]

বিরুদ্ধে ফাস্ট বোলারদের দেবদ্রোহিতার আঘাতপর্ব চলল। সেই 'আসুরিক' প্রয়াসে হল দ্বিতীয় বলেই ও'নীলের কোমরে ঘা দিয়েছিলেন, তৃতীয় দিনে হাতে-মুখে-কাঁধে থাবা দিলেন বার বার। ও'নীল আমেরিকান সিনেমার কাউবয় নায়কের মত গোড়ার দিকে পড়ে পড়ে মার খেতে লাগলেন। উইকেট নিয়ে প্রাণে যে বেঁচে রইলেন তার মূলে আছে ভাগ্যের সহানুভূতি, যে সহানুভূতি কাউবয় নায়ক পেয়ে থাকে ফিল্ম-পরিচালকের কাছ থেকে। ভাগ্যের বেড়ায় রক্ষিত ছিল ও'নীলের এই ইনিংসের করুণ শৈশব।

সে ভাগ্যের নমুনা,—

ও'নীলের ৪৭ রান—ওয়েলের বল—সেকেণ্ড স্লিপে সোবার্সের হাতে ক্যাচ।

ভূপতিত।

ও'নীলের ৫২ রান—সোবার্সের বল—ও'নীলের পেটে লেগে বল ধাক্কা দিল লেগ স্টাম্পকে।

বেল অবিচলিত।

ও'নীলের ৫৪ রান—ভ্যালেন্টাইনের বল—একটি সোজা ক্যাচ ঢুকে গেল অভ্রান্তহস্ত আলেকজাণ্ডারের দুই গ্লাভসের মধ্যে।

বলের পুনশ্চ ভূমিলাভ।

বরাত এবং বরাত এবং বরাত। ত্রয়ী বরাত।

৫৮ রানের মাথায় ও'নীল খাপ খুললেন! প্রথম প্রাণবন্ত অফ ড্রাইভ বেরিয়ে এল ব্যাট থেকে।

এই ও'নীল কিন্তু যথার্থ ই 'গ্রেট'। প্রথম ইনিংসের রক্তাক্ত ১১ রানের পরে (এক্স-রে রিপোর্ট বলে, ও'নীলের বাঁ হাতের পেশীর রক্ত-নালী ছিঁড়ে গিয়েছিল) দ্বিতীয় ইনিংসে নতুন সংগ্রামে তিনি ৬৭ রান করেছিলেন, যা করবার সময়ে আবার তিনি উরুতে ঘা খেয়েছিলেন ট্রুম্যানের বলে, বেশ কিছু সময় তাঁকে ব্যয় করতে হয়েছিল উরু-চর্চায়, তারপরেই যখন দাঁড়িয়ে উঠে দম ফিরে পেলেন, দেখিয়ে দিলেন ট্রুম্যানের জন্ত ঠিক কোন্ উত্তর তাঁর ব্যাটে লেখা আছে।

পরের টেস্টে ও'নীল সেঞ্চুরী করেছিলেন।

যে ও'নীল ১৪৮ মিনিট নয়েছিলেন প্রথম ৫০ রান করতে, যার মধ্যে বাউণ্ডারী ছিল মাত্র ৬টি, সেই ও'নীল তারপর বাউণ্ডারী ছড়াতে লাগলেন যথেচ্ছ। রামাধীনের এক ওভারে তিনটে বাউণ্ডারী করলেন ; ৮০-এর কোঠায় দাঁড়িয়ে পর পর চারটে বাউণ্ডারীতে প্রায় সেঞ্চুরীতে পৌঁছে গেলেন ; ৭০ থেকে ১২০-এর মধ্যে ১১টি বাউণ্ডারী বেরুল ; চায়ের আগের দু' ঘণ্টায় মিনিটে এক রান হতে লাগল অস্ট্রেলিয়ার।

অস্ট্রেলিয়ার এখন পাঁচ উইকেট ৪৬৯ রান। ডেভিডসন ও'নীল অদ্ভুত খেলছেন। নিশ্ছিদ্র আক্রমণাত্মক ব্যাটিং। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রানসংখ্যা পেরিয়ে গেছে। হাতে পাঁচটি উইকেট। অস্ট্রেলিয়া মাথায় চড়ে আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কোনো ভরসা নেই। সকালে পাঁচ ওভারে ৩৭ রান দেবার পরে প্রাণহীন হলকে ওরেল বিদায় দিয়েছিলেন। বিকালে নতুন বল হাতে নিয়েও হল নিরুৎসাহ। তাঁর বাম্পারের মুখে দাঁড়িয়ে ডেভিডসন 'বিছ্যুচ্চার' মেরেছেন। হলকে সরিয়ে নেওয়া হবে নিশ্চিত, এই তাঁর শেষ ওভার—

৩৬ মিনিটের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার শেষ পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল ৩৬ রানে।

হলের অ্যাভারেজ ছিল ০—১২২। শেষ তিন ওভারে হল পেলেন ৪—১৮।

উইকেট গেল—

৬—৪৬৯ (ডেভিডসন ক আজেকজাণ্ডার ব হল), ৭—৪৮৪ বেনোড (এল বি, হল), ৮—৮৯ (গ্রাউট এল বি, হল), ৯—৪৯৫ (মেকিফ রান আউট), ১০—৫০৫ (ও'নীল ক ভ্যালেন্টাইন ব হল)।

অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে, কিন্তু ৫২ রানের বেশী রানে নয়।

॥ ডেভিড এণ্ড বল-সেবা ॥

চতুর্থ দিনের বিবরণের শুরুতে ডেভিডসনের বোলিং-হিসেব তুলে দেওয়া যাক—

সি. স্মিথ	ক	ও'নীল	ব	ডেভিডসন	৬
আর. কানহাই	ক	গ্রাউট	ব	ঐ	৫৪
জি. সোবার্স			ব	ঐ	১৪
এফ. ওরেল	ক	গ্রাউট	ব	ঐ	৬৫
পি. ল্যাসলি			ব	ঐ	০

মোট—২৪ ওভার বল, ৪ মেডেন, ৭০ রান, ৫ উইকেট।

পঞ্চম দিনের সকালে ডেভিডসন আরো একটি উইকেট পাবেন দু'ইনিংসে তাঁর হিসেব দাঁড়াবে,—

৩০	—	২	—	১৩৫	—	৫
২৪·৬	—	৪	—	৮৭	—	৬
৫৪·৬		৬		২২২		১১

প্রথম ইনিংসে তিনি আউট করেছিলেন হান্ট, স্মিথ, কানহাই, ওরেল এবং রামাধীনকে। দ্বিতীয় ইনিংসে স্মিথ, কানহাই, সোবার্স, ওরেল, ল্যাসলি এবং হলকে।

এঁদের মধ্যে আলেকজাণ্ডারকে বাদ দিলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বাকি সেরা ব্যাটসম্যানেরা—সোবার্স, কানহাই, ওরেল, হান্ট,—ডেভিডসনের শিকারের মধ্যে ছিলেন।

ডেভিডসনের জন্যই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ চতুর্থ দিনের শেষে পরাজয়ের মুখে দাঁড়িয়ে রইল, কোনো এক ড্র-এর মরণাপন্ন কামনা নিয়ে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেছিল চমৎকারভাবে, অর্থাৎ ওয়েস্ট-ইণ্ডিজভাবে। তাদের রানখাতার প্রথম সংখ্যা চার। তাদের প্রাথমিক রানগতির একটা হিসেব—

৩০	মিনিটে	৩০	রান
৩৫	"	৪১	"
৪৮	"	৫০	"
৬০	"	৭৫	"
৯৮	"	১০০	"

সকল সম্ভাবনাকে কার্যত নিকেশ ক'রে দিলেন ডেভিডসন যখন ১২৭ রানে কানহাইয়ের চতুর্থ উইকেট পড়ে গেল। ওরেল বাঁধবার চেষ্টা করলেন। তাঁর ১৫১ মিনিটে ৬৫ রানের (প্রথম ইনিংসে ওরেলের একই রান,—১৫৯ মিনিটে ৬৫) অতিমূল্য ইনিংস, কিংবা সলোমন বা আলেকজাণ্ডারের সুধৈর্য আত্মরক্ষা—কোনো কিছুই আসন্ন বিপদকে দূর করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

আতঙ্কিত এবং ড্র-প্রার্থী ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা চতুর্থ উইকেটের পরে সময়ের দিক থেকে এই প্রকার—

ওরেল—	৬৫	রান	১৫১	মিনিট
সলোমন—	৪৭	"	২২২	"
ল্যাসলি—	০	"	২	"
আলেকজাণ্ডার—	৫	"	৬৭	"
রামাধীন—	৬	"	১১	"
হল (নট আউট)—	০	"	১০	"
ভ্যালেণ্টাইন—	০	"	৩	"
	১২৩	"	৪৬৬	" (ব্যক্তিগত ব্যাটিং-সময়ের দিক দিয়ে)

এর সঙ্গে তুলনা করা যাক প্রথম চার উইকেটের সময়-হিসেবের—

হাণ্ট	৩৯	রান	—	৮৮	মিনিট
স্মিথ	৬	"	—	২২	"
কানহাই	৫৪	"	—	১১২	"
সোবার্স	১৪	"	—	২৮	"
	১১৩	"	—	২৬০	(ব্যক্তিগত ব্যাটিং সময়ের দিক দিয়ে)।

চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের—৯ উইকেটে ২৫৯।

॥ মহাপঞ্চমী ॥

ব্রিসবেন টেস্টের পঞ্চম দিন।

খেলার বাঁশী এমন পঞ্চমে কখনো বাজেনি ইতিহাসে।

ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব নয় বলে মনুষ্যলোকের মাত্র চার হাজার

অধিবাসী সেই পঞ্চম দিনে মাঠে হাজির ছিল। আমার স্থির বিশ্বাস দর্শক-গ্যালারীর সেই শূন্যস্থান এবং উর্ধ্বলোক পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল লোকান্তরিত ক্রিকেটপ্রিয় দর্শক ও খেলোয়াড়ের অদৃশ্য উপস্থিতিতে। ব্রিসবেন মাঠে পঞ্চম দিনে উপস্থিত চার হাজার দর্শক যে শ্বাস নিয়েছিলেন তাঁদের 'রুদ্ধশ্বাস' বুকে, তা সুরভিত ছিল বিদেহী ক্রীড়ারসিকদের নিঃশ্বাস-সৌরভে।

সাংবাদিক লিখেছেন, সেদিন কি খেলা হয়েছিল, তা কেউ নিজে না দেখলে তাকে মুখে বলে বিশ্বাস করানো যাবে না।

তিনি আরো লিখেছেন, দেখলেও বিশ্বাস হবে না,—একি সত্য, না স্বপ্ন, না মায়া, না ভ্রম?

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণের উপর নির্ভর ক'রে আমি যে বর্ণনা লিখছি তা পড়লেও কি বিশ্বাস করবেন পাঠক?

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৬০ সাল। ৯ উইকেটে ২৫৯-করা ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আরো ৪০ মিনিট ব্যাট ক'রে ২৮৪ রানে ইনিংস শেষ করল। হল এবং ভ্যালেণ্টাইন ২৫ রান যোগ করলেন। মূল্যবান ২৫ রানের সঞ্চয় এবং মূল্যবান ৪০ মিনিটের ক্ষয়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মোট রান হয়েছে ৩৩৭। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে ৫০৫। ২৩৩ রান করলেই জিততে পারবে। হাতে আছে ৩১০ মিনিট সময় এবং এগারো জন ব্যাটসম্যান। পিচ খারাপ হয়নি।

অস্ট্রেলিয়ার জেতার খুবই সম্ভাবনা। ড্র আটকায় কে? অস্ট্রেলিয়ার অবস্থা রীতিমত ভালো।

মোটেই ভাল নয়। লাঞ্চের সময় প্যাভিলিয়নের দিকে ফিরতে ফিরতে ম্যাকডোনাল্ড এবং ও'নীল সেই কথাই ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে হল উইকেটের সামনের ছু'টি বৃহৎ 'জঞ্জাল' পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন। পাঁজরে প্যাড-লাগানো ম্যাকডোনাল্ড এখনো টিকে থাকলেও হলের দ্বিতীয় ওভারে সিম্পসনের থতমত ব্যাটের ক্যাচ স্কোয়ার লেগ থেকে ধরেছেন 'অতিরিক্ত' গিবস, এবং পরবর্তী ওভারে

নীল হার্ভের স্লিককে স্লিপ থেকে প্রথমে ঝাঁপ দিয়ে ও পরে ডিগবাজি খেয়ে, আঙুল ভেঙে, ধরে রেখেছেন সোবার্স। আঙুল ভেঙেছিল সোবার্সের, আসলে কপাল ভেঙেছিল অস্ট্রেলিয়ার।

অস্ট্রেলিয়া,—২—৭।

হল, প্রথম পাঁচ ওভারে,—২—৬।

হল ও'নীলকে প্রথম বলেই বাউন্সার ছাড়লেন। ও'নীল তলায় ডুবে গেলেন। ২৪ মিনিট পরে প্রথম রানের সাড়া পাওয়া গেল তাঁর কাছ থেকে।

লাঞ্চের সময়ে—

৭০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া—২—২৮

৭০ মিনিটে ম্যাকডোনাল্ড—১৪

৪৪ মিনিটে ও'নীল—৮

লাঞ্চের পরে অস্ট্রেলিয়া আরো নামতে লাগল।

লাঞ্চের পরে খেলতে নেমে ও'নীল চমৎকার মার শুরু করলেন। ড্রাইভ করলেন, গ্লান্স করলেন। পর পর দু'বার হলের বলে লেট কাট করে বাউণ্ডারী করলেন। ওরেল কোনো থার্ডম্যান দেননি। অনেকেই ওরেলের বোকামিতে রাগ করতে লাগল! ও'নীলের খুব আনন্দ, আবার কাট করতে গেলেন,—এবার কাটলেন নিজেকে,—আলেকজাণ্ডার ধরে নিয়েছেন তাঁকে।

হল—৮·৭ ওভার, ৩—৩৩ উইকেট।

ম্যাকডোনাল্ডের বিদায় তারপর। ওরেলের হাতে বোল্ড। ৯১ মিনিটের জন্য তাঁর দুঃখদৃশ্য অবস্থান, ১৬ রান, কোনো বাউণ্ডারী নেই।

ও'নীলের পর ফ্যাভেল এসেছিলেন, হলের প্রথম বলেই যেতে যেতে রয়ে গেলেন, এক চুলের জন্য স্টাম্প বেঁচেছিল,—গেলেন কিছু পরেই, ওরেলের বুদ্ধিতে ও হলের বলে। ওরেল লেগের দিকে সলোমনকে সরিয়ে দিলেন কিছু। হল অফ স্টাম্পের বাইরে আলগা বল দিলেন, চমৎকার স্কোয়ার কাট ক'রে বাউণ্ডারী করলেন ফ্যাভেল। দু' বল পরে আসল বলটি পড়ল—ফ্যাভেল লোভের অভ্যাসমত পা

বাড়িয়ে ব্যাট চালালেন,—এবারকার স্কোয়ার কাট লেগ সাইডে সলোমনের হাতে।

ছুটো বেজে কুড়ি।

অস্ট্রেলিয়া,—৫—৫৭।

হল,—৪—৩৭, ১০'৩ ওভারে।

হল প্রমত্তভাবে ছুটছেন, হাত পা ছুঁড়ছেন, বল ছাড়ছেন ক্ষেপে গিয়ে,—একাদিক্রমে ১২ ওভার বল করার পরে বিশ্রাম পেলেন।—অ্যাভারেজ ৪—৩৮।

অস্ট্রেলিয়ার মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছেন হল। ২০০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে ১৭৬ রান,—শেষের পাঁচ জন ব্যাটসম্যানের দ্বারা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাতের মুঠোয়—জয়!

চারটের সময় চা-পানের জন্য যখন ডেভিডেসন (১৬) ও বেনোড (৬) ফিরছেন তখনো জয় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মুঠোয়—তবে একটু ছটফট করছে মুক্তির চেষ্টায়।

ইতিমধ্যে আরো একটা উইকেট পড়েছে—ম্যাকের! সে উইকেট পড়েছিল ৯২ রানে। রামাধীন ম্যাককে নিজস্ব ২৮ রানের মাথায় বোল্ড করলেন। ম্যাকের ষষ্ঠ উইকেট কিন্তু পড়া উচিত ছিল অনেক আগেই, অস্ট্রেলিয়ার ৮০ রানের মাথায়, যখন রামাধীনের প্রথম বলেই ম্যাকে স্লিপে ক্যাচ তুলেছিলেন এবং সেটি ফেলে দিয়েছিলেন বদলী খেলোয়াড় গিবস। নবজীবন্ত ম্যাকে ডেভিডসনের সঙ্গে এক ঘণ্টায় ৩৫ রান যোগ ক'রে দিলেন।

তাতেও ক্ষতি নেই, দলের ৯২ রানের মাথায় ম্যাককে যেতে হলই,—আগন্তুক বেনোডও মোটেই স্বচ্ছন্দ নন,—রামাধীনের বল থেকে স্টাম্প পরিত্রাণ পাবার পরে বেনোড অফ ড্রাইভে বাউণ্ডারী ক'রে দলের শত রান পূর্ণ করলেন।

চা-পানের সময় অস্ট্রেলিয়ার হাতে চারটি উইকেট এবং ১২০ মিনিট সময়, জয়ের জন্য প্রয়োজন ১২৩ রান।

তার থেকে অনেক সহজ কাজ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের,—ঐ সময়ের ও ঐ রানের মধ্যে মাত্র চার উইকেটের লেজটি খসিয়ে দেওয়া।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ড্রেসিংরুমে উৎফুল্ল মুখ, সহাস্য আগ্রহ এবং পুরু ঠোঁটে ক্যালিপসোর সুর।

সব বদলে গেল। হাসি শুকিয়ে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ড্রেসিংরুম থেকে। সুর গেল থেমে। অস্ট্রেলিয়ান শিবিরে মেঘভাঙা সূর্য। সাড়ে পাঁচটা। দেড়ঘণ্টা কেটে গেছে, ইতিমধ্যে হল নতুন বল হাতে নিয়েছেন। ডেভিডসন ও বেনোড এখনো খেলছেন। অস্ট্রেলিয়ার ৬ উইকেটে ২০৬। খেলা শেষ হতে ৩০ মিনিট সময় বাকি। ২৭ রান করতে হবে। হাতে চারটে উইকেট। একটা ছেলেমানুষ বিধাতার হাতে এই খেলাটির ঘুঁটি। রাজার সঙ্গে প্রজার ভাগ্যবিনিময় হচ্ছে কল্পনাতীত খুশীতে যথেচ্ছ লীলায়।

অবস্থার পরিবর্তনের ইতিহাসটা উল্টে দেখা যাক।

৬ উইকেটে ১১০ রান নিয়ে চা-পান করতে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া।

চা-পানের পরে ডেভিডসন স্ফূর্তিভরে খেলতে লাগলেন। যদি জিততে হয় সাহসের সঙ্গে ব্যাট চালাতে হবে। হার এড়াতে হলেও। না মারলে মরণ নিশ্চয়। ৮৪ মিনিট খেলার পরে ডেভিডসন প্রথম বাউণ্ডারী করলেন। বেনোডও তাই ক'রে সে কাজে সায় দিলেন। চারটে বেজে দশ—অস্ট্রেলিয়ার রান ১২৮— খেলা শেষ হতে ১০০ মিনিট বাকি আছে— জয়ের জন্য চাই ১০৬ রান।

মুঠি আলগা হয়ে যাচ্ছে, ওরেল বুঝলেন। দলের ঘটোৎকচকে ডাকলেন কৃষ্ণ। হল তিন ওভার বাউন্সার-মেশানো বল দিলেন। একটি বাউন্সারের সামনে বুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে লেগের বাউণ্ডারীতে ছিঁচে দিলেন ডেভিডসন। ডেভিডসন-বেনোড জুটির ৫৩ রান হল ৫৫ মিনিটে।

ওরেল হলকে সরিয়ে নিলেন। ২০০ রানের পরে সন্ধ্যারণে হলের রক্ষঃশক্তির প্রয়োজন হবে।

চারটে ৪০ মিনিটের সময় নিজের হাতে বল নিলেন ওরেল। বেনোডের হাতে উৎকৃষ্ট বাউণ্ডারীর চেহারা দেখলেন তখনি।

অস্ট্রেলিয়ার ৬—১৫৩। ৭৫ মিনিট সময় বাকি।

ওরেল 'ঠাসা' বল দিয়ে গেলেও 'রহস্যময়' রামাধীন মার খেতে লাগলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ফলে—

অস্ট্রেলিয়া ৬—১৬৬। ৬৫ মিনিট বাকি। ৬৭ রান দরকার।

রামাধীনকে তুলে প্রচণ্ড পেটালেন ডেভিডসন। স্কোয়ার লেগ বাউণ্ডারীর কাছে প্রায়-ওভার বাউণ্ডারীটি গিয়ে পড়ল। ডেভিডসন ১৪১ মিনিটে অর্ধশত করলেন।

৫৪ রান করতে হবে অস্ট্রেলিয়াকে—এই অবস্থায় সোবার্স এলেন—বেনোডের হাতে চার-এর মার খেলেন—অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৪৯ রান। সময় আছে ৪৮ মিনিট।

৪৫ রান দরকার ৪৬ মিনিটে—রামাধীনকে ডেভিডসন সোজা বাউণ্ডারীতে পাঠিয়েছেন।

আবার রামাধীনের বলে ডেভিডসনের বাউণ্ডারী। ডেভিড-বেনোড জুটির ১০০ রান—৯৫ মিনিটে। ডেভিডসন—৬০, বেনোড—৪১।

বেনোড-ডেভিড অদ্ভুত দৌড়চ্ছেন উইকেটের মধ্যে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফিল্ডিং নাড়া খাচ্ছে ভীষণভাবে। নার্ভ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বেহিসেবী চলাফেরা, এলোমেলো বল ছোঁড়া। সেই পুরনো মৃগী ফিরে আসবে নাকি দলের ১৯৫১-৫২ সিরিজে মেলবোর্নের সেই যা-তা ব্যাপার—যখন রিং ও জনস্টন জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের হাত থেকে? তখনকার সেই বিভ্রান্তি, সেই সম্মোহ, সেই প্রত্যেকেরই আত্মনির্বাচিত অধিনায়কত্ব,—ওরেল স্থির কঠিনভাবে ভাবলেন,—তেমন হতে দিলে হার সুনিশ্চিত। খেলোয়াড়দের কাঁধে নাড়া দিয়ে ওরেল বললেন,—ঠিক রহো! ২০০ রান হয়ে গেছে, নতুন বলের সময় এসে গেছে। সাড়ে পাঁচটা বাজে।

ওরেল হলের হাতে নতুন বল তুলে দিলেন।

যাও বীর!

পাঁচটা তিরিশ থেকে ছ'টা। ক্রিকেটের ইতিহাস তাঁর সমস্ত গতি ও তরঙ্গ নিয়ে ঐ তিরিশ মিনিটে ঘনীভূত। আমাদের জীবনে অগণ্য অকৃতার্থ যুগ। সৃষ্টির মুহূর্তবিন্দু মাত্র কয়েকটি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারবেই- সকলে জানে। ওরেলও জানেন। অস্ট্রেলিয়ার হাতে চারটে উইকেট। ২৭ রান মাত্র বাকি জয়ের জন্য। ৩০ মিনিট সময়।

তবু ওরেল কী একটা অনুভব করছিলেন, কোনো এক অদৃশ্য ইঙ্গিত। ওরেল হলের হাতে বল দিয়ে বললেন, দম নিয়ে নাও, তৈরী হও,—ওরেল নিশ্চয় সেই মুহূর্তে ঐশ্বরিক শক্তির স্পন্দন বোধ করছিলেন—তিনি এখন হল-পাণি—হলকে মুষ্টিতে তুলে ধরেছেন—এখনি সেই বজ্র নিক্ষেপ করবেন।

না, হলও কিছু করতে পারবেন না—পারলেন না। রানের ব্যবধান কমতে লাগল উইকেট না পড়ে। হলের প্রথম বলে বেনোড খুচরো এক রান নিলেন, হল একটা নো-বল দিলেন, তাতে খুচরো আর এক রান নিলেন অস্ট্রেলিয়ানরা, বেনোড লেগ সাইডে উঁচু ক'রে বল পাঠালেন যা হাণ্টের বাড়ানো হাতের সামনে গিয়ে পড়ল, ও তা থেকে এক রান হল। ফলে—

অস্ট্রেলিয়ার দরকার ২৪ রান ২৫ মিনিটে।

একে একে রান বাড়ল, একে একে রানের ব্যবধান কমল। হলের বলে ডেভিডসনের হুক থেকে চার হল। কুড়ি রান বাকি। অস্ট্রেলিয়ার চতুর সর্ট রান থামাতে না পেরে বিমর্ষ রইলেন হল; ওরেল পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ওয়েস্, তা'বলে বাউন্সার আর নয়, কি বলো?'

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দুর্ভাগ্যের নরক এখন। একটা সুনিশ্চিত রান-আউট—তাও হল না। কি হয়েছিল তার বর্ণনা উদ্ধৃত করছি ফিঙ্গলটনের লেখা থেকে, তথ্যের জন্য যাঁর উপর এতক্ষণ নির্ভর ক'রে এসেছি;—

"ঐ একই ওভারে একটা বিশ্রী রকমের গণ্ডগোল হল।

বেনোও পয়েন্টে বল ঠেলে দিয়ে রান নিতে শুরু করলেন। ডেভিডসন 'না' বলে চেঁচিয়েও, বিচিত্র ব্যাপার, বেনোডের দিকে দৌড় দিলেন। ভ্যালেন্টাইন এই গোলমালের মধ্যে বল ছুঁড়ে দিলেন বেনোডের প্রান্তে, যেখানে ডেভিডসন প্রায় পৌঁছে গেছেন। ডেভিডসন তখন তাঁর দীর্ঘ হতাশাজনক উল্টো-দৌড় শুরু করলেন, কিন্তু আলেকজাণ্ডার, ভ্যালেন্টাইনের বল হাতে পেয়েও, ধড়পড় ক'রে, আপ্রাণ চেষ্টা করেও, অপর প্রান্তে হলের হাতে বল পৌঁছে দিতে পারলেন না। ডেভিডসন হুমড়ি খেয়ে ফিরে গেলেন। ভাগ্য! এমন পরিত্রাণ! ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা একেবারে মুষড়ে পড়ল। উত্তেজনায় ফেটে পড়ল সারা মাঠ।

অস্ট্রেলিয়ানরা এবার অদম্য, উচ্ছ্বসিত। সোবার্সের বলে পরমানন্দে রান বাড়িয়ে চলল তারা। ওভারের শেষে বেনোড খুচরো এক রান ক'রে নিজস্ব ৫০ রানে পৌঁছলেন, ১২৪ মিনিটে।"

পাঁচটা বেজে পঁয়তাল্লিশ। খেলা শেষ হতে ১৫ মিনিট বাকি। অস্ট্রেলিয়ার ১০ রান চাই। হাতে ৪টি উইকেট।

হলও তাহলে কিছু করতে পারবেন না? বেনোডের নাকে গরম বাতাস লাগিয়ে হলের বাম্পার লাফিয়ে উঠল। হল লড়াই করছেন সর্বস্ব-পণে; পরের বল দেবার জন্য—পরের আঘাত হানবার জন্য—ধীর পায়ে ফিরে যাচ্ছেন দীর্ঘ পদযাত্রায়—অধৈর্য দর্শক চীৎকার করছে—তাড়াতাড়ি—তাড়াতাড়ি হাঁটো—সমস্ত শক্তি দিয়ে হল বল দিচ্ছেন—তবু আরো এক রান বাড়ল—৬টা বাজতে দশ মিনিট বাকি—অস্ট্রেলিয়ার দরকার মাত্র ৯ রান।

সোবার্সের পরের ওভার। পর পর দুটো খুচরো রান নেওয়া হল। অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৭ রান। হাতে ৪টে উইকেট। অবধারিত জয়।

হঠাৎ একটা তার কেটে গেল। ডেভিডসন আউট।

বেনোড স্কোয়ার লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে মারাত্মক সর্ট রানের চেষ্টা করেছেন। ডেভিডসন পৌঁছেও পৌঁছতে পারলেন না। সলোমন

কঠিনতম 'কোণ' থেকে বল ছুঁড়েছেন। তাঁর হাতে ছিল দৈব অভ্রান্ততা। ডেভিডসন আউট। ডেভিডসনের বিদায়। ৮০ রান করেছেন।

বিদায়, আজকের মত, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অল রাউণ্ডার। দু'ইনিংসে ১১টি টেস্ট উইকেটের অস্ট্রেলিয়ান রেকর্ড। দু' ইনিংসে ১২৪ রান। দ্বিতীয় ইনিংসের ৮০ রান পরাজয়ের ক্ষণে দলের মুখে মৃতসঞ্জীবনী সুরা।

ফিরে যাবার সময় ডেভিডসনের কানে মাঠের চার হাজার দর্শকের সহর্ষ চীৎকারের চেয়ে অনেক বেশী মধুর লাগল বিপক্ষের সংবর্ধনার করবাদ্যধ্বনি। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা আন্তরিক অভিনন্দন জানালো তাদের প্রধান শত্রুকে।

ডেভিডসন চলে যাচ্ছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে দলের অধিনায়ক ও ব্যক্তিগত বন্ধু রিচি বেনোডের মনে হল—'অ্যালানের কীর্তির চেয়ে ভালো কিছু কি কেউ দেখেছে—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট এবং সেই সঙ্গে দুই ইনিংসে দু'টি অসাধারণ ব্যাটিং-প্রদর্শনী ?'

রিচি বেনোড তাঁর ভাবনার কথা সংবাদপত্রে লিখলেন।

আর বেনোড সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন সলোমনের দিকে,—ঐ জায়গা থেকে বল ছুঁড়ে উইকেটে মারা যায়? বেনোডের সঙ্গে সমস্ত মাঠ সেই চিন্তায় ও বিস্ময়ে ব্যাপৃত রইল, ইতিমধ্যে মাঠে নেমে পড়েছেন গ্রাউট।

গ্রাউট মহাব্যস্তভাবে স্ট্যান্স নিলেন। হাতে উইকেট থাকলে কি হবে, সময় বড় কম—

অস্ট্রেলিয়ার ৭ রান চাই—সময় ৬ মিনিট।

সোবার্সের এই ওভারের বাকি ৪ বল ছাড়া হলের ৮ বলের আর একটি ওভার খেলা হতে পারে। মোট ১২টি বল।

সপ্তম বলে গ্রাউট একটি রান নিলেন। আর মাত্র ৬ রান দরকার। তবু সারা মাঠ হায় হায় ক'রে উঠল,—গ্রাউট করল কি—

পরের ওভার যে হলের। রান দরকার, কিন্তু তবু গ্রাউটের এক রানের বাহাদুরির দরকার ছিল না।

সোবার্সের অষ্টম বল।

এতখানি মনোযোগ কোনো বল এ পর্যন্ত পেয়েছে কি? ঐ বলে বেনোড রান নেবেনই। ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা তা কিছুতে ঘটতে দেবে না। অন্তত ৬ জন ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বেনোডের এত কাছে দাঁড়িয়ে যে, তাদের নিঃশ্বাস গায়ে লাগছে। সোবার্স সমস্ত মনটাকে টেনে এনে বলের সঙ্গে যোগ ক'রে দিলেন।

বেনোড রান নিতে পারলেন না।

হলের শেষ ওভার। আট বলের একটি ওভার। হাতে ৩টি উইকেট। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়ার ৬ রান দরকার। খেলা শেষ হতে ৪ মিনিট সময় বাকি। সময়ের হিসেব আর করতে হবে না। ওভার শুরু হলে শেষ করতে হবেই। এখন বলের হিসেব। এক—দুই—তিন—চার······আটটি বল।

শেষ ওভার বল দিতে যাচ্ছেন হল—ফিঙ্গলটন হলের একটি অবিস্মরণীর ছবি এঁকেছেন,—সেটি উদ্ধৃত করি,—এর পরেও করব,—ঐ প্রত্যক্ষদর্শী শ্রেষ্ঠ সমালোচকের অপূর্ব বর্ণনা—অমর মুহূর্তের উপস্থাপনে,—

> "আমি হলের সেই চেহারা কোনো দিন ভুলব না—সেই সুবিশাল মনুষ্য-বিগ্রহটিকে—যখন সে সেই শেষ 'জীবন অথবা মরণ' ওভারটি দেবার জন্য চিহ্নিত স্থানটির দিকে ফিরে হেঁটে চলল। চেনে ঝোলানো একটি ক্রশ তার গলায়—সে ফিরে চলছে—দেখতে পেলুম আঙুল দিয়ে ক্রশটিকে স্পর্শ ক'রে আছে। আমি অনুমান করতে পারি সে কোন্ প্রার্থনা করছিল,—প্লিজ লর্ড—আমি যথাসাধ্য করব,—তুমি জানো প্রভু আমি তা করেই থাকি—তবু, আমি যা চাইছি তা অলৌকিক কিছু,—কেবল একটা নয় দুটো বা তিনটে তেমন জিনিস,—তবু—প্লিজ্ লর্ড, প্লিজ—।

মাঠের উপর ছায়া দ্রুত দীর্ঘ হয়ে বিস্তৃত হচ্ছে। হল তার

চিহ্নের উপর গিয়ে থামল,—শেষ আঘাতের জন্য—বিশাল টানে বাতাসে ভরে নিল ফুস্‌ফুস্‌। দু'পায়ের ভর ঠিক ক'রে নিয়ে, শুরু করল দৌড়··দুই হাত এবং পা ছড়িয়ে তার ধেয়ে আসা,— অপর প্রান্তের গ্রাউটের পক্ষে ভয়াবহ দৃশ্য। প্রচণ্ড গতির একটি ঠিক লেংথের বল,—গ্রাউটের তলপেটে লাগল। অন্য অবস্থার ক্ষেত্রে মাটিতে গ্রাউট লুটিয়ে পড়ত। এ ক্ষেত্রেও পড়ে যাচ্ছে —সেই অবস্থায় দেখল বেনোড তার দিকে ধেয়ে আসছে। বেনোড ডাক দেয়নি,—ডাকলে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা সতর্ক হয়ে পড়ত। সুতরাং বলটি যখন তিনজন ফিল্ডস্‌ম্যানের নাকের সামনে পড়ে আছে, তখন বেনোড একটি রান নিয়ে নিলেন—যেটাতে আধখানা রানও ছিল না।

জয়ের জন্য পাঁচ রান। বল বাকি সাতটি।"

গ্রাউটের মত মুখের শিকার সরে পড়ায় বিক্ষুব্ধ হল ফিরে চললেন একে একে পঁয়ত্রিশ পা। আগুনের মত মেজাজ। মনেই রইল না যে, স্কিপার ওরেল বাউন্সার দিতে নিষেধ করেছেন। হল একটি ভয়াবহ বাউন্সার ছাড়লেন।

সারা মাঠ লাফিয়ে উঠল। বেনোড বল ছুঁয়েছেন। উইকেট কীপারের মাথায় বল। বলটি লুফে আবার উপরে ছুঁড়ে দিতে দু'হাত ছড়িয়ে আকাশলোকের দিকে কৃতজ্ঞতা জানালেন আলেকজাণ্ডার।

১৩৬ মিনিটে ৫২ রানের একটি অধিনায়কের ইনিংস খেলার পরে বিদায় নিলেন বেনোড।

মহান অধিনায়ক! মহান ক্রিকেটের!

জয়ের জন্য ৫ রান। বাকি আছে ৬টি বল। হাতে দু'টি উইকেট।

যন্ত্রণার—আবেগের—উৎকণ্ঠার লাভা গড়িয়ে পড়েছে মাঠে। ওরেল আবার বললেন,—শান্ত থাকো। মেকিফ ব্যাট নিয়ে বেরুচ্ছেন —ড্রেসিংরুমে টেবিলের এক প্রান্তে বসে ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে কাঁপছেন ক্লাইন।

নিজের হাত-পা ঠিক আছে কিনা দেখতে দেখতে মেকিফ

নামলেন। হলের তৃতীয় বল ব্যাটের মাঝখান দিয়ে আটকালেন। চতুর্থ বল,—টেস্টম্যাচের ইতিহাসে একটি অসাধারণ খুচরো রান দেখা গেল। গ্রাউটের প্রতিভার দান সেটি।

রিচি বেনোডের বর্ণনা এই প্রকার,—

"হলের চতুর্থ বল (মেকিফের কাছে দ্বিতীয়) মেকিফ সম্পূর্ণ ফসকালেন। বল উইকেটকীপার আলেকজাণ্ডারের হাতে ঢুকে পড়েছে। গ্রাউট তারই মধ্যে ডাক দিয়ে দৌড় দিয়েছেন এবং অপর প্রান্তে পৌঁছে গেছেন। হল এগিয়ে এসেছিলেন টগ্‌বগ্‌ করতে করতে—আলেকজাণ্ডার বলটি তাঁর দিকে ছুঁড়ে দিলেন, হল সেটি ধরে ছুঁড়ে দিলেন নিজ প্রান্তের উইকেটে।

মিড অন থেকে ভ্যালেণ্টাইন লাফ দিয়ে কোনোক্রমে বলটি ধরে ফেলে ওভার থ্রো'র বাউণ্ডারী বাঁচালেন। ব্যালকনিতে আতঙ্কে লাফিয়ে উঠেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান খেলোয়াড়রা।

একজন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় ঝুঁকে পড়ে অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করল,—হলের হল কি, তার ছোঁড়া বল যে ভ্যালেণ্টাইন ধরে ফেলল? সে তো আরো অনেক জোরে ছুঁড়ে থাকে।"

সুতরাং আরও এক রান হল। ৪ রান বাকি জয়ের জন্য। চার বল বাকি তা করবার জন্য।

হলের পঞ্চম বল।

পাগলামির ঝড় বয়ে গেল মাঠের উপর দিয়ে। গ্রাউট আউট! গ্রাউট আউট!

গ্রাউট জোরে ব্যাট চালিয়েছিলেন জয়ের বাড়ি দেবার জন্য। মারের ভুলে লেগ-মিড-এর উপর বল উঠে পড়েছে উঁচু হয়ে। ক্যাচ ধরতে কানহাই হাত পেতে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন,—সহজ ক্যাচটি তিনিই ধরবেন। বল নেমে আসছে কানহাইয়ের হাতে—

হঠাৎ বিরাট লাফ দিয়ে কানহাইয়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন হল।

বল মাটিতে—গ্রাউটের অব্যাহতি।

স্তম্ভিত ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা দাঁড়িয়ে থাকে। ক্যাচের সুযোগে এক রান হয়ে গেছে।

জয়ের জন্য ৩ রান। বাকি আছে ৩ বল! হাতে আছে দু'টো উইকেট।

হলের ষষ্ঠ বল। অপর প্রান্তে মেকিফ। হল যথাসাধ্য বল দিলেন। মেকিফ প্রাণপণে ব্যাট চালালেন লেগের দিকে। বল উঁচু হয়ে স্কোয়ার লেগের দিকে ছুটে চলল। কোনো লোক নেই সেখানে। সুনিশ্চিত বাউণ্ডারী। অস্ট্রেলিয়ার সুনিশ্চিত জয়! জয়! জয়! জয়!

বেতারে বেতারে তরঙ্গিত হল সে বার্তা। অস্ট্রেলিয়া জিতেছে। সারা মাঠ দাঁড়িয়ে উঠল উত্তেজনায়। ক্ষেপে গিয়েছে সকলে। বল ছুটেছে বাউণ্ডারীর দিকে। মেকিফ ও গ্রাউট ছোটাছুটি ক'রে রান নিচ্ছেন।

এক রান······দুই রান······

মাঠের একজন খেলোয়াড় কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার জয়কে সুনিশ্চিত বলে বিশ্বাস করেননি। তাঁর নাম কনরাড হাণ্ট। রকেটের গতিতে তিনি বলটির দিকে ধাবিত। কোনো কারণে—ঘাসের জন্যই সম্ভবত—বলের গতি শ্লথ হয়ে এল।

দুই রান সমাপ্ত······তিন রান নিচ্ছেন তাঁরা······

হাণ্ট বাউণ্ডারী লাইন থেকে বল ছুঁড়লেন।

একলব্যও এমন লক্ষ্যভেদ করতে পারে না—হাণ্ট যা করলেন। অভ্রান্ত রেখায় বিদ্যুতের গতিতে বল ছুটে এল আলেকজাণ্ডারের হাতে—আলেকজাণ্ডার বল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উইকেটে—ব্যাট হাতে গ্রাউট ঝাঁপিয়ে পড়লেন লাইনের উপর।

আলেকজাণ্ডার আগে ঝাঁপিয়েছিলেন। গ্রাউট এবার সত্যিই আউট।

অস্ট্রেলিয়া ২ রান পেয়েছে দৌড় থেকে। অস্ট্রেলিয়ার মোট রান ৭৩৭। ওয়েস্ট ইণ্ডিজেরও তাই। দু'দল একেবারে সমান।

হু'টি বল বাকি। হাতে একটি উইকেট। জয়ের জন্য অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে এক রান।

হলের সপ্তম বল।

ক্লাইন বলটিকে লেগের দিকে ঠেলে দৌড় দিতে শুরু করলেন। ১২ গজ দূরে লেগের দিকে উইকেটের সমরেখায় দাঁড়িয়ে ছিলেন সলোমন। নীচু হয়ে এক হাতে হল ধরেই ছুঁড়ে দিলেন তাঁর নিকট দৃশ্যমান একটিমাত্র স্টাম্পের দিকে।

তারপর ?

"সলোমনের ঐ নিক্ষেপটির প্রয়োজন ছিল তার নিজ দেশের পক্ষে খেলাটিকে রক্ষা করার জন্য",—মনোহর প্রশংসায় বেনোড বলেছেন।

আরো উচ্ছ্বাসে তিনি বললেন,—"ডেভিডসন, সোবার্স, ওরেল, হল, ম্যাকডোনাল্ড, সিম্পসন, ও'নীল, গ্রাউট,—এদের সকলেরই নিজস্ব বিরাট খেলার দৃষ্টান্ত আছে,—কিন্তু কে বলবে সেগুলি বাউণ্ডারী লাইন থেকে কনরাড হান্টের শ্বাস-কেড়ে-নেওয়া থ্রো কিংবা জো সলোমনের হুটি তীক্ষ্ণ বলের অলৌকিক গুলিবর্ষণ—যা ডেভিডসন ও মেকিফকে রান-আউট করেছিল—তাদের চেয়ে বেশী মূল্যবান ?"

সলোমনের নিক্ষেপ উইকেট ভেঙে দিল। মেকিফ আউট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হু'ইনিংসে ৭৩৭। অস্ট্রেলিয়াও সব খুইয়ে ৭৩৭। টেস্টের প্রথম 'টাই'।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা হু'হাত তুলে নাচতে লাগল। নাচতে লাগল সারা মাঠ। কানাই নেচে নেচে ফিরে চললেন। গ্যালারি ভেঙে দর্শক মাঠে নেমে পড়েছে। হল মাথা নামিয়ে এগিয়ে আসছেন,—অষ্টম বলটি দিতে না পারার দুঃখে কিনা কে জানে! দিতে পারলে খেলাটি সর্বাংশে 'টাই' হত। খেলোয়াড় শেষ—সময় শেষ—বল শেষ—না, একটি বল বাকি রয়ে গেল। ওরেল আর পারছেন না। ঘাড়ের উপর মাথা ঝুঁকে পড়েছে—

ওরেলের মাথার উপর ইতিহাসের সূর্য।

চঞ্চলতায় বিহ্বলতায় আন্দোলিত খেলা—বৈদ্যুতিক উত্তেজনা

এবং স্নায়ুধ্বংসী সংকটে পূর্ণ,—বেনোড ভাবছিলেন ; আশা নৈরাশ্যের অবিরত ওঠা-পড়ার যন্ত্রণা—এ কী ক্রিকেট, যা দেখলুম ! যা খেললুম ! ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা কিভাবে অনিবার্য পরাজয়কে রক্তজমা 'টাই'-এ পরিবর্তিত করল ! তাদের সাহসের শক্তি, তাদের প্রয়াসের মহত্ত্বে বেনোড প্রশংসাবোধ করেন। 'নৈরাশ্য ? হ্যাঁ, নৈরাশ্য একই সঙ্গে মনে জাগে,—এত লড়াইয়ের পরেও আমরা জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় একটি মাত্র রান যোগাড় করতে পারলুম না।'

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা কি ভাবছে ? তারা কিছুই ভাবছে না, তারা গান গাইছে, খেলাটি দুপুরে যে তাদেরই হাতে ছিল, তা তারা ভুলে গেছে। শেষ মুহূর্তে নিশ্চিত পরাজয়কে পরাজিত করতে পেরেছে—তাতেই তারা খুশী। তাদের—জীবনের সুখবাদ এবং সুখের ক্ষণবাদ।

অস্ট্রেলিয়ান ড্রেসিংরুমে একজন আগন্তুক প্রবেশ করলেন নাটকীয় ভাবে। গ্লাসে ভরা পানীয় হাতে তুলে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন কপট ক্রোধে,—"এ কি খেলা ! এই পাঁচদিনের সুতীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠা—তবু নিষ্ফল ?"

পানীয়ে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক হেসে বললেন,—"মহাশয়গণের মধ্যে একটা কিছু গোলমাল আছে নিশ্চয়। নচেৎ অমন পাঁচটি দিনে কিছু নাড়াচাড়া দেওয়া ছাড়া আর কিছু ফল সৃষ্টি করতে আপনারা পারলেন না ?"

বেনোডও হয়ত সেই কথাই ভাবতে যাচ্ছেন,—ঐ ফলহীন পরিণতির নৈরাশ্য তাঁর মনকে অধিকার ক'রে ফেলবে হয়তো,—কানে এসে প্রবেশ করল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান ড্রেসিংরুম থেকে নৃত্যের শব্দ, সঙ্গীতের সুর। সমস্ত খেলাটা মনে পড়ে গেল অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের। ক্রিকেটের দীর্ঘ দিনের ইতিহাসটা চোখের সামনে খুলে গেল।

বেনোড ইতিহাসের সুর শুনলেন।

'টাই'-এর নিষ্ফলতা নূতন অর্থ নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর সামনে। বেনোড পরমতম কথাগুলি উচ্চারণ করলেন…

"এই মহান ম্যাচটিতে কেউ জেতেনি—একথা আক্ষরিকভাবে সত্য।

যে জিতেছে তার নাম ক্রিকেট।"

এই নিষ্ফলতার বীজ থেকে চরমতম সফলতার বনস্পতি জেগে উঠবে। 'টাই' জিনিসটা 'ড্র' নয়। 'ড্র'-এর চেয়ে 'টাই' অনেক বড—জয়ের চেয়েও—'ড্র' হয়,—ইচ্ছে করলে 'ড্র' করা যায়—, অমীমাংসার বন্ধ্যাত্বের সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে,—জেতাও শক্ত নয়,—তেমনি হারাও,—হার-জিত নিয়েই খেলা,—কিন্তু 'টাই'? ওটা ইচ্ছে করলে করা যায় না, ওটা হয়ে যায়। মানুষের সাধনা ও বিধাতার বাসনার যৌথ সৃষ্টি ঐ—'টাই'।

বেনোড যখন ব্রিসবেন টেস্টের পঞ্চম দিনের খেলাশেষে প্যাভিলিয়ন থেকে এগিয়ে গিয়ে মাঠের মধ্যে ওরেলকে জড়িয়ে ধরলেন এবং হাত ধরাধরি ক'রে যখন পৃথিবীর সাদা-কালো দুই মহাদেশ হাঁটতে লাগল, তখন ঐ আশ্চর্যজনক সত্যটিই জ্যোতি-দীপ্ত হয়ে উঠেছিল।

ছেড়ে দিচ্ছি মাঝের কয়েকটি দৃশ্য।

একেবারে শেষের কয়েকটি ছবি ভেসে উঠছে সামনে।

মেলবোর্নে পঞ্চম টেস্টের পঞ্চম দিন।

সারাদিন অভূতপূর্ব উত্তেজনায় কেটেছে। আর আনন্দের সুরে সুর মিলিয়ে ব্যাণ্ড বেজেছে বারে বারে। একজন ব্যাণ্ডবাদক হাসিয়েছে দর্শকদের—তার পড়ে-যাওয়া যন্ত্রটিকে যখন সে হাত ঘুরিয়ে বোলারের দৌড় দিয়ে তুলে এনেছে ভঙ্গি ক'রে। একটা মাতালও কম হাসায়নি। নববর্ষের উৎসবের আনন্দে সে বিয়ার টেনেছে আকণ্ঠ, এখন তার ইচ্ছা বিয়ার পাত্রটিকে উইকেটের উপর বোলিং ক'রে দেয়,—সেই নিয়ে পুলিসের সঙ্গে তার সর্ট ও লঙ রান। খেলার মাঠে আম্পায়ার ভুল সিদ্ধান্ত করেছেন। চরম ক্ষুণ্ণ হয়েও ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা নিজেদের অসন্তোষের প্রদর্শনী সাজায়নি

মাঠে,—সেই নিয়ে দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত হয়েছে,—'ওরা যথার্থ খেলোয়াড়, ওরা অভিযোগ করেনি',—খেলা শেষ হয়েছে,—অস্ট্রেলিয়া শেষ পর্যন্ত জিতেছে দু' উইকেটে,—দর্শকের চোখে সে জয় ম্লান হয়ে গিয়েছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সুমহান পরাজয়ের কাছে—তারা হাজারে হাজারে ছুটে গিয়ে জমেছে প্যাভিলিয়নের ধারে, আর গেয়েছে সমস্বরে অধিনায়ক ওরেল সম্বন্ধে,—'বড় মজাদার—চমৎকার—লোক —সে—রে—!'

সেই সময়ের একটি ছবি।

ওরেল তাঁর মাথার ক্যাপ খুলে নিয়ে বেনোডের হাতে তুলে দিলেন। টাই খুললেন গলা থেকে,—তাও দিলেন। খুলে ফেললেন গায়ের ব্লেজার। বেনোডের হাতে সেটি তুলে দেবার সময়ে আবেগে কাঁপতে লাগলেন। সমবেত হাজার হাজার দর্শককে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—

'আমি রিচিকে আমার মাথা দিলাম, আমার কণ্ঠ দিলাম, আমার শরীর দিলাম। পা দিলাম না,—সে বড় সামান্য জিনিস, আর এখন বড় ক্লান্ত।'

ওরেল আর বলতে পারলেন না—বলবার দরকারও ছিল না—গৌরবের বিশাল সঙ্গীতে তাঁর কণ্ঠ ডুবে গেল—হাজার হাজার দর্শক সমস্বরে আবার গাইল,—

বড় মজাদার—চমৎকার—লোক—সে—রে—।

ক্লান্ত তুচ্ছ চরণ ছাড়া যিনি ওরেলের সব কিছু পেয়েছেন সেই রিচি বেনোড উঠলেন। বললেন,—

'ফ্রাঙ্ক আমাকে তার সব কিছু দিয়েছে,—তার মাথা, তার কণ্ঠ, তার শরীর,—সে নিজে কিন্তু রয়ে গিয়েছে সকল ক্রিকেট-প্রিয় অস্ট্রেলিয়ানের হৃদয়ে—চিরদিনের জন্য।'

বেনোডের কণ্ঠও ডুবে গেল আনন্দসঙ্গীতে,—

বড় মজাদার—চমৎকার—লোক—সে—রে—।

আরো একটি ছবি।

যে ওরেলের ছবি মেলবোর্ন প্যাভিলিয়ানে এবং ক্রিকেট-প্রিয় অস্ট্রেলিয়ানের হৃদয়ে টাঙানো হয়ে গিয়েছে, সেই ওরেল ফিরে যাবেন তাঁর স্বদেশে।

মেলবোর্নের রাস্তায় ভিড় পরাভূতের সংবর্ধনার জন্য। কত লোকের ভিড়? অন্ততঃ পাঁচ লক্ষের। ১৯৫৪ সালে রাণীর আগমনের সময় ছাড়া এতবড় জনতা মেলবোর্নে কখনো সমবেত হয়নি।

লক্ষ লক্ষ চক্ষুর দৃষ্টি, কণ্ঠের ধ্বনি এবং করের স্পর্শের উপর দিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ানরা চলে এলো লর্ড মেয়রের দেওয়া নাগরিক সংবর্ধনা গ্রহণের জন্য। তাদের মুখের হাসি বিস্তৃত হয়ে রইল কিন্তু দু'চোখ ভিজে গেল। একটা সামান্য কথা মস্ত হয়ে উঠল—ভালবাসা!

সকলে যাঁর কথা শুনতে চাইছিল সেই ওরেল কিন্তু লর্ড মেয়রের সংবর্ধনার উত্তর দিলেন না। কারণ? নিজের উপর বিশ্বাস তাঁর হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি নিজেকে সামলাতে পারবেন না। এতবড় ভালবাসার সামনে আত্মরক্ষার ক্ষমতা তাঁর নেই।

দলের ম্যানেজার দৃঢ়স্বভাব গেরী গোমেজ উত্তর দিতে উঠলেন। তিনি বললেন—তিনিও বললেন—

'ফ্রাঙ্কের এবং আমার আজকে কালো চশমা সত্যই দরকার হয়েছে, যাতে কেউ আমাদের চোখের অপুরুষোচিত অবস্থা দেখতে না পায়।'

শেষ ছবিটি বোধহয় এই—দুটি হাসিমুখের ছবি ওরেল বেনোডের হাতে তুলে দিচ্ছেন ওরেল-কাপ। স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান ওরেল-কাপ প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেছেন। অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মধ্যে টেস্ট সিরিজের পুরস্কার। ভূতপূর্ব ক্রিকেটার এবং বর্তমানে স্বর্ণকার ম্যাককর্মিক কাপটি তৈরী ক'রে দিয়েছেন। কাপের উপর ব্রিসবেন টেস্টের শেষ বলটি বাঁধানো। ওরেলের নামে কাপটির নামকরণ ক'রে জীবিত খেলোয়াড়কে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। কাপটিকে শেষ বারের মত কোটের হাতা দিয়ে ঘষে উজ্জ্বল ক'রে

ওরেল বেনোডের হাতে তুলে দিলেন,—বিজয়ীর পুরস্কার; বেনোড সিরিজ জিতেছেন। ওরেল হাসছেন,—সমস্ত সত্তা বিকীর্ণ হয়েছে সেই মুক্ত হাসিতে। বেনোডও হাসছেন,—সাফল্যের স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে তাঁর মুখ ভরে আছে।

আর কাপটি হাতে তুলে দেবার সময়ে ওরেল-কাপের স্বয়ং ওরেল ভাবছেন, বলছেনও বটে,—

'যখন আমার দেশবাসী আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, ঐ কাপটি কি রকম দেখতে—আমি উত্তরে কি বলব?'

পরাজয়কে এর থেকে নাটকীয় বিষাদের মধুরতা আর কে দিতে পেরেছে?

না, শেষের ছবি এও নয়, আরো একটি আছে; তবে সেটি ছবি নয়—শেষের কথা—আমি শুরুতেই যে কথাগুলি উদ্ধৃত করেছি—মেলবোর্নের অন্ধ মানুষটি ওরেলকে যে কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন,—

'ফ্রাঙ্ক, আমি অনেক বছর অন্ধ। কেবল একবারের জন্যই আমি আমার অন্ধত্বের জন্য দুঃখ পেয়েছি, যখন তোমাদের—'

থাক সে কথা। ব্রিসবেনের কয়েক হাজার দর্শক ছাড়া সকলেরই অন্ধের বেদনা।

যারা দেখতে পায়নি—ঐ খেলাটি সম্বন্ধে তারা সকলেই অন্ধ।

আর কিছু নয়—বেত আর কাঠ,
তবু অপরূপ ! যবে দোলে ব্যাট।
চামড়া ও সুতা—আর কিবা বল্ !
তবু অপরূপ ! হাতে ধরা বল।
পদতলে ঘাস, শিরোপরে রবি,
খেলে যাই মোরা সাঁঝ বেলা'বধি,
ভোজে বসি রাতে, প্রাণ ভরে গাই
সব সেরা খেলা হেন খেলা নাই।

[ই. ভি. লুকাসের একটি কবিতার অনুবাদ]